# ঈসা মসীহ: ইসলামের এক নবী

## চার্চের বিকৃতির এক ঐতিহাসিক আলেখ্য

[Bengali - বাংলা - بنغالي]

মুহাম্মাদ আতাউর- রহীম

৪০৩৪

অনুবাদ: হোসেন মাহমুদ

সম্পাদনা: আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

# عيسى المسيح نبي الإسلام

محمد عطاء الرحيم

ترجمة: حسين محمود

مراجعة: عبد الله شهيد عبد الرحمن

# মুখবন্ধ

খৃষ্টীয় ইতিহাসের এক বিশিষ্ট পণ্ডিত স্বীকার করেন যে, আধুনিক কালের খৃষ্টধর্ম হচ্ছে ঈসা মসীহের (Jesus) মুখের উপর একটি 'মুখোশ'। তিনি বলেন, একটি মুখোশ দীর্ঘ সময় পরা থাকলে তা একটি নিজস্ব জীবন লাভ করে এবং সেভাবেই সেটা গৃহীত হয়। মুসলমানেরা ইতিহাসের ঈসা আলাইহিস সালামকে বিশ্বাস করে। তাই তারা 'মুখোশ'-কে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সংক্ষেপে, গত চৌদ্দশো' বছর ধরে ইসলাম ও চার্চের মধ্যে এটাই মতপার্থক্যের কারণ হয়ে আছে। ইসলামের আগমনের পূর্বে এরিয়ান, পলিসিয় এবং গথদের কিছু লোক ঈসা আলাইহিস সালামকে গ্রহণ করেছিল, তবে প্রত্যাখ্যান করেছিল তার 'মুখোশ'-কে। কিন্তু রোমান সম্রাটগণ ঈসার আলাইহিস সালাম 'মুখোশ'-কে খৃষ্টানদের মেনে নিতে বাধ্য করে। এই অসম্ভব লক্ষ্য হাসিলের জন্য তারা লক্ষ লক্ষ খৃষ্টানকে হত্যা করে। সারভিটাসের একজন ভক্ত ক্যাসটিলো বলেন যে, "কোনো মতবাদের জন্য একজন লোককে হত্যা করলেই সেই মতবাদ প্রমাণিত হয় না।" অস্ত্রের মুখে জোর করে কোনো ধর্মে বিশ্বাস করানো যায় না।

কোনো কোনো মহলের পরামর্শ যে ইংল্যান্ডের জনসমাজের সাথে নিবিড়ভাবে মিশে যাওয়ার জন্য মুসলিমদের উচিৎ তাদের দু'টি উৎসবকে বড়দিন ও ইস্টারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। যারা একথা বলেন তারা ভুলে যান যে, শেষোক্ত উৎসবগুলো খৃষ্টান-পূর্ব পৌত্তলিক উৎসব। একটি হলো সূর্য- দেবতার প্রাচীন পন্মোৎসব এবং অন্যটি

হলো প্রাচীন অ্যাংলো- স্যাক্সন উর্বরতার (সন্তান দাত্রী) দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত পবিত্র উৎসব। এ পরিস্থিতিতে বাস্তবে কারা 'খৃষ্ট বিরোধী' তা সহজেই অনুমেয়।

এ গ্রন্থে সম্ভবত এই প্রথমবারের মতো মরু সাগর পুঁথি (Dead Sea Scrolls), খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ, আধুনিক গবেষণা ও কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে প্রাপ্ত সকল তথ্য ব্যবহার করে ঈসা আলাইহিস সালামের পবিত্র জীবন নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। যেসব খৃষ্টান পণ্ডিত যীশুর ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছেন তারা কখনোই তার ঈশ্বরত্বের ধারণা থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেন নি। যখন তারা তার ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন তখন কখনো কখনো এই বলে উপসংহার টেনেছেন যে, তিনি মোটেই অস্তিত্বশীল ছিলেন না অথবা "তিনি সকলের কাছে সবকিছু।" এ রকম মানসিকতা সম্পন্ন কারো পক্ষেই একটি বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা করা অসম্ভব। ঈসা আলাইহিস সালাম অস্তিত্বশীল ছিলেন, এ দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেই এ গ্রন্থ শুরু হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন মানুষ এবং আল্লাহর নবী।

এ গ্রন্থটি ৩০ বছরের অধ্যয়ন ও গবেষণার ফসল। আমাতুর রকীব বাজারে পাওয়া যায় না এমন সব বই সন্ধান করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরের রাস্তায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। তাকে আমার ধন্যবাদ। এ সকল বই করাচির লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই ভদ্রমহিলা আমাকে যে সাহায্য করেছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম।

জেদ্দার মহামান্য জনাব আহমদ জামজুন করাচিতে আমার সাথে সাক্ষাৎ

করেন। আমি যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, তখনি তার উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়েছি। আমি ধন্যবাদ জানাই শাইখ মাহমুদ সুবাহকে আলোচ্য বিষয়টি গভীরভাবে অধ্যয়নের জন্য আমার লন্ডন আগমন তার সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে।

লন্ডনে আমি মহামান্য শাইখ আবদুল কাদিরের সাথে সাক্ষাৎ করি। প্রতিটি পর্যায়েই তিনি আমার প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন। এর ফলে আমি জনাব আহমদ টমসনের সহযোগিতা লাভ করি। তিনি আমাকে বহু তথ্য ও গ্রন্থ সংগ্রহে সাহায্য করেছেন। তার এই উদার সাহায্য ছাড়া এ গ্রন্থ রচনা কতদিনে শেষ হতো, তা বলা মুশকিল। হাজী আবদুল হক বিউলি সব সময় আমাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপদেশ দিয়েছেন।

ডক্টর আলী আনেইজির কাছ থেকে আমি যে স্নেহ ও আন্তরিকতা লাভ করেছি, তা বলার নয়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করার বিষয়।

পরিশেষে কুরআনের ভাষায় বলি:

﴿وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ﴾ [هود: ٨٨]

“আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিল না।” [সূরা হূদ, আয়াত: ৮৮]

**মুহাম্মদ আতাউর রহীম**

লন্ডন

জমাদিউল উলা, ১৩৯৭ হিজরি

# ভূমিকা

এ গ্রন্থের লেখক মুহাম্মাদ আতাউর রহীম আবেগ সহকারে উপলব্ধি করেন যে, খৃষ্টান দেশগুলোর জনসাধারণের যদি ইসলামি ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু জ্ঞানও থাকত, পাশাপাশি তারা যদি আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে প্রকৃতই বুঝার চেষ্টা করত, তাহলে ভবিষ্যতে অনেক অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রণা পরিহার করা যেত। মেধাবী, উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন পণ্ডিত এ লেখক মানুষের সুখ ও কল্যাণ কামনার ক্ষেত্রে দেশ ও জাতীয়তার সীমা অতিক্রম করে গেছেন। তার বক্তব্য, আন্তঃসাংস্কৃতিক অজ্ঞতাই হচ্ছে আজকের দুর্দশা ও কষ্টের প্রধান একক কারণ।

সে কারণেই এ গ্রন্থটি রচিত, প্রধানত পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্যে। তবে এ গ্রন্থটি তাদের জন্যও যারা ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম, তার মিশন ও তার অন্তর্ধানকে ঘিরে পরস্পরবিরোধী ধারণার জটাজাল থেকে মুক্তি পেতে চান। মুহাম্মাদ আতাউর রহীম এই বিশৃঙ্খলাকে একজন খাঁটি ঐতিহাসিকের যুক্তি দিয়ে আক্রমণ করেছেন। তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, প্রায় সকল বিভ্রান্তির কারণ হলো দু'টি মতবাদ যা সকল যুক্তিকেই উপেক্ষা করেছে। মতবাদ দু'টি হলো কথিত যীশুর ঈশ্বরত্ব এবং ত্রিত্ববাদ।

এই গ্রন্থ খৃষ্টান চার্চ যার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, সেই কল্পকাহিনীকে বিপুলভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে এবং ঈসা আলাইহিস

সালামকে দেখিয়েছে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসের শিক্ষক হিসেবে যাকে ইয়াহূদী পুরোহিততন্ত্রের মধ্যকার অসংখ্য, খারাপ উপাদান ধ্বংসের জন্য আল্লাহ পাক নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।

তবে আমি এই ভূমিকাকে এ গ্রন্থের সারমর্ম হিসেবে তুলে ধরতে চাচ্ছি না। এ গ্রন্থটি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। সত্য উপলব্ধির ব্যাপারে অ-মুসলিমদের সাহায্য করতে এবং অধিকাংশ খৃষ্টানের ইসলামের প্রতি কুসংস্কারজনিত ভীতি হ্রাস করার একান্ত ইচ্ছার অংশ হিসেবে লেখক এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

আমরা যারা মুসলিম তারা জানি যে, এ ভয় কতটা অমূলক। আমরা আমাদের জ্ঞান থেকে জানি, মহান আল্লাহ কত ক্ষমাশীল, মানুষের প্রতি কত অনুগ্রহশীল, তিনি মানুষের স্পর্শাতীত সত্ত্বা:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الشورا: ١١]

“কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়, তিনি সর্ব শ্রোতা, তিনি সর্বদ্রষ্টা”। [সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১১]

আমরা নিশ্চিত জানি যে, আল্লাহ নবীগণকে প্রেরণ করেছেন, তারা আমাদের জন্যই প্রেরিত হয়েছেন, জগতে আমাদের একমাত্র মা‘বুদ হিসেবে আল্লাহর বাণী তারা প্রচার করেছেন এবং আমাদের অনুসরণের জন্য প্রদান করেছেন নির্দেশনা (আসমানি কিতাব)। মুসলিমগণ অপরিবর্তনীয় ও পূর্ণাঙ্গ পবিত্র কুরআনের অনুসারী, কিন্তু তারা সম্ভবত সময়ে সময়ে এ পূর্ণাঙ্গ অপরিবর্তনীয় মহা গ্রন্থটিকে অন্যদের জন্য

বোধগম্য করে তুলতে সমর্থ হয় না। এই লেখক, সকল মানুষের জন্য তার গভীর দরদের কারণে (বিশেষ করে যারা তার চেয়েও সৌভাগ্যহীন) তাদের সাথে যোগাযোগের এই ব্যর্থতা সম্পর্কে সচেতন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ সম্পর্কেও বিশেষভাবে সচেতন যা কিনা ইসলামের অভ্যন্তরেই বিকাশ লাভ করেছে। এগুলো যারা ইসলামকে বেড়ার ওপার থেকে ভীতির সাথে দেখেছে তাদের বিভ্রান্ত করতে, এমনকি বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের মধ্যেও বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝি ঘটাতে সক্ষম।

কেবল সুদৃঢ় সংকল্প, বিপুল সহানুভূতিই বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব ও সমঝোতা আনতে পারে। সবচেয়ে বড় বাধা হলো অপরিচয়ের ভীতি। নৈতিক মূল্যবোধহীন পাশ্চাত্যের দিকে তাকিয়ে অনেক মুসলিমই মনে করেন যে, সেই আধ্যাত্মিক শূন্যতার মধ্যে ইসলামের প্রবেশ ঘটানো খুবই সহজ ব্যাপার হবে। কিন্তু এ ধরনের আশা পোষণ করা আসলে শূন্যে প্রাসাদ নির্মাণের মতোই। পাশ্চাত্যের প্রযুক্তি ও শিল্প প্রবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য জনগণের গণশিক্ষা। এ গণশিক্ষা এসব লোকদের সবাইকে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে, ধর্মকে তারা যেভাবে জানে, তা সত্যের সমর্থনহীন মতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পরিণতিতে, এটা তেমন আশ্চর্যজনক নয় যে, এই শিল্প সমৃদ্ধ সমাজের বুদ্ধিজীবী এলিটরা খৃষ্টান চার্চের একচেটিয়া পুরোহিততন্ত্রের কাছ থেকে তাদের নয়া আবিষ্কৃত স্বাধীনতার মধ্যে এক অপরিসীম মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেয়ে প্রথম তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করেছে। অথচ এই পুরোহিততন্ত্রই শত শত বছর ধরে শিক্ষা বিস্তারের কাজটি পালন করে এসেছে। যা হোক,

এ ধরনের লোকদের কাছে ধর্ম, তা সে যে নামেই হোক, শুধু পুরোনো কুসংস্কারই নয়, উপরন্তু তা এক বাধা সৃষ্টিকারী শক্তি এবং অধিকতর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে এক প্রতিবন্ধক হিসেবে পরিদৃষ্ট হয়েছে। জন্মগতভাবে মুসলিম, যারা নিজেদের ও আল্লাহর মধ্যে সংঘৃষ্ট হতে অনভ্যস্ত, তারা এই মনোভাবকে উপলব্ধি করতে পারে নি বলেই মনে হয়। সত্য ভ্রষ্ট খৃষ্টানদের জন্য ধর্ম-বিশ্বাস হারানো হলো মানুষের তৈরি দর্শন থেকে বিচ্যুত হওয়া। যা কিনা অতীতে আইন- শৃঙ্খলা রক্ষার একটি পন্থা হিসেবেই কিছুটা যা কাজে লেগেছে।

ইসলাম পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক শূন্যতা পূরণ করতে পারার আগে এসব সম্পূর্ণ বস্তুবাদী মানুষকে আল্লাহর প্রকৃত সত্ত্বার সম্পর্ক বুঝাতে হবে এবং আল্লাহ সম্পর্কে এই জ্ঞান যে তাদের প্রত্যাখ্যাত পুরোহিততন্ত্রকে পুনরায় গ্রহণ করার ওপর নির্ভর করে না তাও বুঝাতে হবে। তাদেরকে মুসলিমদের ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে এক নতুন ধারণা প্রদান করতে হবে।

মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি দেশগুলো যদি প্রায় রাতারাতি বিপুল সম্পদ অর্জন করতে না পারত তাহলে ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের অজ্ঞতা আরো দীর্ঘস্থায়ী হয়ে বিদ্যমান থাকত। যেমন বলা যায়, রাশিয়াসহ সমগ্র ইউরোপ এবং আমেরিকা হঠাৎ করে শুধু তাদের কাছে অপরিচিত একটি ধর্ম বিশ্বাসেরই মুখোমুখি হয় নি, বরং এমন একটি ধর্ম বিশ্বাসের সম্মুখীন হয়েছে যার পিছনে রয়েছে একটি পণ্য, যেটাকে তারা স্বীকৃতি

দেয়। সেটি হলো অর্থ, বিপুল পরিমাণ অর্থ। তার অর্থ শক্তি, যে শক্তি দিয়ে প্রায় সব কিছু জয় করা যায়।

এটা আশ্চর্যজনক নয় যে, এই শক্তির ব্যাপারে প্রকৃতই ভয় রয়েছে। দীর্ঘকাল পূর্বে মুসলিম বিশ্বই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একচেটিয়া অধিকারী ছিল। প্রাচ্যের বিকাশের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, এটা দীর্ঘদিনের বিস্তৃত ইতিহাস। আরব দেশগুলো অতি সম্প্রতি প্রকৃত জাতীয়তাবোধ খুঁজে পেয়েছে। পাকিস্তান এই কয়েক দশক আগেও পশ্চিমা শিল্পশক্তির শোষণ-নিপীড়নের শিকার ছিল। তবুও বিশ্বব্যাপী ইসলাম (অনুসারী জনগোষ্ঠী পাশ্চাত্যের চন্দ্র পৃষ্ঠে পদচারণা, টেস্ট-টিউব শিশু তৈরির সক্ষমতা এবং মানুষের বর্তমান আয়ু সীমাকে দ্বিগুণ করার প্রায়) অর্জিত সাফল্য সত্ত্বেও সেই সমাজের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করার সম্ভাবনা প্রদর্শন করছে।

রোমার যাজকতন্ত্রের অধীনতা ও শাসন থেকে নিজেদের দেশকে মুক্ত করতে এবং বেসামরিক সরকার ও নাগরিক আইন প্রতিষ্ঠা করতে যারা কঠিন লড়াই করেছে, খৃষ্টান দেশগুলোতে জন্মগ্রহণকারী সে সব লোকেরা আজ তাদের স্বাধীনতা দ্রুত বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে।

মুহাম্মাদ আতাউর রহীমের এই গ্রন্থের মত ইসলামি পণ্ডিত-গবেষকরা মানুষের প্রতি সযত্ন ভালোবাসা নিয়ে যতক্ষণ না পাশ্চাত্যের সাথে একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পরিবেশ সৃষ্টি করবে ততদিন শুধু ভীতির আবহাওয়া থেকে বিরোধেরই সৃষ্টি হতে থাকবে। মুসলিম দেশগুলো

বিশেষত যেসব দেশের বিপুল আর্থিক শক্তি রয়েছে, তাদের ওপরই আজ অর্পিত হয়েছে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদাহরণ সৃষ্টির গুরু দায়িত্ব। আশার কথা যে, পশ্চিমা দেশগুলো এবং মুসলিম দেশগুলোতেও বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর বিস্তৃতি ও সংখ্যা বৃদ্ধি ইসলামি গবেষণা ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং এর ফলে ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের জনগণের অমূলক ভীতি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হবে।

আমরা, মুসলিমরা আল্লাহর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করব। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমরা হাত-পা গুটিয়ে পিছনে পড়ে থাকব। আমাদের রয়েছে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত এবং আমাদের দিক-নির্দেশনা প্রদানকারী পবিত্র কুরআনের অপরিবর্তনীয় নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা। তবে এ নির্দেশনায় সুস্পষ্টভাবে যা বলা হয়েছে তা হলো আমরা যদি ইহকালে শান্তি ও পরকালে আল্লাহর সর্বোত্তম অনুগ্রহ চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই সেভাবে কাজ করতে হবে যেমনটি মহান রাব্বুল আলামিন চান।

**অ্যান্ড্রু ডগলস হ্যামিলটন**
জমাদিউস সানি, ১৩৯৯ হিজরি
এপ্রিল, ১৯৭৯ খ্রী.

## অনুবাদকের কথা

Jesus: Prophet of Islam ‘জেসাস: এ প্রফেট অব ইসলাম’ গ্রন্থটি আমি প্রথম দেখি ১৯৯৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরিতে। অন্য আর পাঁচটি বই উলটে দেখার মতোই দেখেছিলাম এ বইটি। এটি যে কখনো অনুবাদ করব ভাবি নি।

ঘটনাচক্রে এর বছর দেয়ক পর বইটি অনুবাদের কাজ শুরু করলাম। আর এ কাজে যিনি আমাকে উৎসাহিত করেছেন, তিনি হচ্ছে আমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী পরম শ্রদ্ধাভাজন লেখক, অনুবাদক জনাব লুৎফুল হক। তিনি তখন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ বিভাগের পরিচালক। নিয়মানুযায়ী বইটি অনুবাদের ব্যাপারে আমার আগ্রহ প্রকাশ করে অনুবাদ বিভাগকে চিঠি দিলাম। তারা অনুবাদের নমুনা জমা দিতে বললেন। দিলাম। তা তাদের পছন্দ হলো। তারপর পুরো বই অনুবাদ করে জমা দিলাম। সে ১৯৯৭ সালের কথা।

এখানে বলা দরকার, এ অনুবাদ বইয়ের সূত্রেই দেশের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, লেখক, গবেষক, টিভি ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আশরাফ আলী সাহেবের সাথে আমার পরিচয় ঘটার সৌভাগ্য হয়। তিনি ১৯৯৫-১৯৯৬ সালে স্বল্প সময়ের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ছিলেন। আমি তাকে চিনলেও তিনি আমাকে চিনতেন না। অনুবাদ বিভাগ আমার অনুদিত বইটি বিক্রয়ে জন্য তার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তখন আর মহাপরিচালক নন। কিন্তু বইয়ের কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়ায় তিনি অনুবাদকের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন। এটা জেনে একদিন

ফোনে কথা বলে সময় ঠিক করে তার কলা বাগান লেক সার্কাসের বাড়িতে গেলাম। তার মত একজন পণ্ডিত লোক আমার মত সামান্য অনুবাদকের অনুবাদ পরীক্ষা করে দেখছেন এ কারণে বেশ শঙ্কিত ছিলাম। তবে সাক্ষাতের পর তার অসাধারণ সৌন্দর্যবোধ আর আন্তরিক ব্যবহারে সে শঙ্কা কেটে গেল। তিনি বইটি দেখে শেষ করেছিলেন। দু'একটি জায়গায় শব্দ ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। আমি ব্যাখ্যা দিলাম। তিনি মেনে নিলেন। বললেন এটি বেশ কঠিন বই। তবে আপনার অনুবাদ যথেষ্ট ভালো হয়েছে। তার কথায় সত্যি ভালো লাগল আমার আত্মবিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো। দেখলাম পাণ্ডুলিপিতে তিনি অনেক সংশোধন করেছেন। আমি বিভিন্ন নাম ও স্থানের ইংরেজি বানান উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলাম, তিনি কষ্ট করে সেগুলো লিখে দিয়েছেন। এর প্রয়োজন ছিল। তার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল।

এরপর বইটি সম্পাদনা করতে দেওয়া হয় প্রফেসর আবদুল মান্নান সাহেবকে। তার সাথে আমার পরিচয় নেই। কিন্তু বইটির চূড়ান্ত প্রুফ দেখার সময় পাণ্ডলিপিতে দেখলাম তার সুদক্ষ সম্পাদনার পরিচয় ছড়িয়ে আছে। আমি উপলব্ধি করলাম যে, এই পণ্ডিত মানুষটির হাতে সম্পাদিত না হলে এ বইটিতে অনেক ত্রুটি থেকে যেত। তাকে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

এবার এ বইটি প্রসঙ্গে কিছু কথা বলি। সত্যি কথা বলতে কি, নবী ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বিশ্বের কোথাও কোনো তথ্য নেই। আমরা তার সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না। অথচ বিশ্বের ধর্মীয়

ইতিহাসে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ নবী। মহান আল্লাহ তাআলা মানব সমাজকে হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে মাত্র চারজনের কাছে আল্লাহ পাক আসমানি কিতাব নাজিল করেছিলেন। ঈসা আলাইহিস সালাম তাদেরই একজন। কিন্তু মানব সমাজের দুর্ভাগ্য যে সমকালের এক শ্রেণির মানুষ তার সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি পূর্বক তার প্রচারিত ধর্ম শিক্ষাকে বিকৃত এবং তার ওপর 'ঈশ্বরত্ব' আরোপ করে, যার মূলে কিনা অসত্য আর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। এমনকি ঈসা আলাইহিস সালাম যে, ইসলামেরই এক নবী এ কথাটিও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা স্বীকার করে নি, এখনও করে না।

পাকিস্তানের লেখক গবেষক মুহাম্মাদ আতাউর রহীম এ বিষয়টি গভীর অধ্যয়ন গবেষণার পর 'জেসাস, এ প্রফেট অব ইসলাম' শীর্ষক ইংরেজি গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থের সমর্থনে প্রমাণ করেছেন যে 'ত্রিত্ববাদ' যা প্রচারিত তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, আর যীশু অবশ্যই ঈশ্বর নন- তিনি একজন মানুষ ও আল্লাহর প্রেরিত কিতাবধারী নবী ঈসা আলাইহিস সালাম।

জানা মতে, খৃষ্টধর্মের তথাকথিত ত্রিত্ববাদকে অসার ও ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে যুক্তি ও প্রমাণ সহযোগে এ রকম আর কোনো গ্রন্থ এ পর্যন্ত রচিত হয় নি।

জনাব আতাউর-রহীমের গ্রন্থটি ১৯৮০ সালের নভেম্বরে পাকিস্তানের করাচিস্থ আয়েশা বাওয়ানী ওয়াকফ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৯৮৬ সাল পর্যন্ত গ্রন্থটির মোট ৩টি সংস্করণ প্রকাশের কথা জানা যায়।

এ মূল্যবান গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করার তাওফীক আল্লাহ আমাকে দিয়েছিলেন। এ জন্য তার কাছে লাখো শুকরিয়া জানাই। আর্থিক অনটন, ব্যক্তিগত সমস্যা সময়ের একান্ত অভাবের কারণে রাতের পর রাত জেগে বহুবার ঢাকা-কুষ্টিয়া-ঢাকা যাওয়া-আসার পথে চলন্ত বাসে, ট্রেনে, ফেরীতে বসে যখন যেখানে পেরেছি, সেখানে সে অবস্থায় অমানুষিক পরিশ্রম করে এ বইয়ের অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেছিলাম। এমনও হয়েছে যে, একটি জটিল শব্দের অর্থ বুঝতে গোটা রাত পার হয়ে গেছে। অনেক সময় অনেক স্থানে আটকে গিয়ে তিন সাংবাদিক সহকর্মী, শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ নুরুল হোসেন সাহেব, এস.এম. হাফিজুর রহমান ও একরামুল্লাহিল কাকির সাহায্য চেয়েছি। এ সকল মানুষেরা বিপুল ঔদার্যে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

সুধী পাঠকের কাছে যদি সমাদৃত হয়, এ গ্রন্থ অনুবাদকের উদ্দেশ্য ও পরিশ্রম সফল হবে।

**হোসেন মাহমুদ**

# সূচীপত্র

| ক্র | শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১ | প্রথম অধ্যায়: একত্ববাদী মতবাদ ও খৃষ্টধর্ম | ১৬ |
| ২ | দ্বিতীয় অধ্যায়: ঈসা আলাইহিস সালামের ঐতিহাসিক বিবরণ | ৩১ |
| ৩ | তৃতীয় অধ্যায়: বার্নাবাসের গসপেল | ৭১ |
| ৪ | চতুর্থ অধ্যায়: হারমাসের দি শেফার্ড | ৮২ |
| ৫ | পঞ্চম অধ্যায়: বার্নাবাস ও আদি খৃষ্টানগণ | ৯০ |
| ৬ | ষষ্ঠ অধ্যায়: খৃষ্টধর্মের আদি একত্ববাদীগণ | ১৩৩ |
| ৭ | সপ্তম অধ্যায়: খৃষ্টধর্মের পরবর্তী একত্ববাদীগণ | ১৯৮ |
| ৮ | অষ্টম অধ্যায়: একালে খৃষ্টধর্ম | ৩৪৮ |
| ৯ | নবম অধ্যায়: কুরআনে ঈসা আলাইহিস সালাম | ৩৬৮ |
| ১০ | দশম অধ্যায়: হাদীস ও মুসলিম ইতিহাস গ্রন্থে ঈসা আলাইহিস সালাম | ৩৯৯ |
| ১১ | অধ্যায় টীকা | ৪০৭ |
| ১২ | গ্রন্থপঞ্জী | ৪১৫ |

## প্রথম অধ্যায়

## একত্ববাদী মতবাদ ও খৃষ্টধর্ম

ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বের সর্বত্র আদিম লোকদের প্রাণী ও মূর্তিপূজার ঘটনা সকল ক্ষেত্রেই ছিল মূল একত্ববাদী বিশ্বাস থেকে এক পশ্চাদপসারণ এবং ইয়াহূদী, খৃষ্টান ও দীন ইসলামের একত্ববাদ বহু ঈশ্বরবাদ থেকে উদ্ভূত হওয়ার পরিবর্তে তার বিরোধী হিসেবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যে কোনো ধর্মেই তার বিশুদ্ধ রূপটি পরিদৃষ্ট হয় তার প্রথমাবস্থায় এবং পরবর্তীতে শুধু তার অবনতিই চোখে পড়ে। আর এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই খৃষ্টধর্মের ইতিহাসকে দেখতে হবে। একত্ববাদে বিশ্বাস নিয়ে এ ধর্মের শুরু হয়েছিল, তারপর তা বিকৃতির শিকার হয়ে পড়ে এবং ত্রি-ঈশ্বরবাদ বা ত্রিত্ববাদ গৃহীত হয়। এর পরিণতিতে সৃষ্টি হয় বিভ্রান্তি ও সংশয় যা মানুষকে অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় মূল অবস্থা থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

ঈসা আলাইহিস সালামেরর অন্তর্ধানের পর প্রথম শতাব্দীতে তার অনুসারীরা একত্ববাদের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখে। এর সত্যতা মেলে ৯০ সনের দিকে রচিত 'দি শেফার্ড অফ হারমাস' (The Shepherd of Hermas) নামক গ্রন্থটিকে ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে মর্যাদা প্রদানের ঘটনায়। এ গ্রন্থের ১২টি ঐশী নির্দেশের প্রথমটি শুরু হয়েছে এভাবে:

সর্বপ্রথম বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ (God) এক এবং তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও সেগুলোকে সংগঠিত করেছেন। তার ইচ্ছার

বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই এবং তিনি সবকিছু ধারণ করেন, কিন্তু তিনি নিজে অ-ধারণযোগ্য......।[১]

থিওডোর যায়ন (Theodor Zahn)-এর মতে ২৫০ সন অবধি খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসের ভাষা ছিল এ রকম: "আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহে বিশ্বাস করি।"[২] ১৮০ থেকে ২১০ সনের মধ্যে 'সর্বশক্তিমান' -এর পূর্বে 'পিতা' শব্দটি যুক্ত হয়। বেশ কিছু সংখ্যক চার্চ-নেতা এর তীব্র বিরোধিতা করেন। এ পদক্ষেপের নিন্দাকীদের মধ্যে বিশপ ভিক্টর (Bishop Victor) ও বিশপ জেফিসিয়াসের (Bishop Zephysius) নামও রয়েছে। কারণ, তারা বাইবেলে কোনো শব্দ সংযোজন বা বিয়োজনকে অচিন্তনীয় অপবিত্রতা বলে গণ্য করতেন। তারা যীশুকে ঈশ্বরের (God) মর্যাদা প্রদানের প্রবণতারও বিরোধী ছিলেন। তারা যীশুর মূল শিক্ষানুযায়ী একত্ববাদের প্রতি অত্যন্ত জোর দেন এবং বলেন যে, যদিও তিনি একজন নবী ছিলেন, তিনি অবশ্যই অন্য দশজন মানুষের মতই একজন মানুষ ছিলেন, যদিও তিনি ছিলেন তার প্রভূর অত্যন্ত অনুগ্রহ ধন্য। উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় গড়ে উঠা বহু চার্চ এই বিশ্বাসের ধারক ছিল।

ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা ক্রমশ বিস্তার লাভের পাশাপাশি তা একদিকে যেমন অন্যান্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদের সাথে তার বিরোধ শুরু হয়। এ সময় খৃষ্টধর্ম এসব সংস্কৃতিগুলো কর্তৃক অঙ্গীভূত ও গৃহীত হতে শুরু করে এবং এর ফলে শাসকদের নির্যাতন-নিপীড়নও হ্রাস পায়। বিশেষ করে গ্রীসে

প্রথমবারের মত একটি নয়া ভাষায় ব্যক্ত হওয়া এবং এ সংস্কৃতির ধারণা ও দর্শনের সাথে অঙ্গীভূত হওয়া- এ উভয় পন্থায় খৃষ্টধর্মের রূপান্তর ঘটে। গ্রীকদের বহু-ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বিশেষ করে টারসাসের পলের (Paul of Tarsus) মত কিছু ব্যক্তির ঈসা আলাইহিস সালামকে নবী থেকে ঈশ্বরে উন্নীত করার পর্যায় ক্রমিক প্রয়াস ত্রিত্ববাদ (Trinity) সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

৩২৫ সনে ত্রিত্ববাদকে গোঁড়া (Orthodox) খৃষ্টানদের ধর্ম বিশ্বাস বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এ ঘোষণায় স্বাক্ষর দানকারীদের মধ্যে কিছু লোক এতে বিশ্বাস স্থাপন করেন নি। কারণ, তারা বাইবেলে এর কোনো ভিত্তি দেখতে পান নি। এই ঘোষণার জনক বলে যাকে বিবেচনা করা হয় সেই এথানাসিয়াসও (Athanasius) নিজে এর সত্যতা সম্পর্কে ততটা নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি স্বীকার করেন যে, "যখনই তিনি তার উপলব্ধিকে যীশুর ঈশ্বরত্বের ব্যাপারে জোর করে নিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, তখন তা কষ্টকর ও ব্যর্থ চেষ্টায় পর্যবসিত হয়েছে।" অধিকন্তু তিনি লিখে গেছেন চিন্তা প্রকাশে তার অক্ষমতার কথা। এমনকি এক পর্যায়ে তিনি লিখে গেছেন, "তিনজন নয়, ঈশ্বর একজনই।" ত্রিত্ববাদে তার বিশ্বাসের পিছনে কোনো দৃঢ় ভিত্তি ছিল না, বরং তা ছিল কৌশল ও আপাত প্রয়োজনীয়তার কারণে।

রাজনৈতিক সুবিধা ও দর্শনের ভুল যুক্তির ভিত্তিতে প্রদত্ত এ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন রোমের পৌত্তলিক সম্রাট কনস্টানটাইন (Constantine) যিনি কাউন্সিল অব নিসিয়ার (Council

of Nicea) সভাপতিত্ব করেছিলেন। ক্রমবর্ধমান খৃষ্টান সম্প্রদায় ছিল একটি শক্তি যাদের বিরোধিতা তার কাম্য ছিল না। তারা তার সাম্রাজ্য দুর্বল করে দিয়েছিল। সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করতে তাদের সমর্থন তার কাছে ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। তাই, খৃষ্টান ধর্মকে নতুন রূপ দিয়ে তিনি চার্চের সমর্থন পাওয়ার আশা করেছিলেন এবং একই সাথে তিনি খৃষ্টধর্ম ও চার্চের মধ্যে সৃষ্ট বিভ্রান্তির অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন যেহেতু এটা ছিল তার সম্রাজ্যের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের অন্যতম কারণ।

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি আংশিকভাবে তার লক্ষ্য হাসিল করতে সমর্থ হয়েছিলেন তা অন্য একটি ঘটনার দৃষ্টান্ত থেকে সুস্পষ্ট হতে পারে। এ ঘটনাটি ঘটেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সময়।

একবার মুসলিমদের ঈদ উৎসবের কাছাকাছি সময়ে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিতব্য ঈদের সালাত বিষয়ে টোকিও থেকে জোর প্রচারণা চালানো শুরু হয়। সিঙ্গাপুর তখন জাপানিদের দখলে। এটা হবে এক ঐতিহাসিক ঘটনা- ঘোষণা করল টোকিও। বলল এর প্রভাব সারা মুসলিম বিশ্বে অনুভূত হবে। ঈদের সালাত নিয়ে জাপানিদের এ হঠাৎ মাতামাতি কয়েকদিন পরেই আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কিছুদিন পর একটি খণ্ডযুদ্ধে একজন জাপানি সৈন্য বন্দী হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই উন্মোচিত হয় সব রহস্য। জাপানি সৈন্যটি জানায় যে, জাপান সরকারের প্রধান জেনারেল তোজো আধুনিক কালের একজন শ্রেষ্ঠ মুসলিম সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। আধুনিক কালের চাহিদার সাথে ইসলামের শিক্ষার সমন্বয় সাধনের

একটি কর্মসূচী ছিল তার। তার মতে, এ কর্মসূচীতে মুসলিমদের সালাতের সময় মক্কার পরিবর্তে টোকিওর দিকে মুখ ফেরানো শুরু করার পরিকল্পনা ছিল যা কিনা তোজোর নেতৃত্বে ইসলামের ভবিষ্যৎ কেন্দ্র হতো। সৈনিকটি জানায়, মুসলিমরা ইসলামের এই প্রাচ্য-কারণের অভিসন্ধি প্রত্যাখ্যান করায় পুরো পরিকল্পনাটিই বাতিল হয়ে যায়। যা হোক, এ ঘটনার পর সে বছর সিঙ্গাপুরে ঈদের সালাত পড়ার অনুমতি দেওয়া হয় নি। তোজো ইসলামের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং তিনি সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা হাসিলের পন্থা হিসেবে ইসলামকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এতে সফল হন নি। কনস্টান্টাইন সফল হয়েছিলেন, ব্যর্থ হয়েছিলেন তোজো। জেরুজালেমের বদলে রোম পল-অনুসারী খৃষ্টানদের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

ঈসা আলাইহিস সালামের আসল শিক্ষার এই বিকৃতির অনিবার্য ফল হয়েছিল ত্রিত্ববাদকে গ্রহণ, কিন্তু তা কখনোই বিনা প্রতিবাদে হয় নি। ৩২৫ সনে যখন সরকারীভাবে বহু ঈশ্বরবাদকে 'অর্থোডক্স' খৃষ্টানদের ধর্ম রীতি হিসাবে ঘোষণা করা হয় তখন উত্তর আফ্রিকার খৃষ্টানদের এক নেতা আরিয়াস (Arius) সম্রাট কনস্টানটাইন ও ক্যাথলিক চার্চের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, ঈসা আলাইহিস সালাম সর্বদাই স্রষ্টার একত্বের কথা ব্যক্ত করেছেন। কনস্টানটাইন তার সর্বশক্তি ও বর্বরতা দিয়ে একত্ববাদের অনুসারীদের নির্মূল করার চেষ্টা চালান। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। পরিহাসের বিষয় যে, কনস্টানটাইন নিজে একজন একত্ববাদে বিশ্বাসী হিসেবে মৃত্যুবরণ করলেও ত্রিত্ববাদ শেষ পর্যন্ত ইউরোপে খৃষ্টীয় মতবাদের ভিত্তি হিসেবে

সর কারীভাবে গৃহীত হয়। এই মত মানুষের মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তাদের অনেককেই বলা হয়েছিল যে, বোঝার কোনো চেষ্টা না করেই এতে বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু মানুষ তার স্বভাব অনুযায়ী বুদ্ধির সাহায্যে নয়া ধর্মমতকে বিচার ও ব্যাখ্যার চেষ্টা করে যা বন্ধ করা সম্ভব ছিল না। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এ সময় তিনটি চিন্তাধারার জন্ম হয়। প্রথমটির প্রবক্তা ছিলেন সেন্ট আগাষ্টাইন (St. Augustine) তিনি চতুর্থ শতাব্দীর লোক ছিলেন। তার অভিমত ছিল যে, ধর্মমতের সত্যতা প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু তার ব্যাখ্যা করা যায়। দ্বিতীয় চিন্তাধারার প্রবক্তা ছিলেন সেন্ট ভিকটর (St. Victor)। তিনি ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ধর্মকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও বিশদভাবে ব্যক্ত- উভয়ই করা যায়। তৃতীয় ধারাটির জন্ম হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে। এরা বলতেন, ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা বা সত্যতা প্রমাণের অবকাশ নেই, বরং তা অন্ধভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করতে হবে।

যদিও শেষোক্ত এ মতবাদের তীব্র বিরোধিতা পরিহারের লক্ষে যীশুর শিক্ষাদান সংবলিত গ্রন্থসমূহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, লুকিয়ে ফেলা নতুবা পরিবর্তন করা হয়। তারপরও যে গ্রন্থগুলো টিকে ছিল সেগুলোতে যথেষ্ট সত্য অবশিষ্ট ছিল। তাই ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে ধর্মগ্রন্থের ভাষ্যের চেয়ে চার্চের নেতাদের ভাষ্যের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ঘোষণা করা হয় যে, “ব্রাইড অব জেসাস” (Bride of Jesus) বা চার্চের জন্য প্রদত্ত বিশেষ প্রত্যাদেশই হলো এ মতবাদের ভিত্তি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, পোপ একটি পত্রে ফ্রা

ফুলজেনশিওকে (Fra Fulgention) ভৎর্সনা করে লিখেছিলেন যে, “ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রচার একটি সন্দেহজনক বিষয়। যে ব্যক্তি ধর্মগ্রন্থসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখবে সে ব্যক্তি ক্যাথলিক ধর্মকে ধ্বংস করবে।” পরবর্তী পত্রে তিনি ধর্মগ্রন্থসমূহের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে লিখেছেন- ...এ গুলো এমনই গ্রন্থ যে কেউ যদি তা আঁকড়ে ধরে তবে সে ক্যাথলিক চার্চকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবে।”[৩]

ঈসা আলাইহিস সালামেরর শিক্ষাকে কার্যকরভাবে পরিত্যাগের জন্য তার ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অস্পষ্টতা বিপুলভাবে দায়ী। চার্চ ধর্মকে শুধু ধর্মগ্রন্থ থেকেই বিচ্ছিন্ন করে নি, ঈসা আলাইহিস সালামকে কল্পিত এক যীশুর সাথে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। আসলে ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে, পুনরুজ্জীবিত খৃষ্টে বিশ্বাস করতে হবে। যেখানে ঈসা আলাইহিস সালামের প্রত্যক্ষ অনুসারীরা তার আদর্শের ভিত্তিতে তাদের জীবন গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে পল অনুসারী খৃষ্টানদের আদর্শ ছিল যীশুর কথিত ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরবর্তী জীবন। সেই কারণে ঈসা আলাইহিস সালামের জীবন ও শিক্ষা তাদের কাছে আর গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা থেকে চার্চ যত বেশি দূরে যেতে থাকে, চার্চের নেতারা তত বেশি জাগতিক স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িয়ে পড়তে থাকে। ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা এবং চার্চ কর্তৃপক্ষের প্রত্যাশার মধ্যে ব্যবধান অস্পষ্ট হয়ে আসতে থাকে ও একটির মধ্যে অপরটি

মিশে যেতে শুরু করে। চার্চ রাষ্ট্র থেকে যতই নিজের পার্থক্যের ওপর জোর দিতে থাকে, ততই ক্রমশ অধিকতরভাবে রাষ্ট্রের সাথে জড়িয়ে যায় এবং একটি শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। প্রথমদিকে চার্চ রাজকীয় শক্তির অধীনে ছিল। কিন্তু যখন তা সম্পূর্ণরূপে আপোষ করে ফেলে তখন পরিস্থিতি উল্টে যায়। ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা ও এই পথভ্রষ্টতার মধ্যে বিরোধিতা সবসময়ই ছিল। চার্চ যতই অধিক মাত্রায় ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে ততই ত্রিত্ববাদে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের জন্য পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি এ জন্য মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া শুরু হয়। যদিও লুথার রোমার চার্চ পরিত্যাগ করেন, তার বিদ্রোহ ছিল শুধু পোপের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, রোমান ক্যাথলিক চার্চের মৌলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধে নয়। এর ফল হলো এই যে, তিনি একটি নতুন চার্চ প্রতিষ্ঠা করলেন এবং তার প্রধান হলেন। খৃষ্ট ধর্মমতের সকল মৌলিক বিষয়ই তাতে গৃহীত ও বহাল রয়ে গেল। এর ফলে বেশ কিছু সংখ্যক সংস্কারকৃত চার্চ ও গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা ঘটে, কিন্তু সংস্কার পূর্ববর্তী খৃষ্টধর্ম পূর্বাবস্থায়ই রয়ে যায়। পলীয় চার্চের এ দু'টি প্রধান শাখা এখন পর্যন্ত টিকে রয়েছে।

উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আরিয়াসের শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। পরে সেখানে ইসলামের আগমন ঘটলে তারা সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করে। কারণ, তারা একত্ববাদী মতবাদের এবং ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত শিক্ষার অনুসারী ছিল। তাই তারা ইসলামকে সত্য ধর্ম হিসেবে স্বীকার করে নেয়।

ইউরোপে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে একত্ববাদের সূতাটি কখনো ছিন্ন হয় নি। কার্যত এ আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং অতীত ও বর্তমানে স্থাপিত চার্চের অব্যাহত নির্মম নির্যাতন সত্ত্বেও তার অবসান হয় নি।

আজকের দিনে ক্রমশই বেশি সংখ্যক লোক এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছে যে, ঈসা আলাইহিস সালামের মূল শিক্ষার সাথে বর্তমান খৃষ্টান ধর্মের 'রহস্যে' বিশ্বাস স্থাপনের অবকাশ নেই বললেই চলে। বরং প্রমাণিত সত্য এই যে, ইতিহাসের ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে চার্চের খৃষ্টের কোনো সম্পর্ক নেই। চার্চের যীশু খৃষ্টানদের সত্যের পথে কোনো সাহায্য করতে পারেন না। খৃষ্টানদের এই বর্তমান উভয় সংকট এ শতকের চার্চ ঐতিহাসিকদের লেখায় প্রকাশিত হয়েছে। এডলফ হারনাক (Adlof Harnac) যে মৌলিক অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন তা এই যে, "চতুর্থ শতক নাগাদ গসপেল গ্রীক দর্শনের মুখোশে আবৃত হয়। এই মুখোশ খুলে ফেলা এবং মুখোশের নিচে খৃষ্টধর্মের প্রকৃত সত্যের সাথে তার পার্থক্য প্রকাশের দায়িত্ব ছিল ঐতিহাসিকদের।" তবে হারনাক এই দায়িত্ব পালনের অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে যে দীর্ঘকাল ধরে জেঁকে বসা ধর্মমতের মুখোশ উন্মোচন ধর্মের রূপকেই পাল্টে দিতে পারত:

এ মুখোশ তার নিজস্ব জীবনী শক্তি অর্জন করেছিল। ত্রিত্ববাদ, খৃষ্টের দ্বৈত সত্ত্বা, অভ্রান্ততা এবং এ সব মতবাদের সমর্থনসূচক প্রস্তাবাদি ছিল ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ও পরিস্থিতির সৃষ্টি যা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল তা সত্ত্বেও আগের বা পরের এই সৃষ্ট পরিবর্তিত শক্তি,

এই মতবাদ, প্রাথমিক অবস্থার মতই বজায় ছিল, এ বুদ্ধিবাদিতা ছিল এক বদভ্যাস যা তিনি যখন ইয়াহূদীদের কাছ থেকে পালিয়ে আসেন সে সময় খৃষ্টানরা গ্রীকদের কাছ থেকে লাভ করেছিল।

হারনাক তার অন্য একটি গ্রন্থে এ বিষয়টি বিশদ আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি স্বীকার করেন:

...৪র্থ গসপেল (Gospel) ধর্ম প্রচারক জন থেকে উদ্ভূত নয় বা উদ্ভূত হওয়ার কথা বলে না। কারণ, ধর্ম প্রচারক জন ঐতিহাসিক সূত্র হিসেবে গণ্য হতে পারেন না.... চতুর্থ গসপেলের লেখক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করেছেন, ঘটনাবলীর পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং সেগুলোকে অচেনা আলোয় আলোকিত করেছেন। তিনি নিজেই আলোচনা পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন এবং কাল্পনিক পরিস্থিতিতে মহৎ চিন্তাগুলো সন্নিবেশ করেছেন।

হারনাক পুনরায় বিখ্যাত খৃষ্টান ঐতিহাসিক ডেভিড ষ্ট্রস (David Strauss) এর গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। স্ট্রসকে তিনি শুধু চতুর্থ নয়, প্রথম তিনটি গসপেলের ঐতিহাসিক সুনাম ও বিশ্বাসযোগ্যতা ধ্বংসের জন্যও দায়ী করেছেন। [৫]

অন্য ঐতিহাসিক জোহানেস লেহমানের (Johannes Lehmann) মতে ৪টি গৃহীত গসপেলের লেখকরা ভিন্ন এক যীশুর বর্ণনা করেছেন যিনি ঐতিহাসিক বাস্তবতার দ্বারা পরিচিত ঈসা আলাইহিস সালাম নন। এর পরিণতি বা ফলাফল যিনি উল্লেখ করেছেন সেই হেইঞ্জ জাহরনট (Heinz Zahrnt)- কে উদ্বৃত করে লেহমান বলেন,

ঐতিহাসিক গবেষণা যদি প্রমাণ করতে পারে যে, ইতিহাসের ঈসা আলাইহিস সালাম ও প্রচারিত যীশুর মধ্যে মীমাংসার অযোগ্য পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে এবং যীশুতে বিশ্বাস স্থাপনের মত সমর্থন স্বয়ং ঈসা আলাইহিস সালামের মধ্যেই নেই, তাহলে সেটা তাত্ত্বিকভাবে শুধু মারাত্মক ভুলই হবে না, বরং এন. এ. জাহল (N.A. Jahl) যেমনটি বলেন, তার অর্থ দাঁড়াবে খৃষ্টীয় ধর্ম-দর্শনের অবসান। তবুও আমার বিশ্বাস, আমরা ধর্মতত্ত্ববিদরা এ থেকে নিষ্কৃতির পথ বের করতে পারব, কোনো সময়ই আমরা যা পারি নি; তবে আমরা হয় এখন মিথ্যাচার করছি, নয় তখন করব।[৬]

উপরোক্ত ক্ষুদ্র কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে একদিকে আজকের খৃষ্টধর্মের উভয় সংকট যেমন প্রকাশিত হয় অন্যদিকে জাহরন্ট-এর বক্তব্যও অনেক বেশি গুরুতর কিছুর আভাস দেয়। সেটা এই যে, ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা, চার্চের ভূমিকা ও তার অনুসারীদের বিষয়গুলো ঘনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তার শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য উপেক্ষিত অথবা বিলুপ্ত হয়েছে। এর উদাহরণ হিসেবে থিওডোর যায়ন চার্চের মধ্যকার তিক্ত বিরোধের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে, রোমান ক্যাথলিক চার্চ গ্রীক অর্থোডক্স চার্চকে ভালো ও মন্দ উদ্দেশ্য সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে পবিত্র গ্রন্থ পুনর্বিন্যাসের জন্য অভিযুক্ত করে। অন্যদিকে গ্রীকদের পালটা অভিযোগ রয়েছে যে, বিভিন্ন স্থানের ক্যাথলিকরা নিজেরাই মূল বাইবেল থেকে দূরে সরে গেছে। তবে তাদের এই বিভেদ সত্ত্বেও তারা উভয়ে মিলে যেসব খৃষ্টান গির্জার অনুসারী নয় তাদের সত্যপথ থেকে বিচ্যুত বলে অভিহিত এবং তাদের

ঈশ্বরদ্রোহী বলে নিন্দা করে। অন্যদিকে ঈশ্বরদ্রোহী বলে আখ্যায়িত খৃষ্টানরা পাল্টা জবাবে ক্যাথলিকদের সত্যের জালিয়াতি করার জন্য অভিযুক্ত করে। যায়ন বলেন, প্রকৃত ঘটনা থেকে এসব অভিযোগের সত্যতা কি প্রমাণিত হয় না?[৭]

ঈসা আলাইহিস সালাম স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত। যারা ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে সচেতন এবং সর্বান্তঃকরণে তার মূল আদর্শে প্রত্যাবর্তন করে জীবন অতিবাহিত করতে চায়, তারা তা করতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কারণ ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ আজ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়েছে এবং তার পুনরুদ্ধারও সম্ভব নয়।

এরাসমাস (Erasmus) এর বক্তব্য হলো:

ঐশী বিষয় সমূহে প্রাচীনদের জ্ঞান ছিল সামান্যই। ধর্ম আগে বাহ্যিক আচরণ নয়, অন্তরের বিষয় ছিল। ধর্ম যখন অন্তরের বদলে লিখিত রূপে এল, তখন তা প্রায় সর্বাংশে যত মানুষ তত ধর্মমতের রূপ গ্রহণ করল। খৃষ্টের ধর্মমত, যা প্রথমে কোনো প্রভেদ জানত না, তা দর্শনের সাহায্য- নির্ভর হয়ে পড়ল। চার্চের পতনের এটাই ছিল প্রথম পর্যায়।

এভাবে চার্চ বাধ্য হলো কথায় কি প্রকাশ করা যাবে না তা ব্যাখ্যা করতে। উভয় পক্ষই সম্রাটের সমর্থন আদায় করতে কৌশল গ্রহণ করে। এরাসমাস বলেন,

এ ব্যাপারে সম্রাটের কর্তৃত্বের প্রয়োগ ধর্মের প্রকৃত কোনো সাহায্যে আসে নি...... যখন ধর্ম অন্তরের উপলব্ধি না হয়ে মুখের বুলিতে পরিণত

হয়েছে, তখন পবিত্র বাইবেলের প্রকৃত শিক্ষা বিলুপ্ত হয়েছে। তারপরও আমরা মানুষকে তারা যা বিশ্বাস করে না তা বিশ্বাস করার জন্য, তারা যা ভালো বাসে না তা তাকে ভালো বাসার জন্য, তারা যা জানে না তা জানার জন্য তাদের বাধ্য করছি। যাতে বল প্রয়োগ করা হয় তা আন্তরিক হতে পারে না।[৮]

এরাসমাস বলেন, ঈসা আলাইহিস সালামের প্রত্যক্ষ অনুসারীরা একত্ববাদকে স্বীকার করেছিলেন যা কখনোই তাদের ব্যাখ্যা করতে হয় নি। কিন্তু যখন ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ল এবং চার্চের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল, তখন জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাদের তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হন। এর পর তারা যীশুর শিক্ষা সামগ্রিকভাবে হারিয়ে ফেলেন, তার সাথে সাথে একত্ববাদও হারিয়ে যায়। তাদের একমাত্র আশ্রয় ছিল কিছু শব্দ ও গ্রীক দর্শনের পরিভাষা যার দৃষ্টি ছিল একত্ববাদ নয়, ত্রিত্ববাদের প্রতি। এভাবে বাস্তবতার প্রতি সহজ ও বিশুদ্ধ আস্থা এমন একটি ভাষায় স্থাপিত হলো যা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে ছিল অপরিচিত এবং তা ঈসা আলাইহিস সালাম ও পবিত্র আত্মাকে উপেক্ষা করে জন্ম দেয় ত্রিত্ববাদের। একত্ববাদে বিশ্বাস হারানোর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে মানুষের মধ্যে দেখা দিল বিভ্রান্তি ও বিভেদ।

যারা জানতে চান যে, যীশু কে ছিলেন এবং আসলে তিনি কী শিক্ষা দান করেছিলেন তা জানার জন্য এ উপলব্ধিটি যে কোনো ব্যক্তির জন্যই অত্যাবশ্যক। সে সাথে এ কথাও জানা প্রয়োজন যে, মানুষ ত্রিত্ববাদেই

বিশ্বাস করুক অথবা মুখে একত্ববাদের কথাই বলুক, তাদের কাছে যদি একজন নবীর দৈনন্দিন কার্যাবলী (যা তার শিক্ষার মূর্ত প্রতীক) সম্পর্কে অবহিত হওয়ার কোনো উপায় না থাকে তখন তারা ক্ষতিগ্রস্তই হয়।

## দ্বিতীয় অধ্যায়
## ঈসা আলাইহিস সালামের ঐতিহাসিক বিবরণ

যীশু প্রকৃতপক্ষে কে বা কী ছিলেন তা আবিষ্কারের জন্য মানুষ যত বেশি চেষ্টা করতে থাকে ততই তার সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তার শিক্ষা কর্মকাণ্ডের লিখিত বিবরণ থাকলেও তিনি আসলে কীভাবে জীবন অতিবাহিত করতেন এবং অন্য লোকদের সাথে তিনি প্রতিদিন কীভাবে কাজকর্ম করতেন, সে ব্যাপারে খুব কমই জানা যায়।

যীশু এবং তার কর্মকান্ড সম্পর্কে বহু লোক বিভিন্ন মত দিয়েছে, কিন্তু সেগুলো বিকৃত। এ সবের মধ্যে কিছু সত্যতা যদিও আছে, কিন্তু একথা সত্য যে, বিভিন্ন সময়ে লিখিত ৪টি গৃহীত গসপেল (বাইবেলের নতুন নিয়ম) পরিবর্তিত ও সেঙ্গরকৃতই শুধু হয় নি, সেগুলো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও নয়। প্রথম গসপেলের রচয়িতা মার্ক (Mark)। এটি লিখিত হয় ৬০-৭৫ সনে। তিনি ছিলেন সেন্ট বার্নাবাসের (St. Barnabas)- এর বোনের পুত্র। মথি (Mathew) ছিলেন একজন ট্যাক্স কালেক্টর (কর আদায়কারী) তথা নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি যীশুর সাথে ভ্রমণ করেন নি। লূকের (Luke) গসপেল অনেক পরে লিখিত। তাছাড়া মথি ও মার্কের মত তার গসপেলের বর্ণনার উৎস একই। লুক ছিলেন পলের (পৌল-Paul) চিকিৎসক এবং পলের মত তিনিও কখনো যীশুকে দেখেননি। জনের (ইউহোন্না) গসপেলের উৎস ভিন্ন এবং আরো পরে ১শ' সনের দিকে রচিত। তাকে যীশুর শিষ্য জন (John) মনে

করা ভুল হবে, কারণ তিনি ভিন্ন ব্যক্তি। এই গসপেলকে যীশুর জীবনের নির্ভরযোগ্য বিবরণ বলে গণ্য করা উচিৎ হবে কিনা এবং তা পবিত্র গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা তা নিয়ে দু'শ বছর ধরে উত্তপ্ত বিতর্ক চলেছিল।

বিখ্যাত 'মরু সাগর পুঁথির' (Dead Sea Scrolls) আবিষ্কার যীশু যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানকার সমাজের প্রকৃত ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করে। বার্নাবাসের গসপেলে অন্যান্য গসপেলগুলোর চেয়ে যীশুর জীবনের অনেক বেশি দিক বর্ণিত হয়েছে এবং যীশু প্রকৃতপক্ষে কি ছিলেন, কুরআন ও হাদীস সে বিষয়টি আরো ব্যাখ্যার মাধ্যমে সুস্পষ্ট করেছে।

আমরা দেখতে পাই যে, যীশু আক্ষরিক অর্থে 'ঈশ্বরের পুত্র' ছিলেন না। তার পূর্ববর্তী নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও নবী মূসা আলাইহিস সালাম এবং পরবর্তী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো তিনিও ছিলেন একজন নবী। সকল মানুষের মতো তিনিও খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং হাট- বাজারে যেতেন।

আমরা দেখি, অনিবার্যভাবে তিনি সেই সব লোকদের সাথে নিজেকে সংগ্রামরত দেখতে পেয়েছিলেন যাদের স্বার্থ ছিল তার শিক্ষার বিরোধী। তিনি যে প্রত্যাদেশ লাভ করেন সেটা তারা মেনে নেয়নি অথবা সত্য জানা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে মানুষের চোখে ক্ষমতা লাভ, ধন সম্পদ অর্জন ও খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্য তা ব্যবহার করেছে।

আরো দেখা যায়, যীশুর ইহলৌকিক জীবন ইয়াহূদী ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তার কাহিনি জানতে গেলে সে ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যীশু তার সমগ্র জীবনে ছিলেন একজন গোঁড়া ইয়াহূদী ধর্মাচরণকারী। তিনি বহু বছর ধরে পরিবর্তনের শিকার মূসা আলাইহিস সালামের মূল শিক্ষা পুনর্ব্যক্ত ও পুনরুজ্জীবনের জন্য এসেছিলেন।

পরিশেষে আমরা দেখি, যিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি যীশু নন, তারই মত দেখতে অন্য এক ব্যক্তি। এক রোমান কর্মকর্তা লেন্টালাস (Lentutus) যীশুর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

কান পর্যন্ত বাদামি রঙের চুল ছিল তার, সেগুলো ছিল কোঁকড়ানো এবং সে চুলের বাহারিগুচ্ছ নেমে গিয়েছিল কাঁধের উপর, নাজারেনীয়দের মত মাথার মধ্যভাগে ছিল সিঁথি কাটা। তার ভ্রূ ছিল মসৃণ ও স্পষ্ট, কোনো দাগ ও বলিরেখা শূন্য লালচে মুখমণ্ডল। নাক ও মুখ ছিল নিখুঁত। তার ছিল সুদৃশ্য দাড়ি যার রং ছিল মাথার চুলের রঙের মতই এবং তা মধ্যভাগে বিভক্ত ছিল। তার দু'টি চোখ ছিল নীল ধূসর, তাতে অসাধারণভাবে সব অনুভূতির প্রকাশ ঘটত। তার উচ্চতা ছিল মাঝারি, সাড়ে ১৫ মুঠো (Fists) দীর্ঘ। কঠিন অবস্থায়ও তিনি উৎফুল্ল থাকতেন। কোনো কোনো সময় তিনি কাঁদতেন, তবে কেউ তাঁকে কোনোদিন হাসতে দেখে নি।

হাদীস শরীফে তার বর্ণনা রয়েছে সামান্য পৃথকভাবে:

তার গায়ের রং ছিল সাদা ঘেঁষা লালচে। তিনি কখনো মাথায় তেল দেন নি। তিনি হাঁটতেন খালি পায়ে। দিনের খাবার ছাড়া তার সম্বল ছিল না। তার কোনো ঘর ছিল না। ছিল না কোনো অলংকার, কোনো জিনিসপত্র, পোশাক সামগ্রী, কোনো সম্পদ। তার মাথা থাকত অবিন্যস্ত, তার মুখমণ্ডল ছিল ছোট। এই পৃথিবীতে তিনি ছিলেন এক দরবেশ, পরবর্তী জীবনের জন্য অপেক্ষা মান এবং আল্লাহর ইবাদতে মশগুল।

যীশুর জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায় নি। লূকের মতে ৬ খৃষ্টাব্দে যে আদমশুমারি হয়, তার কাছাকাছি সময়ে যীশু জন্মগ্রহণ করেন। এ কথাও বলা হয়েছে যে, তিনি হেরোদের (Herode) আমলে জন্মগ্রহণ করেন। হেরোদের মৃত্যু হয় ৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে।

ভিনসেন্ট টেইলরের (Vincent Taylor) সিদ্ধান্ত যীশুর জন্ম ৮ খৃষ্টপূর্বাব্দের দিকে হতে পারে।[১] তার মতে, যেহেতু যীশুর প্রকৃত বা আসন্ন জন্মলাভের সংবাদের প্রেক্ষিতে হেরোদ বেথলেহেমের সকল নবজাত শিশুদের হত্যার ফরমান জারি করেছিলেন, সেহেতু যীশুর জন্ম অবশ্যই হেরোদের মৃত্যুর পূর্বেই ঘটেছিল। এমনকি আমরা যদি লূকের গসপেল দেখি, তাহলে দেখা যায়, এই একই গসপেলের দু’টি পঙ্ক্তির বিবরণের মধ্যকার ব্যবধান দশ বছর। অধিকাংশ ভাষ্যকারই দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে বিশ্বাস করেন। এতে বলা রয়েছে, যীশু ৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে অর্থাৎ ‘খৃষ্টের জন্মের চার বছর পূর্বে’ জন্মগ্রহণ করেন।

মাতা মেরীর অলৌকিক গর্ভ ধারণ ও যীশুর জন্মগ্রহণ ব্যাপক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে। কিছু লোকের বিশ্বাস যে তিনি জোসেফের

রক্ত মাংসের সন্তান ছাড়া অন্য কিছু নন। পক্ষান্তরে অলৌকিক ধারণায় বিশ্বাসীদের মতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। তবে এই ‘ঈশ্বরের পুত্র’ কথাটি আক্ষরিকভাবে না আলংকারিকভাবে গ্রহণ করা হবে সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। লূক বলেন,

দূত গাব্রিয়েল ঈশ্বরের কাছ থেকে একজন কুমারীর কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন........ সেই কুমারীর নাম ছিল মেরী এবং দূত তার কাছে আগমন করলেন এবং সম্বোধন করলেন: ‘হে ঈশ্বরের বিপুল অনুগ্রহ প্রাপ্ত রমণী।’ তিনি যখন তাকে দেখলেন, তার কথায় বিব্রত হলেন এবং এ সম্বোধনটির তাৎপর্য উপলব্ধির চেষ্টা করলেন। দূত তাকে বললেন: ‘হে মেরী! আপনি ভীত হবেন না, কারণ আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছেন। আপনার গর্ভ সঞ্চার হবে এবং এক পুত্র জন্ম নিবে, তার নামকরণ করবেন যীশু....।” তখন মেরী দূতকে বললেন: ‘এটা কি করে সম্ভব? আমি কোনো পুরুষকে চিনি না।” .... দূত জবাব দিলেন: “ ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোনো কিছুই অসম্ভব নয়”... মেরী বললেন, “আমি ঈশ্বরের সেবিকা, আমার ব্যাপারে ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।” এরপর দূত প্রস্থান করলেন।[1]

একই ঘটনা কুরআন মজিদে বর্ণিত হয়েছে এভাবে:

“স্মরণ কর, যখন ফিরিশতাগণ বলেছিল: হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীর মধ্যে

[1] লূক: ১ : ২৬-৩৯।

তোমাকে মনোনীত করেছেন.... হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন (পুত্র সন্তানের), তার নাম মসীহ, মারইয়াম তনয় ঈসা.... সে বলল: হে আমার রব! আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করে নি, আমার সন্তান হবে কীভাবে? তিনি বললেন: এভাবেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৪২-৪৭]

৪টি গসপেলের মধ্যে মার্ক ও জন (যোহন-ইউহোন্না) যীশুর জন্ম সম্পর্কে নীরব এবং মথি দায়সারাভাবে তা উল্লেখ করেছেন। এরপর লূক যীশুর বংশ বৃত্তান্ত উল্লেখ করে আবার স্ববিরোধিতার পরিচয় দিয়েছেন, পক্ষান্তরে মার্ক ও জন কোনো বংশ বৃত্তান্ত দেন নি। মথি ও লূকের মধ্যে মথি আদম ও যীশুর মধ্যবর্তী ২৬ জনের নাম উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে লূকের তালিকায় আছে ৪২ জনের নাম। এভাবে দু'জনের বর্ণনায় ১৬ জনের অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। যদি কোনো ব্যক্তির গড় বয়স ৪০ বছরও মেনে নেওয়া যায়, তারপরও যীশুর কথিত পূর্বপুরুষদের দু'টি তালিকার মধ্যে ব্যবধান দাঁড়ায় ৬ শত ৪০ বছর।

কিন্তু যীশুর অলৌকিক জন্মের ব্যাপারে কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বর্ণনা নেই। যীশুর 'ঈশ্বরত্বের'র (Divinity) বিষয়টি কুরআন দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। যীশুর জন্ম গ্রহণের পরপরই যা ঘটেছিল কুরআনে সে বর্ণনা পাঠ করলেই তা সুস্পষ্ট হবে:

﴿فَأَتَتۡ بِهِۦ قَوۡمَهَا تَحۡمِلُهُۥۖ قَالُواْ يَٰمَرۡيَمُ لَقَدۡ جِئۡتِ شَيۡـٔٗا فَرِيّٗا ٢٧ يَٰٓأُخۡتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡءٖ وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِيّٗا ٢٨ فَأَشَارَتۡ إِلَيۡهِۖ قَالُواْ كَيۡفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلۡمَهۡدِ صَبِيّٗا ٢٩ قَالَ إِنِّي عَبۡدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلۡكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيّٗا ٣٠ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيۡنَ مَا كُنتُ وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا ٣١ وَبَرَّۢا بِوَٰلِدَتِي وَلَمۡ يَجۡعَلۡنِي جَبَّارٗا شَقِيّٗا ٣٢ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَيَّ يَوۡمَ وُلِدتُّ وَيَوۡمَ أَمُوتُ وَيَوۡمَ أُبۡعَثُ حَيّٗا ٣٣ ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖ قَوۡلَ ٱلۡحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمۡتَرُونَ ٣٤ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٖۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٣٥﴾ [مريم: ٢٧، ٣٥]

“এরপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলো। তারা বলল: ‘হে মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছ! হে হারুণের বোন, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী।” এরপর মারইয়াম সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করল। তারা বলল, ‘যে কালের শিশু, তার সাথে আমার কেমন করে কথা বলল?” সে বলল. “আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী করেছেন। যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন জীবদ্দশা পর্যন্ত সালাত ও যাকাত আদায় করতে, আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করেছেন, তিনি আমাকে করেন নি উদ্ধত ও হতভাগ্য। আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় আমি পুনরুত্থিত হব।” এই-ই ঈসা মারইয়াম তনয়। আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র মহিমাময়।

তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন ‘হও’ আর তা হয়ে যায়।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ২৭-৩৫]

আদম আলাইহিস সালামের জন্ম সবচেয়ে বড় অলৌকিক ঘটনা যেহেতু পিতা বা মাতা ছাড়াই তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। হাওয়ার জন্মও যীশুর জন্মের চেয়ে অনেক বড় অলৌকিক ঘটনা, যেহেতু তিনি কোনো মা ছাড়াই জন্মে ছিলেন। কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٖ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٥٩﴾ [آل عمران: ٥٩]

“আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি থেকে, তারপর তিনি তাকে বলেছিলেন: ‘হও’ এবং সে হয়ে গেল।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৯]

যীশু যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে যিা ঘটেছিল তার প্রেক্ষাপটে যীশুর জীবনকে বিচার করা গুরুত্বপূর্ণ। ইয়াহূদী জগতে এটা ছিল এক মহা গোলযোগের কাল। ইয়াহূদীরা তাদের ইতিহাসে বার বার আগ্রাসনের শিকার হয়ে হানাদারের পদতলে নিষ্পিষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। যা হোক, বারংবার পরাজয় ইয়াহূদীদের অসহায় করে তোলে, ফলে তাদের মনে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে ঘৃণার আগুন। তা সত্ত্বেও, গভীর হতাশা ভরা দিনগুলোতেও ইয়াহূদীদের একটি বড় অংশই তাদের মানসিক ভারসাম্য বহাল রাখে এ আশায় যে, এক নয়া

মূসা আলাইহিস সালাম আসবেন এবং তার সহযোগীদের নিয়ে আগ্রাসনকারীদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হবেন, আবার প্রতিষ্ঠিত হবে যিহোভার শাসন। তিনি হবেন মেসিয়াহ্ (Messiah) অর্থাৎ অভিষিক্ত যীশু।

ইয়াহূদী জাতির মধ্যে একটি অংশ ছিল যারা সবসময় ক্ষমতাসীনদের পূঁজা করত। প্রতিকূল অবস্থায়ও নিজেদের সুবিধা লাভের জন্য তারা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পাল উড়িয়ে দিত। তারা ধনসম্পদ ও ধর্মীয় অবস্থানের দিক দিয়ে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইয়াহূদী জাতির অবশিষ্ট অংশ তাদের বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই গণ্য করত।

এ দু'টি অংশ ছাড়াও ইয়াহূদীদের মধ্যে তৃতীয় আরেকটি দল ছিল যাদের সাথে পূর্বোক্ত দু'টি দলের ব্যাপারে পার্থক্য ছিল। তারা আশ্রয় নিয়েছিল জঙ্গলে এবং তাওরাত অনুযায়ী তারা ধর্ম পালন করত। যখনই সুযোগ আসত তখনি তারা হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করত। এ সময় রোমানরা তাদের গুপ্ত ঘাঁটিগুলো খুঁজে বের করার জন্য বহুবার চেষ্টা চালিও ব্যর্থ হয়। এই দেশ প্রেমিক ইয়াহূদীদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে থাকে। জোসেফাসের কাছ থেকে তাদের কথা প্রথম জানা যায়। তিনি ইয়াহূদীদের এ ৩টি দলকে যথাক্রমে ফারীসী (Pharisees), সাদ্দুকী (Sadducces) ও এসেনি (Essenes) বলে আখ্যায়িত করেন।

এসেনিদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেলেও বিশদ কিছু জানা যায় না। ৪টি গসপেলের কোনোটিতেই তাদের নাম একবারও উল্লেখ

হয় নি। এর পর নাটকীয় আকস্মিকতার মধ্যে মরু সাগরের কাছে জর্দানের পাহাড়গুলোতে মরু সাগর পুঁথি (Dead Sea Scrolls) নামে পরিচিত দলীল-পত্র আবিষ্কৃত হয়। এ আবিষ্কার বিশ্বের বুদ্ধিজীবী ও যাজক মহলে ঝড় তোলে। এ প্রসঙ্গে এ দলিল- পত্র কীভাবে আবিষ্কৃত হলো সে কাহিনির কিছুটা উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৪৭ সাল। কুমরানের কাছে প্রান্তরে এক আরব বালক মেষ চরাচ্ছিল। এক সময় সে লক্ষ করল, পালে একটি মেষ নেই। কাছেই পাহাড়। মেষটি হয়তো সেদিকেই গেছে ভেবে বালকটি পাহাড়ে গিয়ে মেষ খুঁজতে শুরু করল। এক সময় তার নজরে পড়ল একটি গুহা। সে ভাবল, মেষটি বোধহয় এর মধ্যেই ঢুকে পড়েছে। বালকটি গুহার ভিতরে একটি পাথর নিক্ষেপ করল। পাথরে পাথরে সংঘর্ষের শব্দ শোনার আশা করছিল সে। কিন্তু তার পরিবর্তে মনে হলো, পাথরের টুকরোটি কোনো মাটির পাত্র জাতীয় কোনো বস্তুর গায়ে আঘাত করেছে। মুহূর্তেই তার মনে রঙিন স্বপ্ন ডানা মেলে। সে ভাবল, নিশ্চয় কোনো গুপ্তধন আছে এ গুহায়। পরদিন সকালে সে আবার গুহায় ফিরে আসে। সাথে একজন বন্ধুকেও নিয়ে যায় সে। দু'জনে গুহার ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু হতাশ হয় তারা। গুহার কোথাও গুপ্তধন নেই। তার পরিবর্তে ভাঙাচোরা মাটির জিনিসপত্রের মধ্যে তারা কয়েকটি মাটির কলস (Jar) দেখতে পেল। এর ভেতর থেকে একটি কলস নিয়ে নিজেদের তাঁবুতে এল তারা। সেটি ভেঙে ফেলার পর তাদের শেষ আশাটুকুও বিলীন হয়ে গেল। কলসের ভেতর থেকে পাওয়া গেল চামড়ায় লেখা একটি পুঁথি। গোটানো পুঁথিটি খুলতে খুলতে শেষ পর্যন্ত

তা তাঁবুর এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত পৌছল। এটা ছিল সেই পুঁথিগুলোর একটি যা পরে আড়াই লাখ ডলারে বিক্রি হয়। আরব বালকটি কয়েক শিলিং এর বিনিময়ে কানডো (Kando) নামক এক সিরীয় খৃষ্টানের কাছে পুঁথিটি বিক্রি করে দেয়। কানডো ছিল একজন মুচি। সে বহু পুরোনো চামড়াটি কিনেছিল এ জন্য যে, এটা হয়তো কোনো পুরোনো জুতা মেরামতে কাজে লাগবে। হঠাৎ কানডো লক্ষ করে যে চামড়াটির উপরে কীসব লেখা রয়েছে। কিন্তু ভাষাটি তার অজানা থাকায় সে কিছুই বুঝতে পারল না। ভালো করে দেখে নিয়ে সে পুঁথিটি জেরুজালেমের সেন্ট মার্ক মঠের সিরীয় আর্চ বিশপকে দেখাবে বলে মনস্থ করল। এভাবে এ দুই ব্যক্তি অর্থোপার্জনের কারণে পূঁথিটি এক দেশ থেকে অন্য দেশে বয়ে নিয়ে যায়।

জর্দানের আমেরিকান ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে এ পুঁথিগুলো ওল্ড টেস্টামেন্টের টিশাইয়ের গ্রন্থের (Book of Tsaiah) জ্ঞাত কপিগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে দেখা গেল। এর ৭ বছর পর পুঁথিগুলো ইসরাইল সরকার কর্তৃক জেরুজালেমের গ্রন্থ মন্দিরে (Shrine of the book) রক্ষিত হয়।

মোটামুটি হিসেবে জর্দান নদীর তীরবর্তী পাহাড়ে প্রায় ৬শ গুহা রয়েছে। এ সব গুহাতেই বাস করত এসেনীরা। এ ইয়াহূদী সম্প্রদায়টি মানুষের সংশ্রব ত্যাগ করেছিল। কারণ, তারা বিশ্বাস করত যে, একজন প্রকৃত ইয়াহূদী শুধুমাত্র যিহোভার (Jehovah) (ওল্ড টেস্টামেন্টে ঈশ্বরকে যিহোভা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে) সার্বভৌমত্বের অধীনেই বাস

করতে পারে, অন্য কারো কর্তৃত্বের অধীনে নয়। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী রোমান সম্রাটের অধীনে যে ইয়াহূদী বসবাস এবং তাকে প্রভূ হিসেবে স্বীকার করে সে পাপ কাজ করে।

পৃথিবীর ভোগ-বিলাস, আড়ম্বরপূর্ণ জীবন এবং অদম্য সেই শক্তি যা অনিবার্যভাবে মানুষকে ঠেলে দেয় বিরোধ ও আত্ম-ধ্বংসের পথে, প্রভৃতি কারণে বীতশ্রদ্ধ এ ইয়াহূদী সম্প্রদায় মরু সাগরের তীরবর্তী পাহাড়ে নির্জন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। পাহাড়ের গুহায় বসবাসের এ জীবন তারা বেছে নিয়েছিল এ কারণে যে নীরব-নিভৃত পরিবেশে তারা পবিত্র জীবন যাপনে মনোনিবেশ করতে পারবে এবং মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। মন্দিরের বহু ইয়াহূদীর মত তারা ওল্ড টেস্টামেন্টকে অর্থোপার্জনের কাজে ব্যবহার করে নি, বরং পবিত্র গ্রন্থের শিক্ষানুযায়ী জীবন-যাপনের চেষ্টা করে। এ জীবন-যাপনের মাধ্যমে শুদ্ধতা ও পবিত্রতা লাভ করতে পারবে বলে তারা আশা করেছিল। ঈশ্বরের নির্দেশ ইয়াহূদীরা অনুসরণ না করায় প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছিল। সেই পথ তারা কীভাবে পরিহার করেছে, অবশিষ্ট ইয়াহূদীদের সামনে তার দৃষ্টান্ত স্থাপনই ছিল তাদের লক্ষ্য।

তারা আধ্যাত্মিক গান রচনা করেছিল যা মানুষের হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। একজন অধ্যাত্মবাদীর জীবনকে ঝড়ে পতিত জাহাজের ন্যায় বলে একটি গানে উল্লেখ রয়েছে। অন্য একটি গানে একজন অধ্যাত্মবাদীকে তলোয়ারের মত জিহবা বিশিষ্ট সিংহ পরিপূর্ণ অরণ্যে ভ্রমণকারী একজন পথিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পথের শুরুতে

একজন আধ্যাত্মবাদী যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তাকে তুলনা করা হয়েছে প্রথম সন্তানের জন্মদাত্রী মায়ের অভিজ্ঞতার সাথে। যদি সে এই বিপর্যয় পাড়ি দিতে সক্ষম হয় তাহলেই সে ঈশ্বরের পাক-পবিত্র আলোকধারায় স্নাত হয়। তখন সে উপলব্ধি করে যে, মানুষ মাটি ও পানির মিশ্রণে তৈরি এক ব্যর্থ ও শূন্য সৃষ্টি মাত্র। কঠিন দুর্ভোগ অতিক্রম করে এবং সন্দেহ ও হতাশার সাগর পেরিয়ে আসার পর সে লাভ করে অশান্তির মধ্যে শান্তি, দুঃখের মধ্যে সুখ এবং বেদনার মধ্যে আনন্দের এক মধুর জীবন। তারপর সে নিজেকে দেখতে পায় ঈশ্বরের ভালোবাসা মুড়ানো অবস্থায়। এ পর্যায়ে অপরিসীম কৃতজ্ঞতার সাথে সে উপলব্ধি করে যে, কীভাবে তাকে অতল গহবর থেকে তুলে আনা হয়েছে এবং স্থাপন করা হয়েছে উঁচু সমতল ভূমিতে। এখানে ঈশ্বরের আলোয় হাঁটতে হাঁটতে পৃথিবীর নির্মম শক্তির সামনে সে অটল অবিচল হয়ে দাঁড়ায়।

মরু সাগর পুঁথি আবিষ্কারের পূর্বে এসেনীদের বিষয়ে অতি অল্পই জানা যেত। প্লিনি (Pliny) ও জোসেফাস (Josephus) তাদের কথা উল্লেখ করলেও পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের দ্বারা কার্যত তারা উপেক্ষিত হয়েছে। প্লিনি এই মানব গোষ্ঠীকে বিশ্বের অন্য যে কোনো মানব গোষ্ঠীর চেয়ে অধিকতর উল্লেখযোগ্য বলে বর্ণনা করেছেন।

তাদের স্ত্রী নেই, তারা যৌন সংসর্গ পরিত্যাগ করে, তাদের কোনো অর্থ সম্পদ নেই.... তাদের জীবনাচারণ দেখে বিপুল সংখ্যক লোক তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এভাবে তাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল....

এভাবে এ গোষ্ঠীটি হাজার হাজার বছর টিকে ছিল যদিও তারা কোনো সন্তান উৎপাদন করত না। জোসেফাস, যার জীবন শুরু হয়েছিল একজন এথেনী হিসেবে, তিনি লিখেছেন যে এথেনীরা বিশ্বাস করত যে আত্মা অমর। এটা ঈশ্বরের প্রদত্ত এক উপহার। ঈশ্বর কিছু কিছু আত্মাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে নিজের জন্য পবিত্র করে নেন। এভাবে বিশুদ্ধকরণকৃত ব্যক্তি সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্রতা অর্জন করে।

যুগে যুগে বিজয়ী বহিঃশক্তি মন্দির ধ্বংস ও ইয়াহূদীদের বহুবার পরাজিত করা সত্ত্বেও এ গুহাবাসীদের জীবন-যাত্রায় তার কোনো প্রভাব পড়ে নি। তাদের এই স্বেচ্ছা নির্বাসনের জীবন ধর্মের পবিত্রতা এবং বিদেশি আগ্রাসন থেকে জুডিয়াকে (Judea) মুক্ত করার জন্য প্রতিটি ইয়াহূদীর সংগ্রামের দায়িত্ব থেকে পলায়ন ছিল না। প্রাত্যহিক প্রার্থনা ও পবিত্র গ্রন্থ পাঠের পাশাপাশি তাদের কেউ কেউ একটি সুদক্ষ বাহিনী গড়ে তুলেছিল যারা শুধু মূসা আলাইহিস সালামের ধর্মই প্রচার করত না, উপরন্তু নির্দেশিত পথে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতেও প্রস্তুত ছিল। তাদের যুদ্ধ ছিল শুধুমাত্র ঈশ্বরের সেবার জন্য, ক্ষমতা লাভ বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। এই যোদ্ধা বাহিনীর সদস্যদেরকে শত্রুরা ‘ধর্মান্ধ ইহুদি’ বলে আখ্যায়িত করত। তারা এক পতাকার অধীনে সংগঠিত ছিল এবং প্রতিটি গোত্রের নিজস্ব পরিচিতি পতাকা ছিল। তারা ছিল ৪টি ডিভিশনে বিভক্ত এবং প্রতিটি ডিভিশনের শীর্ষে ছিল একজন প্রধান। প্রতিটি ডিভিশনই গঠিত ছিল ইসরাইলের ৩টি গোত্রের লোক নিয়ে। এভাবে ইয়াহূদীদের ১২টি গোত্রের সকলেই এক পতাকার নীচে

সংগঠিত হয়েছিল। বাহিনীর প্রধানকে একজন লেবীয় পুরোহিত হতে হত। তিনি শুধু একজন সামরিক অধিনায়কই ছিলেন না, আইনের একজন শিক্ষকও ছিলেন। প্রতিটি ডিভিশনের তার নিজস্ব মাদ্রাসা ('মিদরাস' বা স্কুল) ছিল এবং পুরোহিতদের একজন সামরিক কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও বিদ্যালয়ে নিয়মিত "দরশ" বা শিক্ষা প্রদান করতে হত।

এভাবে এসব গুহায় আদিম পরিবেশে বাস করে এসেনীরা আনন্দ-বিলাস পরিত্যাগ করেছিল, তারা বিবাহকে ঘৃণা করত এবং ধন-সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণা ছিল। তারা একটি গুপ্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তাদের গুপ্ত বিষয়সমূহ সদস্য নয় এমন কারো কাছে কখনোই প্রকাশ করা হত না। রোমকরা তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানলেও তাদের চারপাশের গোপনীয়তার মুখোশ ভেদ করতে পারে নি। প্রতিটি অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় ইয়াহূদীরই স্বপ্ন ছিল এই সমাজের সদস্য হওয়া, কারণ বিদেশি হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করার এটাই ছিল একমাত্র সহজলভ্য পন্থা।

প্লিনির বর্ণনা থেকে আমরা যেমনটি জানতে পারি, কার্যতও এসেনীরা বিবাহকে ঘৃণা করত। তবে তারা অন্যদের নম্র ও বাধ্য শিশুদের তাদের নিকটজন হিসেবে গ্রহণ করত এবং নিজেদের জীবন ধারায় তাদের গড়ে তুলত। এভাবেই শত শত বছর ধরে এসেনীরা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল যদিও তাদের সমাজে কোনো শিশুর জন্ম হত না। এভাবেই, টেম্পল অব সলোমন বা সলোমন মন্দিরের প্রধান

পুরোহিত যাকারিয়া (Zachariah) বৃদ্ধ বয়সে যখন একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন তিনি তাকে এসেনীয়দের আদিম পরিবেশে পাঠিয়ে দেন এবং সেখানেই তিনি বেড়ে ওঠেন। ইতিহাসে তিনিই জন দি ব্যাপটিষ্ট (John the Baptist) বা ব্যাপটিষ্ট জন নামে পরিচিত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এসেনী সম্প্রদায় তাদের আদিম পরিবেশে অস্তিত্বশীল ছিল। তাদের কাছে যাকারিয়ার সন্তান প্রেরণের কারণও বোধগম্য। তিনি তার বহুকাংখিত পুত্রকে মরুভূমিতে একাকী পাঠান নি, তিনি সবচেয়ে বিশ্বস্ত সম্প্রদায়টির কাছে তার দায়িত্ব ভার অর্পণ করেছিলেন যে সম্প্রদায় জীবন যাপন করত যিহোভার সন্তুষ্টি সাধনের জন্য। যাকারিয়ার পত্নী এলিজাবেথের জ্ঞাতি বোন মেরীকে যাকারিয়া লালন-পালন করেছিলেন। কারণ, মেরীর মা তাকে মন্দিরের সেবায় উৎসর্গ করার মানত করে তাকে যাকারিয়ার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এই পরিবেশে যীশুর জন্ম গ্রহণ ঘটে।

ইয়াহূদীরা মনে করত যে মেসিয়াহ (Messiah) নামে একজন নয়া নেতার আবির্ভাব ঘটবে। তিনি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হবেন এবং তাদের রাজাকে হত্যা করবেন। তার আশু জন্মগ্রহণের গুজব ইয়াহূদীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার পর যেখানে মেসিয়াহর জন্মগ্রহণের কথা, সেই বেথলেহেমে জন্ম গ্রহণকারী সকল শিশুকে হত্যা করার জন্য হেরোদ (Herod) সিদ্ধান্ত নেয়। যাকারিয়া এসেনীদের শক্তিশালী গুপ্ত সমাজকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেন। মেরী রোমক সৈন্যদের লৌহ বেষ্টনী

ভেদ করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি যীশুকে নিয়ে মিশর গমন করেন। সেখানে এসেনীদের আরেকটি সম্প্রদায় বাস করত।

মরু সাগর পুঁথি (Dead Sea Scroll) আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত মেরী ও যীশুর আকস্মিক অন্তর্ধান এবং রোমান কর্তৃপক্ষের হাত থেকে তাদের নিরাপদ পলায়নের বিষয়টি রহস্যাবৃত এবং নান জল্পনা- কল্পনার উৎস ছিল। কোনো গসপেলেই এ অধ্যায়টি সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। এসেনী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থেকে এটা বোঝা যায় যে, কীভাবে যীশুর জন্মকালীন ব্যাপক প্রচারণা সত্ত্বেও অনুসরণকারীদের চোখ এড়িয়ে তারা (মেরী ও যীশু) সাফল্যের সাথে পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্য কোনো পরিস্থিতিতে, যে শিশুটি চমৎকারভাবে গুছিয়ে প্রামাণিক কথাবার্তা বলতেন এবং মেষপালকরা ও ম্যাগি (Magi) যাকে দর্শন করেছিলেন, তিনি কিছুতেই এত সহজে পালিয়ে যেতে পারতেন না।

খৃষ্টপূর্ব ৪ সনে যীশুর বয়স যখন ৩ বা ৪ বছর, তখন হেরোদের মৃত্যু হয়। ফলে যীশুর আশু প্রাণ সংশয় ভীতি অপসারিত হয় এবং তিনি তখন অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারতেন। মনে হয়, এসেনী শিক্ষকদের কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন। যেহেতু তিনি অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন সে কারণে খুব দ্রুত তাওরাত শিক্ষা করতে পেরেছিলেন। ১২ বছর বয়সে তাকে মন্দিরে প্রেরণ করা হয়। এ সময় দেখা গেল, বারবার পাঠ পুনরাবৃত্তির পরিবর্তে তিনি অটল আস্থা ও পান্ডিত্যের সাথে কথা বলছেন।

কয়েকজন মুসলিম ঐতিহাসিকের বিবরণে তার শিশু কালে সংঘটিত অলৌকিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে। সালাবীর ‘কাসাসুল আম্বিয়া’ গ্রন্থে আছে।

ওয়াহাব বলে: বালক ঈসার প্রথম যে নিদর্শন লোকেরা প্রত্যক্ষ করল তা হলো এই যে, তার মাতা মিশরের একটি গ্রামে গ্রাম প্রধানের বাড়িতে বাস করতেন। ছুতার মিস্ত্রি যোশেফ যিনি মারইয়ামের সাথে মিশর গমন করেছিলেন তিনিই তাকে সে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। দরিদ্র ছুতার মিস্ত্রি গ্রাম প্রধানের বাড়ি মেরামত করতেন। একবার গ্রাম প্রধানের তহবিল থেকে কিছু অর্থ চুরি যায়। কিন্তু তিনি দরিদ্র ছুতারকে সন্দেহ করেন নি। গ্রাম প্রধানের এই অর্থ চুরির ঘটনায় মারইয়াম দুঃখিত হন। বালক ঈসা মাতাকে গৃহস্বামীর অর্থ চুরির ঘটনায় দুঃখ-কাতর দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: মা, আপনি কি চান যে, আমি এই চুরি যাওয়া অর্থের সন্ধান করি। তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ বাছা। তিনি বললেন: তাহলে গৃহস্বামীকে বলুন সব দরিদ্রদের আমার কাছে ডেকে আনতে। একথা শুনে মারইয়াম গৃহস্বামীর কাছে গিয়ে তাকে তার পুত্রের কথা জানালেন। তিনি সব দরিদ্র ব্যক্তিকে ডেকে আনলেন। তারা সবাই এসে পৌঁছলে ঈসা আলাইহিস সালাম তাদের মধ্যে দু’ব্যক্তির কাছে গেলেন। এদের একজন ছিল অন্ধ, অন্যজন ছিল খোঁড়া। তিনি খোঁড়া ব্যক্তিকে অন্ধ ব্যক্তির ঘাড়ের ওপর তুলে দিলেন। তারপর তাকে বললেন: উঠে দাঁড়াও। অন্ধ লোকটি জবাব দিল, এ ব্যক্তিকে ঘাড়ে করে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি আমার নেই। ঈসা আলাইহিস সালাম তখন বললেন: গতকাল এ শক্তি তুমি কীভাবে পেয়েছিলে?

উপস্থিত লোকজন ঈসা আলাইহিস সালামের একথা শুনে অন্ধ ব্যক্তিকে মারধর করতে শুরু করার সে উঠে দাঁড়াল। সে উঠে দাঁড়াতেই খোঁড়া ব্যক্তি গৃহস্বামীর ধন-ভাণ্ডারের জানালার কাছে পৌঁছে গেল। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম গৃহস্বামীর উদ্দেশ্যে বললেন: এভাবেই তারা গতকাল আপনার সম্পদ চুরি করেছে। অন্ধ লোকটি খোঁড়ার দৃষ্টিশক্তি এবং খোঁড়া দু'জনই একযোগে বলে উঠল: হ্যাঁ, ইনি সত্য কথাই বলেছেন। তারপর তারা চুরি করা অর্থ গ্রামপ্রধানকে ফিরিয়ে দিল। তিনি সেগুলো নিজের ধনভাণ্ডারে রাখলেন। বললেন: হে মারইয়াম, তুমি এর অর্ধেকটা গ্রহণ কর। তিনি জবাবে বললেন: অর্থের প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই। গ্রাম প্রধান বললেন: ঠিক আছে, এ অর্থ তাহলে তোমার পুত্রকে দাও। মারইয়াম বললেন: তার মর্যাদা আমার চেয়েও অধিক। .....এ সময় ঈসার আলাইহিস সালাম বয়স ছিল ১২ বছর।

**দ্বিতীয় নিদর্শন:**

সুদ্দী বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম যখন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতেন তখন তিনি তার সহপাঠী ছেলেদের কাছে তাদের পিতা-মাতারা কি করছেন, তা বলে দিতেন। তিনি এক একদিন এক একটি ছেলেকে বলতেন: বাড়ি যাও, তোমরা বাড়ির লোকেরা অমুক অমুক জিনিস আহার করছে এবং তোমার জন্য অমুক অমুক জিনিস তৈরি করছে এবং তারা অমুক অমুক খাবার খাচ্ছে। একথা শুনে ছেলেটি বাড়ি চলে যেত এবং তার কাছে যা যা শুনেছে সেগুলো তাকে না দেওয়া পর্যন্ত কান্নাকাটি করত। বাড়ির লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করত কে তোমাকে

এগুলো বলেছে? সে বলত ঈসা। কয়েকটি ঘটনা ঘটার পর বাড়ির লোকেরা ছেলেগুলোকে একটি বাড়িতে আটক রাখল। ঈসা আলাইহিস সালাম তাদের খুঁজতে খুঁজতে সেখানে গেলেন। লোকদের কাছে ছেলেদের কথা জানতে চাইলে তারা বলল, তারা সেখানে নেই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তাহলে এ বাড়িতে কী আছে? তারা বলল: শূকর। তিনি বললেন: তারা শূকরে পরিণত হোক। তারপর লোকেরা দরজা খুলে শুধু শূকরই দেখতে পেল। ইসরাইলের শিশুরা ঈসার আলাইহিস সালাম জন্য বিপাকে পড়েছিল। তার মা এ কারণে তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি তাকে একটি গাধার পিঠে তুলে মিসেরর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন......।

আতা বলেন, মারইয়াম ঈসা আলাইহিস সালামকে বিদ্যালয় থেকে নিয়ে এসে বিভিন্ন রকম কাজ শেখানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। সর্বশেষ তিনি তাকে বস্ত্র রঞ্জনকারীদের কাছে দিলেন। তিনি তাকে বস্ত্র রঞ্জনকারীদের প্রধানের হাতে তুলে দিলেন যাতে তিনি তার কাছ থেকে কাজ শিখতে পারেন। কিছু দিন কেটে গেল। সে লোকটির কাছে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র ছিল। তিনি এগুলো নিয়ে সফরের যাচ্ছিলেন। তিনি ঈসা আলাইহিস সালামকে বললেন: তুমি এখন ব্যবসা শিখেছ। আমি ১০ দিনের জন্য সফরে যাচ্ছি। এই বস্তুগুলো বিভিন্ন রঙের। এগুলো কোনো রঙে রং করা হবে আমি তা চিহ্নিত করে রেখেছি। আমি চাই যে, আমার ফিরে আসার আগেই এ কাজগুলো তুমি সম্পন্ন করে রাখবে। তারপর তিনি চলে গেলেন। ঈসা আলাইহিস সালাম একটি রং করার পাত্রে একটি রং তৈরি করলেন এবং সকল কাপড় তার মধ্যে ডুবিয়ে

দিয়ে আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। নির্দিষ্ট দিনে বস্ত্র রঞ্জনকারী ফিরে এলেন। তিনি দেখলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম একটি রঙের পাত্রে সকল বস্ত্র রেখেছেন। তিনি চিৎকার করে বললেন: হায় হায়! এ তুমি কি করেছ? তিনি জবাব দিলেন: আমি কাজটি সম্পন্ন করেছি। বস্ত্র রঞ্জনকারী বললেন: সেগুলো কোথায়? তিনি বললেন: রঙের পাত্রেই সব রয়েছে। বস্ত্র রঞ্জনকারী বললেন, সবগুলো? তিনি বললেন: হ্যাঁ। বস্ত্র রঞ্জনকারী বললেন: সকল কাপড় তুমি একটি পাত্রে কীভাবে রাখলে? তুমি সবগুলো কাপড়ই নষ্ট করে দিয়েছ। তিনি বললেন: ওগুলো তুলুন এবং দেখুন। তিনি কাপড়গুলো তুললেন। ঈসা আলাইহিস সালাম একটি হলুদ, একটি সবুজ একটি লাল এভাবে একের পর এক বিভিন্ন রঙের কাপড় তার হাতে তুলে দিতে থাকলেন। দেখা গেল, বস্ত্র রঞ্জনকারী যেমনটি চেয়েছেন সেগুলো তেমনটিই হয়েছে। এবার বস্ত্র রঞ্জনকারীর বিস্মিত হবার পালা। তিনি বুঝতে পারলেন, যা ঘটেছে তা সবই আল্লাহর ইচ্ছায়। তিনি কত না গৌরবময়। তখন বস্ত্র রঞ্জনকারী লোকজনকে ডেকে বলতে থাকলেন: তোমরা দেখে যাও ঈসা আলাইহিস সালাম কি করেছেন। এরপর তিনি এবং তার সহচররা তাঁকে বিশ্বাস করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনলেন এবং তার অনুসারীতে পরিণত হলেন।

যীশুর শিশুকালে একটি গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে যে জন (John) এসেনী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে চলে এসেছেন এবং নির্জনে বাস করছেন। তার পরনে রয়েছে শুধু মাত্র উটেরলোমের তৈরি একটি বস্ত্র এবং কোমরে রয়েছে চামড়ার বন্ধনী। তিনি শুধু ফল-মূল এবং বন্য মধু আহার করেন:

(মিথি ৩ : ৪)। তিনি সরাসরি লোকজনের মধ্যে ধর্মপ্রচার করেন। তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষা নবিশির জন্য জোর করেন না যা কিনা এসেনী ভ্রাতৃসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য অত্যাবশ্যক। তিনি জনগণের মধ্যে আলোড়ন তুলেছেন। তিনি যিহোভার দিকে ফিরে আসার জন্য সকলের প্রতি ডাক দিয়েছেন এবং সকলকে আশ্বাস দিয়েছেন যে শিগগিরই ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হিসাবে জোসেফাস কর্তৃক লিখিত অন্য এক সন্ন্যাসীর ইতিহাস পাঠও আগ্রহোদ্দীপক। জোসেফাস ছিলেন ঐ সন্ন্যাসীর শিষ্য। জোসেফাস এক কঠোর তপস্যায় তিন বছর নির্জন স্থানে অতিবাহিত করেন। এ সময় তিনি বানাস (Bannus) নামক এক সন্ন্যাসীর তত্ত্বাবধানে ছিলেন যিনি শুধুমাত্র গাছের পাতা দিয়ে তৈরি পোশাক পরতেন, বুনো ফল-মূল আহার করতেন এবং শীতল পানিতে অবিরাম অবগাহনের মাধ্যমে নিজের কাম-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। সুতরাং সন্ন্যাসীদের সকল সাধারণ প্রথা জন মেনে চলতেন ও অনুসরণ করতেন, এটাই স্বাভাবিক।

ডেভিড এবং তার পূর্বেকার নবীগণের কাছে নির্জন স্থানগুলো ছিল আশ্রয়স্থল। এখানে এসে ইয়াহূদীরা তাদের বিদেশি শাসকদের আধিপত্য ও ভুয়া ঈশ্বরের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারত। এখানে পৌত্তলিক শাসকদের অধীন থাকার বা তাদের একটুখানি কৃপাদৃষ্টি লাভের কোনো ব্যাপার ছিল না। এ রকম পরিবেশে স্রষ্টার ওপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হত এবং একমাত্র তারই ইবাদত হত। এটা ছিল

একত্ববাদের দোলনা। মরুভূমির এই নির্জন অঞ্চলে এসে মানুষের মন থেকে নিরাপত্তার মিথ্যা ধারণাটি অপসারিত হয়ে যেতে এবং সে শুধু বাস্তবতার ওপরই নির্ভরশীল হতে শিখত। “নির্জন বিরানা প্রান্তরে অন্যান্য সব কিছুই অসার প্রতিপন্ন হত এবং মানুষ সকল প্রাণের চিরন্তন উৎস, সকল নিরাপত্তার মূল শক্তি এক প্রভূর কাছে খোলাখুলিভাবে সমর্পিত হত।”[২] সেই নির্জনতায় সংগ্রামের দু'টি দিক ছিল। প্রথমত: যারা ঈশ্বরের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জীবন যাপন করতে চাইত, নিজেদের সাথে এই সংগ্রামের ফলে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা তাদের মনে দৃঢ় মূল হত। দ্বিতীয়ত: এই পথ অবলম্বনের ফলে যারা অন্যপন্থায় জীবন যাপন করতে চাইত তাদের সাথে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠত। প্রথম সংগ্রামটি ছিল যিহোভাকে বিশ্বাসের এবং আধ্যাত্মিক সাফল্যের প্রশ্ন, তা সে দ্বিতীয় লড়াইতে জয়ী হোক আর না হোক।

জনের উদাত্ত আহ্বান বিপুল সংখ্যক লোককে আকৃষ্ট করতে শুরু করল। তিনি এসেনীয়দের জীবনাচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিলুপ্ত করলেন। সেটি ছিল- সম্প্রদায়ের কোনো গুপ্ত বিষয়ই কারো কাছে প্রকাশ করা যাবে না- এমনকি নির্যাতনে মৃত্যু হলেও নয়”[৩] আগের মত কঠোর নিয়ম পালিত না হওয়ায় আন্দোলনের মধ্যে রোমানদের জন্য গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ ঘটানো সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু জন তার নবী সুলভ ক্ষমতাবলে এসব ছদ্মবেশী লোকদের পরিচয় জেনে ফেলতে সক্ষম হন। তিনি তাদের ‘বিষাক্ত সাপ’ (Vipers) বলে আখ্যায়িত করেন (মথি ৩ : ৭)। তার কনিষ্ঠ জ্ঞাতি ভ্রাতা যীশু এ আন্দোলনে যোগ দেন এবং সম্ভবত তিনি ছিলেন গোড়ার দিকে অভিষিক্তদের অন্যতম। তার

সর্বক্ষণের সঙ্গী বার্ণাবাসও সম্ভবত তার সাথেই দীক্ষা গ্রহণ করেন। যীশুর অন্য সঙ্গী ম্যাথিয়াসও তার সাথেই দীক্ষিত হন।

জন জানতেন যে, তিনি লড়াই শুরু করার আগেই 'বিষাক্ত সাপেরা' সফল হতে যাচ্ছে। কিন্তু যীশুর দীক্ষা গ্রহণের ফলে তিনি এতই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তার মৃত্যুর সাথেই যে তার আন্দোলন শেষ হয়ে যাবে না এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। জন যেমনটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তেমনটিই হলো। রাজা হেরোদ তার শিরশ্ছেদ করলেন। ফলে তার আন্দোলনের সকল ভার যীশুর কাঁধে এসে পড়ল।

যীশু এসময় ছিলেন ৩০ বছরের যুবক। তার কাজের মেয়াদ ৩ বছরের বেশি স্থায়ী হয় নি। তিনি উপলব্ধি করেন যে, তার প্রস্তুতির কাল শেষ ও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। সময়টির পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য আমরা যীশুকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করব এবং বিশেষ করে ইয়াহূদী ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিব। এগুলো পুনরায় সে বিষয়গুলোকেই ব্যাখ্যা করবে ইতিমধ্যে যেগুলো ঘটতে শুরু করেছিল। যেমন, এসেনী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব, জনের কর্মকান্ড এবং চূড়ান্তভাবে যীশু ও রোমানদের মধ্যে বিরোধ। এগুলোর সবই সেই একই পদ্ধতির ঘটনা যা ইয়াহূদীদের ইতিহাসে বারবার সংঘটিত হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শাসকরা যখন তাদেরকে ঈশ্বরের সাথে নিজেদের সহযোগী ও অংশীদার করার চেষ্টা করেছে চূড়ান্তভাবে, তখনই ইয়াহূদীরা বিদেশি হানাদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা

করেছে। এক ঈশ্বরের বিশ্বাস এবং তিনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নন, তাদের এ ব্যাপারটি ছিল নিঃশর্ত ও সুস্পষ্ট।

ইয়াহূদীদের মধ্যে শাসক বা রাষ্ট্র নায়কোচিত গুণাবলির ঘাটতি ছিল। ইতিহাসের উষালগ্নে দেখা যায়, ইয়াহূদীরা তাদের নিজেদের রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। কারণ তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা খারাপ তার সব কিছুই করেছিলেন [১ রাজাবলী (II Kings) ১৩ : ১১]। ব্যাবিলনের নেবুশাদনেযার (Nebuchadnezzar) জেরুজালেম দখল করেন। মন্দির অক্ষত রইল। কিন্তু মন্দির ও রাজপ্রাসাদের ধন-রত্ন নতুন শাসকের অধীনে ন্যস্ত হলো। ইয়াহূদীরা ব্যাবিলনীয় হানাদার শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে কালক্ষেপণ করল না। এর ফলে আবার বিদেশি হামলা হয় এবং মন্দির প্রসাদ ধ্বংস হয়।

ভাগ্যের চাকা অন্যদিকে ঘুরল। সাইরাসের (Cyrus) নেতৃত্বে পারস্যবাসীরা ব্যাবিলন জয় করে। ইয়াহূদীদের আর একবার হানাদারদের সেবায় নিয়োজিত করা হলো। তবে সাইরাস অবিলম্বেই ব্যাবিলনে এত বিপুল সংখ্যক বিদেশি লোকের উপস্থিতির বিপদ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন এবং তিনি তাদের জেরুজালেমে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাদের মন্দির পুনর্নির্মাণেরও অনুমতি দেওয়া হলো।

জেরুজালেম অভিমুখে অগ্রসর মান কাফেলার ইয়াহূদীদের সংখ্যা ছিল ৪২,৩৬০ জন। এ ছাড়া তাদের সাথে ছিল ৭,৩৩৭ জন দাস ও স্ত্রীলোক। এদের মধ্যে ছিল ২শ' জন পুরুষ নারী গায়ক-গায়িকা।

কাফেলার লোকদের বহন করে আনছিল ৭৩৬টি ঘোড়া, ২৪৫ টি খচ্চর, ৪৩৫টি উট এবং ৬,৭২০ টি গাধা (এজরা (Ezra) ২ : ৬৪-৬৯)। যে সকল প্রাণী ধন-সম্পদ বহন করে আনছিল, সেগুলো এ হিসেবের বাইরে ছিল।

জেরুজালেমে পৌঁছার পর তারা মন্দির পুনর্নিমাণের পরিকল্পনা করতে শুরু করল। এ উদ্দেশ্যে তারা ৬১ হাজার ড্রাম (Drams) সোনা ও ৫ হাজার পাউন্ড রুপা সংগ্রহ করেছিল। অবশ্য তারা ব্যাবিলন থেকে যে ধন-সম্পদ নিয়ে এসেছিল সেগুলো এ হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি। ব্যাবিলন থেকে ৩০ টি ঘোড়া সোনা বয়ে এনেছিল। রুপা আনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল ১ হাজার ঘোড়া। এ ছাড়াও মন্দিরে স্থাপনের জন্য ৫,৪০০ সোনা ও রুপার পাত মজুদ করা ছিল (এজরা ১ : ৯: ১১)। যেসব বন্দী দাস জেরুজালেমে প্রত্যাবর্তন করেছিল তারা সংখ্যা ও সম্পদ উভয়ভাবেই বৃদ্ধি লাভ করেছিল।

জেরুজালেমের শাসক হিসেবে ইয়াহূদীরা দীর্ঘকাল শান্তি উপভোগ করতে পারে নি। আলেকজান্ডার জেরুজালেম বিজয়ের পর ৩২৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে তার মৃত্যুর আগেই তিনি ভার জয় করেন। তার মৃত্যুর পর তার সেনাধ্যক্ষরা সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিলেন। টলেমি আলেকজান্দ্রিয়াকে রাজধানী করে মিশর শাসন করতে থাকেন। সেলুকাসের রাজ্যের রাজধানী হয় এন্টিওক এবং আলেকজান্ডারের অবশিষ্ট সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় ব্যাবিলন। টলেমীয় ও সেলুসীয় শাসকরা নিজেদের মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন।

গোড়ার দিকের এক লড়াইতে জেরুজালেম মিশরীয় গ্রীকদের হাতে পতিত হয়ে। নয়া শাসকরা ইসরাইলে বিপুলসংখ্যক ইয়াহূদীদের সমাবেশে খুশি ছিল না। তারা বহুসংখ্যক ইয়াহূদীকে মিসরে পাঠিয়ে দেয়। এর ফলে ইসরাইলের বাইরে প্রথমবারের মত বৃহত্তম এক ইয়াহূদী উপনিবেশ গড়ে উঠে। সেখানে তারা গ্রীক সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করে এবং হিব্রু গ্রন্থাদি গ্রীক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। টলেমীয় শাসকদের কাছে ইসরাইল ছিল এক সুদূরবর্তী উপনিবেশ। তাদের বাৎসরিক রাজস্ব পরিশোধ করেও ইয়াহূদীদের কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থ থেকে যেত।

১৯৮ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সেলুসীয় (Selucian) শাসকরা টলেমীয় শাসকদের কাছ থেকে জেরুজালেম দখল করে নেয়। জেরুজালেম ছিল তাদের একবারে হাতের কাছে। সুতরাং আগের শাসকদের মত কোনো গড়িমসি না করে তারা জেরুজালেমের লোকদের সকল বিষয়ে ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। টলেমীয় শাসকদের মতই নয়া শাসকদের অধীনেও তাদের জীবনাচারের সাথে ইয়াহূদীদের সম্পৃক্ত করার বেপরোয়া চেষ্টার মাধ্যমে গ্রীক সংস্কৃতিমনা (Hellenised) করে তোলার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এন্টিওকাস এপেপলিয়ানাসের (Antiochus Epeplianus) শাসনামলে এই বলপূর্বক সাংস্কৃতিক ঐক্য সাধন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। তিনি সলোমনের মন্দিরে জিউসের (Zeus) একটি মূর্তি স্থাপনের মত একটি ভুল কাজ করেন। এ বিষয়টি ইয়াহূদীদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং তারা জুদাহ ম্যাকাবিসের (Judah Maccabes) নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। হাতুড়ি ছিল তাদের বিদ্রোহের

প্রতীক। গ্রীকদের জেরুজালেমের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বিজয়ী ইয়াহূদীরা দেখতে পেল ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির, জনশূন্য উপাসনাস্থল, অপবিত্র বেদী এবং মন্দিরের পুড়ে যাওয়া দ্বার। তারা তাওরাত অনুযায়ী মন্দির পুনঃ নির্মাণ করল। নয়া শাসকরা এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, তারা একাধারে মন্দিরের উচ্চ পুরোহিত ও ইসরাঈলের রাজায় পরিণত হয়। এক হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে শাসকরা আইন-কানূনের প্রয়োগে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করে। ইয়াহূদীরা তখন বিদেশি শাসকদের কল্যাণকর শাসনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। নিজেদের শাসনের বিরুদ্ধে জনমনে অসন্তোষ লক্ষ্য করে ম্যাকাবিস আরো উদ্ধত ও অত্যাচারী হয়ে ওঠে। ইয়াহূদীরা আরো একবার তাদের নিজেদের শাসকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। জেরুজালেমে রোমান শাসন কায়েমে এর ভূমিকা কোনো ক্রমেই ক্ষুদ্র ছিল না।

যীশুর জন্মের সময় রোমকরা পূর্ববর্তী শাসকদের ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করেছিল। তারা মন্দিরে প্রধান দরজার ওপর একটি স্বর্ণ ঈগল স্থাপন করেছিল। এ বিষয়টি ইয়াহূদীদের ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল এবং এর ফলে রোমকদের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ম্যাকাবিসের দু'জন অনুসারী প্রথম বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। স্বর্ণ ঈগল ধ্বংস করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। রোমকদের কাছে এটা শুধু রাষ্ট্রদ্রোহিতাই ছিল না, তাদের ধর্মের প্রতিও এটা ছিল অবমাননার শামিল। বহু রক্তপাতের পর বিদ্রোহ দমন করা হয়। বিদ্রোহের দু' নেতাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। এর অল্পকাল পরই রোমানদের আরেকটি বিদ্রোহের

সম্মুখীন হতে হয়। এ যুদ্ধে ইয়াহূদীদের পরাজয় ঘটে এবং ২ হাজার বিদ্রোহীকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

ইয়াহূদীরা পরাজিত হলেও তাদের মনের মধ্যে ক্রোধ ধিকিধিকি জ্বলছিল। ৬ সনে কর ধার্যের সুবিধার জন্য সম্রাট আগাষ্টাস (Augustus) যখন ইয়াহূদীদের জনসংখ্যা গণনার নির্দেশ দেন তখনও সে ক্রোধ অত্যন্ত উঁচুমাত্রায় বিরাজিত ছিল। দেবত্ব আরোপিত সম্রাটকে কর প্রদান করা ছিল তাওরাতের শিক্ষার বিপরীত। ইয়াহূদীরা শুধু যিহোভাকেই রাজা বা সম্রাট বলে গণ্য করত। ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ইয়াহূদীদের মধ্যে উদার মনোভাবাপন্ন অংশটি উপলব্ধি করলেন যে, এই লড়াই ইয়াহূদীদের জন্য পুরোপুরি গণহত্যায় পরিণত হবে। তারা সমঝোতার আবেদন করে কর প্রদান করতে সম্মত হওয়ার মাধ্যমে অর্থহীন আত্মহত্যা থেকে তাদের জনগণকে বাঁচাতে চাইলেন। যে নেতারা এই মূল্য দিয়ে শান্তি কিনলেন তারা জনপ্রিয় হন নি, বরং তাদের ইয়াহূদী জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

যীশুর জন্মকালীন সময় এবং যোহনের মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনার সাথে ঐ সময়ের বাস্তব ও সামাজিক পরিস্থিতির কথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছি যেখানে সমগ্র প্রতিরোধ আন্দোলনই ঐশী অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত যীশুকে ঘিরে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

কোনো কিছু করার আগে যীশুর ৪০ দিন নির্জনে বাস ও প্রার্থনা করা প্রয়োজন ছিল। তার বয়স তখন ছিল ৩০ বছর। ইয়াহূদী আইন

অনুযায়ী এটা ছিল সেই বয়স যে বয়সে কোনো মানুষ তার পিতার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়। যোহন যখন মানুষের মধ্যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন তখন তিনি রোমকদের বিরুদ্ধে সকলের রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু যীশু এর আগে প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার করেন নি। সুতরাং সতর্কতার সাথে তার প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এর আগের প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে এবং সম্প্রতি যোহনের মৃত্যুর স্মৃতি তার মনে জাগরূক ছিল। দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সাথে তিনি ইয়াহূদীদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করলেন। তিনি কাউকে দীক্ষা দিলেন না। এটা অকারণে রোমানদের ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ করত এবং তা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারত। অন্যদিকে তিনি 'বিষাক্ত সাপ'গুলোর প্রতিরোধ আন্দোলনে অনুপ্রবেশেও বাধা দিলেন না। তিনি ইসরাইলের ১২টি গোত্রের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে প্রচলিত প্রথায় ১২ জন শিষ্য বা অনুসারী নিয়োগ করলেন। তারা আবার তাদের নেতৃত্বে কাজ করার জন্য ৭০ জন দেশপ্রেমিককে নিয়োগ করল। ইয়াহূদীদের আচারনিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায় ফারীসীরা গ্রামের শক্ত সমর্থ ইয়াহূদীদের (আম আল আরেজ-Am-Al Arez) সাথে শীতল সম্পর্ক বজায় রাখতে যীশু তাদের নিজের অধীনে নিয়ে এলেন। এই কৃষকদের মধ্যে অনেকেই এসেনী সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। তারা যীশুর ঈর্ষণীয় সমর্থকে পরিণত হয়। তার জন্য তারা জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল। তারা পরিচিত ছিল ধর্মযোদ্ধা (Zealots) নামে। বাইবেলের মতে, ১২ জন শিষ্যের মধ্যে অন্তত ৬জন ছিল ধর্মযোদ্ধা। যীশু মূসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা প্রত্যাখ্যান নয়,

পুনঃপ্রচারের জন্য আগমন করেছিলেন। তিনি ওল্ড টেস্টামেন্টের আবেদন তুলে ধরলেন: “যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং চুক্তি মেনে চলে, আমার পরেই তার স্থান” (ম্যাকাবিস ২ : ২৭-৩১)। বহু লোক তার অনুসারী হতে শুরু করে। কিন্তু তাদের গোপন স্থানে রাখা হত এবং নির্জন এলাকায় তাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। তাদের বলা হত ‘বার ইওনিম’ (Bar Yonim) অর্থাৎ ‘নির্জনস্থানের সন্তান’। তাদের মধ্যে যারা ছুরকার ব্যবহার শিক্ষা করেছিল তারা ‘সাইকারি’ (Sicarii) বা ‘চুরিকাধারী ব্যক্তি’ নামে পরিচিত ছিল। এ ছাড়া মুষ্টিমেয় কিছু লোককে নিয়ে এক ধরনের দেহরক্ষী দল তৈরি করা হয়। তারা পরিচিত ছিল ‘বার জেসাস’ নামে পরিচিত লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। তা সত্ত্বেও এসব লোকদের ঘিরে এক ধরনের রহস্য বিরাজ করত। ফলে তাদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। এটা বোধগম্য। কারণ, তারা ছিল যীশুর অনুসারী ঘনিষ্ঠ মহলটির অংশ। তাই রোমান গুপ্তচরদের চোখের আড়ালে রাখার জন্য তাদের পরিচয় গোপন রাখা হত।

অনুসারীদের যীশু নির্দেশ দিলেন: ‘যার টাকার থলি আছে তাকে সেটা নিতে দাও, সে তাই নিয়ে থাক এবং যার কোনো তরবারি নেই তাকে তার পোশাক বিক্রি করতে দাও যাতে সে একটি কিনতে পারে (লূক ২২ : ৩৬)। যীশুর শিক্ষা অলৌকিক কর্মকান্ডে অনুপ্রাণিত হয়ে তার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসব প্রস্তুতির ফল দাঁড়াল এই যে পিলেট- (Pilate) এর উত্তর সুরী সোসিয়ানাস হিয়েরোকলস (Sossianus Hierocles) খোলাখুলিই বললেন যে, যীশু ৯শ ডাকাতের একটি দলের নেতা (‘চার্চ ফাদার’ ল্যাকটানিয়াস (Lactanius) কর্তৃক

উদ্ধৃত)। জোসেফাসের রচিত গ্রন্থের মধ্যযুগীয় হিব্রু অনুলিপি থেকে দেখা যায়, যীশুর সাথে ২ হাজার থেকে ৪ হাজার সশস্ত্র অনুসারী ছিল।[৪]

এসেনীদের অনুসৃত ধর্মাদর্শ থেকে যাতে বেশিদূরে সরে না যান, সেদিকে যীশুর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি জানতেন যে, এসেনীদের ধর্মগ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠাতেই গসফেল ও ঈশ্বর প্রেরিত দূতদের আচার অনুষ্ঠান ও নীতি বাক্য রয়েছে[৫]। ধর্মপ্রচারকালে যীশু তার শিক্ষা ও আদর্শ সম্পূর্ণরূপে তার অনুসারীদের কাছে প্রকাশ করেন নি। মূলত পূর্ণ সত্যটি মাত্র অতি অল্প কয়েকজনের জানা ছিল।

"তোমাদের কাছে আমার এখনও অনেক কিছু বলার বাকি আছে। কিন্তু তোমরা সেগুলো বহন করতে পারবে না। যা হোক, সেই তিনি অর্থাৎ সত্য আত্মা যখন আগমন করবেন তখন তিনি তোমাদের পূর্ণ সত্যের পথে পরিচালিত করবেন, কিন্তু তিনি নিজে থেকে কিছু বলবেন না। তিনি যা শুনবেন, তাই তিনি বলবেন।" (যোহন ১৬ : ১২-১৪)

তিনি কোনো জাগতিক ক্ষমতা চান নি। তাই তিনি দেশের শাসক যেমন হতে চাননি, তেমনি চাননি ধর্মশাস্ত্রবিদ হতে বা প্রভাবশালী ইয়াহূদী চক্রের নেতৃত্ব। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে তার বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে ও তার অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে রোমকরা এবং তাদের সমর্থক ইয়াহূদী পুরোহিতরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে যে, তিনি বোধ হয় শাসন ক্ষমতা দখল করতে চাইছেন। নিজেদের ক্ষমতার প্রতি হুমকি সৃষ্টি হতে যাচ্ছে ভেবে তারা তাঁকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য দ্রুত সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

যীশুর একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্রষ্টা যেমনটি নির্দেশ করেছেন তদনুযায়ী উপাসনার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। ঐশী নির্দেশিত পন্থায় চলার পথে যে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে তার সাথে লড়াই করার জন্য যীশু ও তার অনুসারীরা প্রস্তুত ছিলেন।

প্রথম লড়াইটি সংঘটিত হয় রোমকদের অনুগত ইয়াহূদীদের সাথে। এ যুদ্ধে যীশুর পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 'বার জেসাস' বারাববাস (Bar Jesus Barabbas) এ যুদ্ধে ইয়াহূদী দলের নেতা নিহত হলে তারা সম্পূর্ণরূপে মনোবল হারিয়ে ফেলে। কিন্তু বারাববাস গ্রেফতার হন।

পরবর্তী লক্ষ ছিল সলোমনের মন্দির। এ মন্দিরের কাছেই রোমকদের একটি শক্তিশালী বাহিনী ছিল, কারণ সেটা ছিল বাৎসরিক উৎসবের সময় এবং পূর্ব উপলক্ষে ভোজোৎসব (Feast of the Passover) ছিল আসন্ন। এ রোমক সৈন্যরা বছরের এ সময় সাধারণভাবে ছোট-খাট গোলযোগের জন্য প্রস্তুত হয়েই থাকত। তবে এবার তারা অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি সতর্ক ছিল। এরা ছাড়াও ছিল মন্দির পুলিশ যারা পবিত্র স্থানগুলো পাহারা দিত। যীশুর মন্দির অভিযানটি এমনই সুপরিকল্পিত ছিল যে, রোমক সৈন্যরা ঘটনার সময় একেবারে হত বিহবল হয়ে পড়ে। যীশু মন্দিরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এই লড়াই 'মন্দির শুদ্ধিকরণ' (Cleansing of the Temple) নামে খ্যাত। যোহন এর গসপেলে এ ঘটনা নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

"যীশু মন্দিরে সেই সব ব্যক্তিদের দেখতে পেলেন যারা গরু, ভেড়া ও পায়রা বিক্রি করছিল। মুদ্রা বিনিময়কারীরা তাদের কাজে নিয়োজিত

ছিল। যীশু চাবুকের আঘাত করে গরু ও ভেড়াসহ তাদের মন্দিরের বাইরে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি মুদ্রা ব্যবসায়ীদের টাকাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তাদের টেবিলগুলোও উল্টিয়ে দিলেন। (যোহন ২ : ১৪)

চাবুকের আঘাত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কারমাইকেল (Carmichael) বলেন যে-

যেটা কার্যত ছিল এক বিরাট ঘটনা যে ক্ষেত্রে তারা মাত্র সহিংসতার আভাস দিয়েছিলেন এবং সন্দেহাতীতভাবে অতি সামান্যতম আঘাত মাত্র হেনেছিলেন। আমরা যদি শুধু সেই মন্দিরের আয়তন কল্পনা করি, যার ভিতর ও বাইরে সমবেত হয়েছিল বহু হাজার লোক, অসংখ্য সেবক, পুলিশ বাহিনী রোমক সৈন্যরা, পাশাপাশি মুদ্রা ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে কিছু না বলে শুধু গরু বিক্রেতাদের প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবি, আমরা দেখতে পাই যে, কাজটি ছিল বিস্ময়কর ব্যাপারের চাইতেও অনেক বেশি কিছু। চতুর্থ গসপেলে এ ঘটনার যে বর্ণনা রয়েছে আসল ঘটনা ছিল একেবারেই ভিন্নতর। ইতিহাসকার বাস্তবতার বাইরে ঘটনাটিকে 'ঐশ্বরিকীকরণে'র মাধ্যমে তাৎপর্যহীন করে ফেলেছেন।[৬]

প্রতিটি যোদ্ধার এ বিষয়টি জানা ছিল যে, স্থানীয় পুলিশদের সহানুভূতি ছিল দেশপ্রেমিকদের প্রতি, দখলদার সেনাবাহিনীর প্রতি নয়। এ বিষয়টি মন্দিরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার একটি কারণ হতে পারে।

রোমকরা স্থানীয়ভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও তাদের শক্তি চূর্ণ হয় নি। তার শক্তি বৃদ্ধির জন্য সাহায্য চেয়ে পাঠালে নতুন সৈন্য দল জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হয়। জেরুজালেমের তোরণ রক্ষার লড়াই কয়েকদিন ধরে চলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশ প্রেমিক বাহিনীর তুলনায় রোমান বাহিনী অনেক বেশি শক্তিশালী প্রমাণিত হয়। তার সকল অনুসারী পিছু হটে যায়। এমনকি যীশুর ঘনিষ্ঠ শিষ্যরাও পলায়ন করে। তার সাথে মাত্র সামান্য কিছু মানুষ অবশিষ্ট ছিল। যীশু আত্মগোপন করলেন। রোমানরা তাকে খুঁজে বের করার জন্য ব্যাপক তল্লাশি শুরু করে।

যীশুর গ্রেফতার, 'বিচার' এবং 'ক্রুশবিদ্ধ' করা নিয়ে এত বেশি পরস্পর বিরোধী ও বিভ্রান্তিকর বিবরণ পাওয়া যায় যে, তার মধ্য থেকে বাস্তবে কি ঘটেছিল তা জানা অত্যন্ত দুষ্কর। আমরা দেখতে পাই যে, রোমক সরকার স্বল্পসংখ্যক ইয়াহূদীদের আনুগত্য ও সেবা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ জেরুজালেমে রোমক শাসন অব্যাহত থাকলে এ বিশেষ মহলটির স্বার্থ রক্ষিত হতো।

যীশুর এক শিষ্য জুডাস ইসক্যারিয়ট (Judas Iscariot) যীশুকে গ্রেফতারের কাজে সাহায্য করার বিনিময়ে ৩০ টি রৌপ্যখণ্ড লাভের প্রতিশ্রুতি পেয়ে রোমকদের দলে ভিড়ে যায়। যে কোনো ধরনের গোলযোগ এড়াতে রাতের বেলায় যীশুকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যীশু যে স্থানে তার কয়েকজন সঙ্গীসহ অবস্থান করছিলেন সেখানে পৌঁছে জুডাসকে যীশুকে চুম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে

বিদেশি রোমক সৈন্যরা সহজেই তাকে শনাক্ত করতে পারে। কিন্তু পরিকল্পনাটি ভন্ডুল হয়ে যায়। সৈন্যরা অন্ধকারের মধ্যে দিশা হারিয়ে ফেলে। দু'জনকেই অন্ধকারের মধ্যে এক রকম মনে হচ্ছিল। সৈন্যরা ভুল করে যীশুর পরিবর্তে জুডাসকে গ্রেফতার করে। এর পরে যীশু পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন মজীদে বলা হয়েছে: তারা তাকে হত্যা বা ক্রুশবিদ্ধ করে নি, কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল।

বন্দীকে যখন রোমক বিচারক পিলেট-এর সামনে হাযির করা হলো, ঘটনার নাটকীয়তা সকলকেই সন্তুষ্ট করেছিল। অধিকাংশ ইয়াহূদী উল্লসিত হয়ে উঠেছিল এ কারণে যে অলৌকিকভাবে বিশ্বাসঘাতক নিজেই কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ছিল, যীশু নন। অন্যদিকে রোমকদের অনুগত ইয়াহূদীরা খুশি হয়েছিল এ কারণে যে জুডাসের মৃত্যু হলে তাদের অপরাধের প্রমাণ বিলুপ্ত হবে। উপরন্তু যেহেতু আইনের দৃষ্টিতে যীশুর মৃত্যু ঘটবে সে কারণে তিনি আর প্রকাশ্য আত্ম প্রকাশ করে তাদের জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারবেন না।

রোমক বিচারক পিলেট বিচার কাজে কী ভূমিকা পালন করেছিলেন তা জানা যায় না। বাইবেলে বলা হয়েছে যে, তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। ইয়াহূদী নেতাদের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ছিল, অন্যদিকে যীশুর প্রতিও তার সহানুভূতি ছিল। ফলে এ ব্যাপারে এমন এক কাহিনী তৈরি হয় যা বিশ্বাস করা কঠিন। গসপেলের লেখকরা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে তার সকল দায়-দায়িত্ব সমগ্র ইয়াহূদী জাতির ওপর চাপিয়ে দিতে

এবং যীশুর কথিত মৃত্যুর দায় থেকে রোমকদের মুক্ত করার যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তার ফলশ্রুতিতেও প্রকৃত ঘটনা তালগোল পাকানো হতে পারে।[৭] এ ক্ষেত্রে একমাত্র পথ হতে পারত এই ঘটনা সম্পর্কে এমন একটি সরকারী বিবরণ যা দেশি শাসকদের জন্য ক্ষতিকর হত না এবং সেখানে কর্তৃপক্ষ যাতে অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ না হয় সে জন্য প্রকৃত ঘটনা প্রয়োজন বোধে কিছুটা ঘুরিয়ে লেখা। আর তৎকালীন পরিবেশে শুধু এ ধরনের বিবরণই টিকে থাকা সম্ভব ছিল।

অতএব, একটি শক্তিশালী সূত্রে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে, পিলেট ৩০ হাজার পাউন্ডের সমপরিমাণ অর্থ ঘুষ গ্রহণ করেন। গসপেলে যা বর্ণিত হয়েছে তা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এটা নিশ্চিত যে, সেদিন জেরুজালেমে যে নাটক অনুষ্ঠিত হয় সেখানে পিলেট একটি বিশেষ মহলের স্বার্থে কাজ করেছিলেন।

সর্বশেষ আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। মিশর ও ইথিওপিয়ার কপ্টিক চার্চের সন্তদের (Saints of the Coptic Church) ক্যালেন্ডারগুলো থেকে দেখা যায়, পিলেট ও তার স্ত্রী ‘সন্ত’ (Saints) হিসেবে গণ্য হয়েছেন। এটা শুধু তখনই হওয়া সম্ভব যদি মেনে নেওয়া যায় যে, পিলেট সৈন্যদের ভুল ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং তিনি জেনেশুনেই জুডাসকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে যীশুকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেন।

বার্ণাবাসের বিবরণে বলা হয়েছে যে, গ্রেফতারের সময় স্রষ্টার ইচ্ছায় জুডাস যীশুর চেহারায় পরিবর্তিত হন এবং তা এতই নিখুঁত ছিল যে,

তার মাতা ও ঘনিষ্ঠ অনুসারীরাও তাকে যীশু বলেই বিশ্বাস করেছিলেন। জুডাসের মৃত্যুর পর যীশু তাদের কাছে হাযির না হওয়া পর্যন্ত তারা বুঝতেই পারেন নি যে, প্রকৃতপক্ষে কী ঘটে গেছে। এ থেকেই বোঝা যায়, তৎকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে কেন এই বিভ্রান্তি ঘটেছিল এবং কেন কোনো কোনো লেখক এ ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থেকেও যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ভ্রান্ত কথা সমর্থন করে গেছেন।

যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী বলে উল্লিখিত ব্যক্তি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল কিনা সে ব্যাপারে সকলেই সম্পূর্ণ একমত নন। গোড়ার দিকের খৃষ্টানদের মধ্যে সেরিনথিয়ানস (Cerinthians) ও পরে ব্যাসিলিডিয়ানস (Basilidians) যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে, যীশুর বদলে সাইরিন এর সাইমন (Simon of Cyrene) ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। পিটার, পল ও জন এর সমসাময়িক সেরিনথিয়ানস যীশুর পুনরুত্থানের কথাও স্বীকার করেন। গোড়ার দিকের আরেকটি খৃষ্টান সম্প্রদায় কার্পোক্রেশিয়ানরা (Carpocratians) বিশ্বাস করত যে, যীশু নয়, হুবহু তার মত দেখতে তার এক অনুসারীকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। চতুর্থ শতাব্দীর মানুষ প্লাটিনাস (Platinus) বলেছেন যে, তিনি ‘দি জার্নি’স অব অ্যাপোসলস, (The Journies of the Apostles) নামক একটি গ্রন্থ পাঠ করেন যা পিটার, জন, অ্যান্ড্রু, টমাস ও পলের কর্মকান্ড সম্পর্কে রচিত হয়েছিল। অন্যান্য বিষয়ের সাথে এখানেও বলা হয়েছে যে, যীশু ক্রুশবিদ্ধ হন নি, তার স্থানে অন্য ব্যক্তি ক্রুশবিদ্ধ হয় এবং যারা বিশ্বাস

করেছিল যে, তারা ক্রুশবিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করেছে, তাদের তিনি উপহাস করতেন।[৮] এভাবে দেখা যায়, যীশু ক্রুশবিদ্ধ হন নি বলে জানা গেলেও সে কালের লেখকগণ বা ঐতিহাসিকরা যীশুর স্থলে কে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন তার ব্যাপারে মতপার্থক্যের শিকার কিংবা সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে অপারগ। কেউ কেউ কিছুই বিশ্বাস করতে চান না।

যখন কেউ রোমান সৈনিকদের দৌরাত্ম্যের কথা বর্ণনা করেন তিনি আক্ষরিকভাবেই ওল্ড টেস্টামেন্টের নির্দিষ্ট কয়েকটি অনুচ্ছেদের পুনরাবৃত্তি করেন......... তখনই পুরো বিষয়টিই নিছক কল্পনাপ্রসূত আবিষ্কার বলে সন্দেহ জেগে ওঠে।[৯]

বার্নাবাসের গসপেল (Gospel of Barnabas) ও কুরআন ছাড়া যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর কী ঘটেছিল, সে সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিক রেকর্ড নেই। উক্ত বার্নাবাসের গসপেল ও কুরআনে এ ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যাকে ৪টি স্বীকৃত গসপেলেই ‘ঊর্ধ্বারোহন’(Ascension) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যার অর্থ তাকে পৃথিবী থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

## তৃতীয় অধ্যায়
## বার্নাবাসের গসপেল

বার্নাবাসের গসপেল যীশু খৃষ্টের একজন ঘনিষ্ঠ শিষ্যের লেখা এবং কাল পরিক্রমায় রক্ষাপ্রাপ্ত একমাত্র গসপেল। এর রচয়িতা বার্নাবাস ছিলেন যীশুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর এবং যীশুর তিন বছর ব্যাপী ধর্ম প্রচারকালে তিনি অধিকাংশ সময়ই তার বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে ছিলেন। এর ফলে তিনি যীশুর ধর্মপ্রচার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে সরাসরি অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করেন যা চারটি স্বীকৃত গসপেলের রচয়িতাদের কারও ছিল না। যীশু এবং তার শিক্ষা ও নির্দেশ সম্পর্কে তিনি কখন এ গসপেল রচনা করেন তা জানা যায় না। সুতরাং যখন যে ঘটনা বা কথোপকথন সংঘটিত হয়েছিল তখনি অথবা যীশুর ঊর্ধ্বারোহণের পরপরই তার কিছু শিক্ষা পরিবর্তিত বা হারিয়ে যেতে পারে ভেবে তিনি এ গসপেল রচনা করেন, তা সুস্পষ্ট নয়। সম্ভবত জন মার্কের (John Mark) সাথে তিনি সাইপ্রাস প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে কিছুই রচনা করেন নি। যীশুর ঊর্ধ্বারোহণের কিছু দিন পর টারসসের পল (Paul of Tarsus) এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের পর দু'জন সাইপ্রাস যাত্রা করেছিলেন। উক্ত ব্যক্তি বার্নাবাসের সাথে পুনরায় ভ্রমণে অস্বীকৃতি জানালেও মার্ক তার সহযাত্রী হন। তবে বার্নাবাসের গসপেল কখন লেখা হয়েছিল তা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ গসপেলটিও অন্য চারটি গসপেলের ন্যায় বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত ও পরিশোধিত হয়েছে। তবে এ গ্রন্থের বিশেষত্ব হলো যে, এটি যীশুর জীবন ও কর্ম বিষয়ে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

৩২৫ সন পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়ার চার্চগুলোতে বার্নাবাসের গসপেল একটি গির্জা অনুমোদিত গসপেল (Canonical Gospel) হিসেবেই স্বীকৃত ছিল। এটা সুবিদিত যে, যীশুর জন্মলাভের পর প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে তা প্রচারিত হতে শুরু করে। ইরানিয়াসের (Iraneus, ১৩০-২০০ সন) লেখার কারণেই এটা ঘটেছিল। কারণ তিনি একত্ববাদের সমর্থনে লেখালেখি করতেন। তিনি পলের (পৌলের) বিরোধী ছিলেন এবং যীশুর প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে পৌত্তলিক, রোমান ধর্ম ও প্লাটোনিক দর্শনের মিশ্রণ ঘটানোর দায়ে পলকে অভিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তার মতের সমর্থনে বার্নাবাসের বাইবেল থেকে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃতি দিতেন।

৩২৫ সনে নিসিয়ার (Nicea) বিখ্যাত কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে ত্রিত্ববাদকে পলীয় চার্চের আনুষ্ঠানিক ধর্মমত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই সিদ্ধান্তের একটি ফল হয় এই যে, সে সময় যে ৩শ'র মতো গসপেল বিদ্যমান ছিল, সেগুলোর মধ্য থেকে চারটিকে চার্চের অনুমোদিত গসপেল হিসেবে মনোনীত করা হয়। অন্যান্য গসপেলেগুলো যার মধ্যে বার্নাবাসের গসপেলও ছিল, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া হিব্রু ভাষায় লিখিত সকল গসফেলও ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফরমান জারি করা হয় যে, কারো কাছে অননুমোদিত গসপেল পাওয়া গেলে তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হবে। এটি ছিল ত্রিত্ববাদের বিরোধী যীশুর মূল শিক্ষা বিলুপ্ত করার প্রথম সুসংগঠিত চেষ্টা। তা সে মানুষই হোক আর গ্রন্থই হোক। তবে বার্নাবাসের গসপলের ক্ষেত্রে এ চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হয় নি।

আজকের দিনেও এ গ্রন্থের অস্তিত্ব বজায় থাকা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ডামাসাস (Damasus, ৩০৪-৩৮৪ সন) ৩৬৬ সনে পোপ হন। তিনি ফরমান জারি করেন যে, বার্নাবাসের গসপেল পাঠ করা উচিৎ নয়। কায়সারিয়ার বিশপ গেলাসাস (Gelasus)- এ ফরমান সমর্থন করেন। গেলাসাস ৩৯৫ সনে পরলোক গমন করেন। তিনি 'এপোক্রাইফাল' (apocryphal) গ্রন্থগুলোর যে তালিকা তৈরি করেন তার মধ্যে এ গসপেলটিও ছিল। এপোক্রাইফা অর্থ "জনসাধারণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা"। ফলে এ গসপেলটি তখন সহজলভ্য ছিল না। তবে চার্চ নেতারা তাদের কথায় গসপেলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতেন। বাস্তবে জানা যায় যে, পোপ ৩৮৩ সনে বার্নাবাসের বাইবেলের একটি কপি সংগ্রহ করেছিলেন ও তা তার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে রেখেছিলেন।

এ গসপেল সংক্রান্ত বিষয়ে আরো বেশ কিছু ফরমান জারি করা হয়। ৩৮২ সনে পাশ্চাত্যের চার্চগুলো এবং ৪৫৬ সনে পোপ ইনোসেন্ট কর্তৃক (Innocent) এ গসপেল নিষিদ্ধ করে ফরমান জারি করা হয়। ৪৯৬ সনে গ্লাসিয়ান ফরমানে নিষিদ্ধ গ্রন্থের তালিকায় 'Evangelium Barnabe' ও অন্তর্ভুক্ত হয়। হরমিসডাস (Hormisdas) এর ফরমানেও (যিনি ৫১৪ সন থেকে ৫২৩ সন পর্যন্ত পোপ ছিলেন) এ নিষেধাজ্ঞা পুনর্ব্যক্ত করা হয়। বি দ্য মন্টফাকো (B.de. Montfaucon, ১৬৫৫-১৭৪১) কর্তৃক প্রণীত চ্যান্সেলর সেগাইয়ার (Chancellor

Seguier, ১৫৫৮-১৬৭২)-এর গ্রন্থাগারের গ্রীক পাণ্ডুলিপির ক্যাটালগে এ সকল ফরমানের উল্লেখ করা হয়েছে।

নাইসেফোরাসের (Nicephorus) Stichometry তে ও নিম্নরূপে বার্নাবাসের গসপেলের উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রমিক নং ৩, বার্নাবাসের পত্রাবলী (Epistle of Bernabas) ... ১,৩০০ পঙক্তি।

আবার Sixty Books-এর তালিকাতে বার্নাবাসের গসপেলের নিম্নরূপ উল্লেখ রয়েছে:

ক্রমিক নং ১৭। প্রেরিত দূতদের ভ্রমণ ও শিক্ষা।

ক্রমিক নং ১৮। বার্নাবাসের পত্রাবলি।

ক্রমিক নং ২৪। বার্নাবাসের গসপেল।

এই বিখ্যাত তালিকা Index নামে পরিচিত। খৃষ্টানরা পরকালের চিরস্থায়ী শাস্তির ভয়ে এ গ্রন্থগুলোর কোনোটিই পাঠ করত না বলে ধারণা করা হয়।

ফ্রান্সের রাজার গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি সমূহের ক্যাটালগ প্রস্তুতকারী কোটেলেরিয়াস (Cotelerius) ১৭৮৯ সনে প্রণীত Index of Scriptures-এ বার্নাবাসের গসপেলকে তালিকাভূক্ত করেন। অক্সফোর্ড বোদলেইয়ান লাইব্রেরির বারো সিয়ান (Baroccian) সংগ্রহের ২০৬তম পাণ্ডুলিপিতে এই গসপেলের বর্ণনা রয়েছে।[১] এথেন্সের একটি যাদুঘরে

বার্নাবাসের গসপেলের একটি খন্ডিত কপি রয়েছে। গ্রীক ভাষায় অনুদিত এ কপিটি পুড়িয়ে ফেলা একটি গসপেলের রক্ষাপ্রাপ্ত অংশ।

সম্রাট জেনোর (Zeno) শাসনামলের চতুর্থ বছরে ৪৭৮ সনে বার্নাবাসের দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয় এবং তার নিজের হাতে লেখা গসপেলের একটি কপি তার বুকের ওপর রাখা অবস্থায় পাওয়া যায়। ১৬৯৮ সনে অ্যান্টওয়ার্প (Antwarp) থেকে প্রকাশিত (Acta Sanctorum (Boland Junii, Tome II)-এর ৪২২-৪৫০ পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ রয়েছে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ দাবি করেছিল যে, বার্নাবাসের কবরে প্রাপ্ত গসপেলটি মথির রচিত। কিন্তু এ কপিটি প্রদর্শনের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। ভ্যাটিকানের “২৫ মাইল লম্বা লাইব্রেরি” অভ্যন্তরেই এর বিষয়বস্তু অজ্ঞাত রয়ে গেল।

বার্নাবাসের গসপেলের যে পাণ্ডুলিপি থেকে ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে সেটি আদতে ছিল পোপ সেক্সটাস (Sextus) ১৫৮৯-৯০) এর কাছে। ফ্রা মারিনো (Fra Marino) নামে তার এক যাজক বন্ধু ছিলেন। তিনি ইরানিয়াসের লেখা পাঠ করে বার্নাবাসের বাইবেলের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ইরানিয়াস তার লেখায় বার্নাবাসের বাইবেল ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত করতেন। একদিন মারিনো পোপের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। তারা একসাথে দুপুরের আহারের পর কথাবার্তা বলতে থাকেন। এ সময় পোপ ঘুমিয়ে পড়েন। ফাদার মারিনো তখন পোপের ব্যক্তিগত লাইব্রেরির বইগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি বার্নাবাসের গসপেলের একটি ইতালীয় পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার

করেন। সেটি নিজের আলখেল্লার আস্তিনে লুকিয়ে মারিনো পোপের বাড়ি ত্যাগ করেন এবং ভ্যাটিক্যান থেকে চলে যান। বিভিন্ন লোকের হাত ঘুরে পাণ্ডুলিপিটি অবশেষে Amsterdam এ এমন এক ব্যক্তির হাতে পৌঁছে যিনি ছিলেন ‘স্বনাম খ্যাত ও ক্ষমতাশালী’। তিনি গসপেলটিকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করতেন। তার মৃত্যুর পর গসপেলটি প্রুশিয়ার রাজার এক সভাসদ জে, ই, ক্রেমারের (J.E. Cremer) হাতে পড়ে। ১৭১৩ সনে ক্রেমার বিখ্যাত গ্রন্থপ্রেমী স্যাভয় এর যুবরাজ ইউজিনকে (Prince Eugene of Savoy) পাণ্ডুলিপিটি উপহার দেন। ১৭৩৮ সনে প্রিন্সের সম্পূর্ণ গ্রন্থাগারের সাথে পাণ্ডুলিপিটি ভিয়েনার হফবিবলিওথেক (Hofbibliothek)- এ পৌঁছে এবং এখনও তা সেখানেই আছে।

গোড়ার দিকের চার্চের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক টোলান্ড (Toland) এ পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করেছিলেন এবং তিনি তার Miscellaneous Works-এ এর উল্লেখ করেছেন। ১৭৪৭ সনে তার মৃত্যুর পর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গসপেল সম্পর্কে তিনি বলেন, “এটি আগাগোড়া যথার্থই এক ধর্মগ্রন্থ” (This is in Scripture Style to a hair)। তিনি বলেন,

“এ পর্যন্ত প্রাপ্ত গসপেল সমূহে যীশুর কাহিনি বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে এ গসপেলটিতে এই ভিন্নতা আরো বেশি লক্ষণীয়। মূল থেকে নিকটতর ছিল বিধায় কেউ কেউ এর প্রতি অধিকতর অনুকূল ধারণা পোষণ করবে। কারণ কোনো একটি ঘটনা

সংঘটিত হওয়ার পরই শুধু সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। তাই মূল ঘটনা থেকে যতই দূরে সরে যাওয়া হয় ততই তার আবেদন হ্রাস পায়।”

এ পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে টোলান্ড (Toland) যে প্রচারণা চালান তাতে সবচেয়ে বড় যে লাভ হয় তা হলো এই যে, এ পাণ্ডুলিপিকে অন্যগুলোর ভাগ্য বরণ করতে হয় নি। উল্লেখ্য, স্প্যানিশ ভাষায় আরেকটি গসপেল এক সময় ছিল। গসপেলের ইতালীয় পাণ্ডুলিপিটি যে সময় হফবিবলিও থেকে দেওয়া হয় সেই একই সময়ে স্প্যানিশ গসপেলটিও ইংল্যান্ডের একটি কলেজ লাইব্রেরিকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। রহস্যজনকভাবে সে পাণ্ডুলিপিটি অন্তর্হিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই সেটিকে ইংল্যান্ডে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

ক্যানন (Canon) ও মিসেস র‍্যাগ (Mrs. Ragg) ইতালীয় পাণ্ডুলিপিটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ১৯০৭ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস কর্তৃক তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। রহস্যজনকভাবে এর প্রায় সকল কপিই বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। এর মাত্র ২টি কপি এখন টিকে আছে। একটি রয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এবং অন্যটি ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব কংগ্রেস-এ। লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের কপিটির একটি মাইক্রোফিল্ম কপি সংগ্রহ করা হয় এবং তা পাকিস্তানে মুদ্রিত হয়। বার্নাবাসের গসপেলের সংশোধিত সংস্করণ পুনর্মুদ্রণের লক্ষে এই সংস্করণেরই কপি ব্যবহার করা হয়।

এটা এখন সাধারণভাবে স্বীকৃত যে (Synoptic Gospels) নামে পরিচিত প্রথম দিকের ৩টি স্বীকৃত গসপেল পূর্বের অপরিচিত এক গসপেল থেকে নকল করা হয়। এই অপরিচিত গসপেলটিকে এ কালের গবেষকরা ভালো কোনো নাম খুঁজে না পেয়ে ‘Q’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রশ্ন জাগে যে, নিষিদ্ধকৃত বার্নাবাসের গসপেল আসলে এই হারানো গসপেল কিনা। স্মরণযোগ্য যে ৪টি স্বীকৃত গসপেলের মধ্যে প্রথমটি যিনি রচনা করেন সেই জন মার্ক ছিলেন বার্নাবাসের বোনের পুত্র। যীশুর সাথে তার কখনোই সাক্ষাৎ হয় নি। সুতরাং তিনি তার গসপেলে যীশুর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা তিনি অবশ্যই অন্য কারো কাছ থেকে শুনেছেন বা জেনেছেন। নিউ টেস্টামেন্টের গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, পল ও বার্নাবাসের সাথে বহু ধর্মপ্রচার বিষয়ক সফরে তিনি সঙ্গী হয়েছিলেন। পল ও বার্নাবাসের মধ্যে তীব্র বিরোধ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। বিরোধ দেখা দেয়ার পর বার্নাবাস ও মার্ক এক সাথে সাইপ্রাস গমন করেন। পলও কখনো যীশুকে দেখেন নি। সুতরাং তথ্যের জন্য মার্ক পলের ওপর নির্ভর করেছিলেন, এটা হতেই পারে না। এখানে একমাত্র যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত এটাই যে, মামা বার্নাবাস যীশু সম্পর্কে তাকে যা বলেছিলেন, মার্ক তার গসপেলে সেভাবেই পুনরাবৃত্তি করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, মার্ক পিটার এর দোভাষী হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং তিনি পিটারের কাছ থেকে যা শুনেছেন তাই লিখেছেন। এটা সত্য হতে পারে। বার্নাবাস ও পলের সাথে মার্ক যখন সফর করতেন সে সময় অন্যান্য ধর্ম প্রচারকারীদের সাথে মার্কের অবশ্যই সাক্ষাৎ ঘটে থাকবে।

যাহোক, গুডস্পীড (Goodspeed) তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, পিটারের কাছ থেকে মার্ক যা শুনেছিলেন তা কোনোক্রমেই সম্পূর্ণ বা সমন্বিত ছিল না।

তিনি ছিলেন পিটার এর একজন দোভাষী। যীশু যা বলেছেন বা করেছেন বলে তিনি শুনেছিলেন সেগুলো সঠিকভাবে তিনি লিখেছেন যদিও তা সুশৃঙ্খল হয় নি। কারণ তিনি কখনোই যীশুকে দেখেননি বা তার অনুগমন করেন নি, কিন্তু পরে তিনি, আমি যেমনটি বলেছি, পিটারের সন্নিধানে আসেন। পিটার যীশুর বক্তব্য শ্রোতাদের উপযোগী করে প্রকাশ করতেন, কিন্তু যীশুর জ্ঞানগর্ভ বাণী ও উপদেশের সুসমন্বিত সুসমন্বিত বিবরণ প্রদানের কোনো পরিকল্পনা তার ছিল না।[৪]

লূক, যিনি প্রেরিতদের কার্য সম্পর্কে লিখেছেন তিনিও কখনোই যীশুখৃষ্টকে দেখেননি। তিনি ছিলেন পলের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। যীশুর সাতে মথিরও কখনো সাক্ষাৎ হয় নি। মথি ছিলেন একজন কর আদায়কারী।

বলা হয়ে থাকে যে, মার্কের গসপেলই ‘Q’ গসপেল। মথি ও লূক তার গসপেল ব্যবহার করেই নিজেদের গসপেল রচনা করেন। যা হোক, মথি ও লুকের বর্ণনা অনেক বিশদ যা মার্ক করেন নি। এ থেকে মনে হয়, মার্কের গসপেলই তাদের গসপেলের একমাত্র উৎস বা অবলম্বন হতে পারে না। কেউ কেউ বলেন যে, এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যেহেতু মার্কের গসপেল রচিত হয়েছিল হিব্রুতে, পরে তা অনুদিত হয় গ্রীক ভাষায় এবং গ্রীক থেকে ল্যাটিনে। মার্কের গসপেলের হিব্রু ভাষায় রচিত

কপি এবং গ্রীক ভাষায় অনূদিত কপি ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে এ গসপেল এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনূদিত হওয়ার সময় কতটা পরিবর্তিত বা সংশোধিত হয়েছিল তা শুধু অনুমান সাপেক্ষ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, গসপেলগুলোর মধ্যকার স্ব-বিরোধিতার ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠিত চার্চের জন্য কিছুটা বিব্রতকর প্রমাণিত হওয়ায় গসপেলগুলো সমন্বয় করে মূলের কাছে প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। পলীয় চার্চ সেগুলোকে দ্বিতীয় শতকেই তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল সেই ৪টি গসপেলকেই সমন্বয় করার চেষ্টা করেছিলেন টাইশিয়ান (Titian)। এই গসপেলে টাইশিয়ান জনের গসপেলের শতকরা ৯৬ ভাগ, মথির গসপেলের শতকরা ৭৫ ভাগ, লূকের গসপেলের শতকরা ৬৬ ভাগ এবং মার্কের গসপেলের শতকরা ৫০ ভাগ, ব্যবহার করেন। বাকি অংশ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, তিনি পুরাতন গসপেল গুলোর ওপর সামান্যই আস্থা রেখেছিলেন এবং রচিতব্য গসপেলের ওপর বিপুলভাবে নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু তার সমন্বয়কৃত গসপেল সফল হয় নি।

সুতরাং মার্কের গসপেল অন্য ৩টি গসপেলের অভিন্ন উৎস হতে পারে কিনা তা বিতর্কের বিষয়। পক্ষান্তরে এই ৩টি গসপেলে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, বার্নাবাসের গসপেলে সেগুলো রয়েছে।

এ ধরনের বিতর্কিত প্রেক্ষাপটে এই ৩ ব্যক্তি একই উৎস থেকে তাদের জ্ঞান আহরণ করে থাকুন আর নাই থাকুন, বার্নাবাস সম্পর্কে এ ঐশী নির্দেশের কথা স্মরণ করা যায়:

যদি সে তোমাদের কাছে আসে, তাকে স্বাগত জানাও।

[কলেসিয়ানদের কাছে পত্র (Epistle to the Colossians, ৪ : ১০)]

## চতুর্থ অধ্যায়
## হারমাসের দি শেফার্ড

হারমাসের "দি শেফার্ড" (The Shepherd) বা মেষপালক গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ৮৮ থেকে ৯৭ সনের মধ্যে, এফিসাসের কাছে প্যাটমস-এ। বার্নাবাসের গসপেলের মত এ গ্রন্থেও ঈশ্বরের একত্বের কথা ব্যক্ত হয়েছে। এ কারণেই যখন প্রতিষ্ঠিত পলীয় চার্চে ত্রিত্ববাদ দৃঢ়ভাবে স্থিতি লাভ করে তখন এ গ্রন্থটি ধ্বংসের জন্য সমন্বিত চেষ্টা চালানো হয়। এ ছাড়া ৩২৫ সনে নিসিয়ার কাউন্সিলে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সকল গ্রন্থ নিষিদ্ধ করা হয়, এটি ছিল তার অন্যতম।

ধারণা করা হয় যে, জন যখন তার গসপেল রচনা করেছিলেন, একই সময়ে "দি শেফার্ড" লেখা হয়েছিল। যদিও কিছু লোকের ধারণা যে "দি শেফার্ড" জন-এর গসপেলের আগেই রচিত। যাহোক, মতপার্থক্য যাই থাক না কেন, এটা সত্য যে হারমাস নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত ৪টি গসপেলের কোনোটিই দেখেন নি বা পাঠ করেন নি। কেউ কেউ মনে করেন, হারমাস হিব্রুতে রচিত গসপেল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, প্রথম দিককার এ গসপেলের কোনো সন্ধান পরে পাওয়া যায় নি। তবে এ গ্রন্থটি কীভাবে লেখা হয়েছিল সে বিষয়ে হারমাস যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে এসব ধারণার কোনো সমর্থন মেলে না।

নিসিয়ার কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যীশুর গোড়ার দিকের অনুসারী ও ভক্তগণ কর্তৃক এ গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে গৃহীত ও ব্যবহৃত

হয়। তারা হারমাসকে একজন নবী হিসেবে গণ্য করতেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ নাগাদ আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট (Clement) কর্তৃক এ গ্রন্থটি নিউ টেস্টামেন্টের অংশ হিসেবে গৃহীত হয়। অরিজেন ও (Origen, ১৮৫-২৫৪ খৃ) এ গ্রন্থটিকে ঐশী গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং চতুর্থ শতাব্দীতে ব্যবহৃত Codex Sinaiticus- এর শেষাংশে এটি স্থান লাভ করে। এ.ডি টারটালিয়ান (A.D. Tertullian, ১৬০-২২০ খৃ.) প্রথমে একে গ্রহণ করলেও পরে তা পরিত্যাগ করেন। ইরানিয়াস (১৩০-২৩০) এটিকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেন। কায়সারিয়ার ইউসেবিয়াস (Eusebius of Caesaria) এটি প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু এথানাসিয়াস (Athanasius) ৩৬৭ সনে এটি গ্রহণ করেন। তার যুক্তি ছিল যে, নতুন ধর্মান্তরিতদের ব্যক্তিগত পাঠের জন্য “দি শেফার্ড” অত্যন্ত উপযোগী। ম্যানিচিয়াস নামক (Manichaeaus) নামক পারস্যের এক খৃষ্টান ব্যক্তি এটি প্রাচ্যে নিয়ে যান। দান্তেও (Dante) নিশ্চিতভাবে এ গ্রন্থদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

সুতরাং “দি শেফার্ড” ছিল এমনি এক গ্রন্থ যা কোনো রকমেই উপেক্ষণীয় ছিল না এবং তা একটি ঐশী গ্রন্থ হিসেবে সে যুগের খৃষ্টান চিন্তাবিদ ও ঈশ্বর প্রেমী গণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। যীশুর শিক্ষাকে গ্রীক মনোভাবাপন্ন (Hellenise) করার আন্দোলনের শৈশব অবস্থায় এবং যখন যীশুর বহু অনুসারীই সচেতন ছিলেন যে, যীশু ইয়াহূদীদের কাছে মূসা আলাইহিস সালামের প্রচারিত ধর্ম পুনরুদ্ধার ও বিস্তারের জন্যই এসেছিলেন, তখনি এ গ্রন্থটি রচিত হয়। যীশুর ন্যায় তারাও ছিলেন আচারনিষ্ঠ ইয়াহূদী। কিন্তু যীশুর জ্ঞানের আলোকে তাদের

এতদিনের বিভ্রমজনিত অন্ধকার অপসারিত হয়। তারা এখনও ওল্ড টেস্টামেন্টে বিশ্বাস রেখেছেন ও অনুসরণ করছেন। যেহেতু "দি শেফার্ড" গ্রন্থে তারা যা জানতেন তা ব্যক্ত হয়েছিল সে কারণে তারা হারমাসের গ্রন্থটিকে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

কেউ কেউ যখন এ মর্মে বলতে শুরু করেন যে, কোনো খৃষ্টানেরই ইয়াহূদীদের আইন মেনে চলার প্রয়োজন নেই তখন নিউ টেস্টামেন্ট বলে পরিচিত নয় লিখিত বাইবেল, নতুন নিয়ম এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে শুরু করে। যা হোক, এসব বিরোধ সত্ত্বেও চার্চ কর্তৃক ওল্ড টেস্টামেন্ট বহাল থাকে। কারণ, ওল্ড টেস্টামেন্টকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা বহু লোকের কাছেই স্বয়ং যীশুকে প্রত্যাখ্যান হিসেবেই গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এর অনিবার্য ফল হিসেবে দেখা দেয় বিভ্রান্তি। একই সাথে ওল্ড টেস্টামেন্টকে গ্রহণ ও বর্জনের পাশাপাশি নিউ টেস্টামেন্টের মধ্যেই স্ব-বিরোধিতা দেখা দেয়। যেহেতু তা পুরোনোটিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করেই 'নতুন' হয়েছিল। তবে চার্চের গোড়ার দিকে এসব গ্রন্থ এবং বিভিন্ন মতবাদ ও বিবরণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সেগুলোর তুলনামূলক যাচাই ও বিচারের কোনো আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। প্রথম দিকের খৃষ্ট সমাজের নেতৃবৃন্দ অবাধে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন এবং তাদের বিচারে যেসব গ্রন্থে যীশুর শিক্ষা ভালোভাবে আছে বলে মনে হত সেগুলোর কথাই তারা উল্লেখ করতেন।

৩২৫ খৃস্টাব্দে ত্রিত্ববাদের উদ্ভাবন, তার রূপ রেখা প্রণয়ন ও আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের কারণে পলীয় চার্চের কাছে এ ধরনের স্বাধীনতা আর গ্রহণযোগ্য ছিল না। ৪টি স্বীকৃত গসপেল নির্বাচন করা হয় এবং যীশুর জন্মের পরে লিখিত সকল ধর্মীয় গ্রন্থ নিষিদ্ধ করা হয়। যা হোক, পলীয় চার্চের নেতৃবৃন্দ, যারা তাদের রহস্যময় ধর্মমতের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট ছিল না, যা এ সময় গড়ে উঠছিল এবং যারা কিছু নিষিদ্ধ গ্রন্থের বৈধতা স্বীকার করেছিলেন, তারা চার্চের নয়া ধর্মমতের সাথে সরাসরি বিরোধিতা সত্ত্বেও এ সব গ্রন্থের কয়েকটিকে বহাল রাখতে চেয়েছিলেন। এসব গ্রন্থ একত্রে জড়ো করা হয় এবং সেগুলো শুধু চার্চের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের ব্যবহারের মধ্যেই সীমিত রাখা হয়। এগুলো পরিচিত 'Apocrypha' নামে যার অর্থ হলো "জনগণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা"। এরপর সেগুলো বাইবেল থেকে অপসারণ করা হয়। যে সকল লোকের কাছে এ সব গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছিল তাদেরসহ গ্রন্থগুলো প্রকাশ্যে ধ্বংস করে ফেলা হয়। সামান্য কিছু সংখ্যক কপি মাত্র এ ধ্বংসকান্ড থেকে রক্ষা পায়। বার্নাবাসের গসপেলের মত হারমাসের The Shepherd-এর ভাগ্যেও একই পরিণতি ঘটে। গ্রন্থটি নিউ টেস্টামেন্ট থেকেও বাদ দেওয়া হয়। যেহেতু এ গ্রন্থটির কারণে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত লোকদের মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল সে কারণে এটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার চেষ্টা চালানো হয়।

তবে এ সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। এ গ্রন্থটির কথা বিভিন্ন সূত্রে উল্লিখিত রয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের কেউ দীর্ঘকাল তা পাঠ

করতে সক্ষম হয় নি। আকস্মিকভাবে ১৯২২ খৃস্টাব্দে এ গ্রন্থটির একটি তৃতীয় শতাব্দীর প্যাপিরাস পাণ্ডুলিপি আলোর মুখ দেখতে পায়।

দেখা যায় যে হারমাসের ব্যবহৃত গ্রীক ছিল একটি সহজ ভাষা। সাধারণ মানুষ এ ভাষা বুঝতে পারত। এটা পরিষ্কার যে, গ্রন্থটি সকলের কথা ভেবেই রচিত হয়েছিল, গণ্যমান্য বুদ্ধিজীবীদের জন্য নয়। তার ভাষা সরল ও ঘরোয়া এবং তার মৌলিক প্রকাশভঙ্গী বইটিকে সহজ পাঠ্য করেছিল।

হারমাস তার গ্রন্থটি শুরু করেছেন তার দেখা চারটি স্বপ্নের বিবরণ দিয়ে। শেষ স্বপ্নটিকে তিনি আখ্যায়িত করেছেন প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি বলে যেহেতু এ সময় মেষপালকের পোশাকে সজ্জিত এক স্বর্গীয় দূত তার কাছে এসেছিলেন। স্বর্গীয় দূত তাঁকে জ্ঞাত করেন যে, 'সর্বাপেক্ষা সম্মানিত স্বর্গীয় দূত' (অর্থাৎ গাব্রিয়েল) তাকে তার কাছে প্রেরণ করেছেন। হারমাস যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন তিনিও তার সাথে থাকবেন।

এরপর স্বর্গীয় দূত হারমাসকে 'সকল নির্দেশাবলী ও ধর্মমতের ব্যাখ্যা' লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। যেহেতু স্বর্গীয় দূত কর্তৃক এগুলো লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং উক্ত স্বর্গীয় দূতকে নির্দেশ দিয়েছিলেন 'সর্বাপেক্ষা সম্মানিত স্বর্গীয় দূত' সে কারণে তৎকালীন খৃষ্টানগণ এ গ্রন্থকে ঐশী গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করে।

হারমাস যেসব নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেগুলো নিম্নরূপ:

১. সর্বপ্রথমেই বিশ্বাস করতে হবে যে, ঈশ্বর এক এবং তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোকে সংগঠিত করেছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই, তিনি সব কিছুকে ধারণ করেন কিন্তু তিনি নিজে ধারণকৃত নন। তাঁকে বিশ্বাস কর ও ভয় কর এবং তাকে ভয় করে আত্ম-সংযমী হও। এ আদেশ মান্য কর এবং নিজের সকল দুষ্ট প্রবৃত্তি দূর কর এবং সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হও। আদেশ মান্য করলে তুমি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করবে।

২. বিশ্বস্ত ও সরলমনা হও। কারো সম্পর্কে মন্দ কথা বলবে না এবং কেউ বললেও তাতে কর্ণপাত করবে না। ন্যায়নিষ্ঠ হও এবং মুক্তহস্তে দান কর।

৩. সত্যকে ভালোবাসো।

৪. পবিত্র হও। শুধু কাজে নয়, চিন্তায়ও পবিত্র হতে হবে।

৫. সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল হও। ঈশ্বর ধৈর্যশীল কিন্তু শয়তান অসহিষ্ণু।

৬. যা সত্য সেটাই বিশ্বাস কর। যা সত্য নয় তা বিশ্বাস কর না। ন্যায়ের পথ সহজ ও সরল কিন্তু অন্যদের পথ বাঁকা। মানুষের সাথে দু'জন স্বর্গীয় দূত আছে, একজন ন্যায়ের হিসাব রাখে অন্যজন অন্যায়ের।

৭. ঈশ্বরকে ভয় কর ও তার আদেশ মেনে চল।

৮. অন্যায়ের ব্যাপারে নিজকে সংবরণ কর, অন্যায় কর না। তবে ন্যায়ের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ কর না। যা সঠিক তাই কর। সকল অসৎ কাজ থেকে নিজকে সংযত কর এবং সত্য পথ অনুসরণ কর।

৯. নিজের মন থেকে সন্দেহ দূর কর। কোনো সংশয় ছাড়া ঈশ্বরের কাছে চাও এবং তুমি সব কিছু পাবে। ঈশ্বর মানুষের ন্যায় ঈর্ষা পরায়ণ নন, তিনি ক্ষমাশীল এবং তার সৃষ্টির প্রতি করুণাশীল। সুতরাং জাগতিক গর্ব-দম্ভ থেকে হৃদয়কে মুক্ত কর।

১০. মন থেকে দুঃখবোধ দূর কর, কারণ তা সন্দেহ ও ক্রোধের সহোদরাস্বরূপ।

১১. যে ভণ্ড নবীর সাথে আলাপ পরামর্শ করে সে মূর্তিপূঁজক ও সত্য বিচ্যুত। হারমাস স্বর্গীয় দূতের কাছে জানতে চান যে, কীভাবে একজন সত্য ও মিথ্যা নবীকে চেনা যাবে। জবাবে তিনি জানান, যিনি নবী তিনি হবেন ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী। তিনি সকল অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকবেন। তার কোনো জাগতিক আকঙ্খা থাকবে না। তিনি নিজের কোনো কথা বলবেন না... ঈশ্বর যখন চাইবেন তখনি তিনি কথা বলবেন........ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।

একজন মিথ্যা নবী নিজেই নিজের প্রশংসা করবে এবং নিজের জন্য উচ্চাসন চাইবে। সে হবে দুর্দান্ত, নির্লজ্জ ও বাচাল। সে বিলাস ব্যসনের মধ্যে থাকবে এবং তার নবীত্বের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে। কোনো পবিত্র আত্মা কি নবীত্বের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারেন? মিথ্যা নবী সৎ লোকদের পরিহার করে এবং নীচে তাদের সাথেই সংশ্লিষ্ট

থাকে যারা সন্দেহ প্রবণ ও দাম্ভিক। সে তাদের কাছে সর্বদা মনোরঞ্জনকর মিথ্যা কথা বলে। একটি শূন্য পাত্র অন্য শূন্য পাত্রের মধ্যে রাখা হলে ভেঙে যায় না, বরং তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতি লক্ষিত হয়। একটি পাথর হাতে নিয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দাও, দেখ তা আকাশ ছুঁতে পারে কিনা। জাগতিক বস্তুসমূহ অক্ষম ও দুর্বল। অন্যদিকে ঐশী শক্তিকে গ্রহণ কর। একটি শিলা ক্ষুদ্র বস্তু, কিন্তু তা যখন মানুষের মাথার ওপর পড়ে তখন কত না যন্ত্রণা দেয়। অথবা দেখ, ছাদের ওপর থেকে পানির ফোঁটা মাটিতে পড়ে মিলিয়ে যায়। অথচ এই পানির ফোঁটা পড়ে পড়েই পাথরের বুকে গর্ত সৃষ্টি হয়। সুতরাং ঐশী শক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী।

১২. মন থেকে সকল অসৎ ইচ্ছা দূর কর এবং সৎ ও পবিত্র ইচ্ছায় মনকে সজ্জিত কর। ঈশ্বর মানুষের স্বার্থেই বিশ্বে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরপ্রেমী ব্যক্তি সব কিছুর অধিকারী হবে। ঈশ্বরের একজন দাসের মত আচরণ কর। যারা ঈশ্বরের দাস, শয়তান তাদের কবজা করতে পারে না। শয়তান তাদের সাথে লড়াই করতে পারে, কিন্তু পতন ঘটাতে পারে না।[১]

## পঞ্চম অধ্যায়

## বার্নাবাস ও আদি খৃষ্টানগণ

বার্নাবাস বা বার-নেব শব্দটির অর্থ 'সান্ত্বনার পুত্র' বা 'প্রেরণার পুত্র'। বার্নাবাস ছিলেন একজন ইয়াহূদী। তিনি সাইপ্রাসে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম ছিল জোসেস বা জোসেফ। তার বার্নাবাস নামটি যীশুর শিষ্যদের দেওয়া। যদিও ৪টি গসপেলে তার সম্পর্কে সামান্যই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গ্রন্থ থেকে প্রমাণ মিলে যে, যীশুর অন্তর্ধানের পর তিনি তার শিষ্যদের নেতা হয়েছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি সর্বোপরি যীশুর প্রকৃত শিক্ষা অবিকলভাবে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালান এবং বিশেষ করে টারসসের পলসহ অন্যান্যদের নতুন কিছু সংযোজনের বিরোধিতা করেন। লূক, যিনি 'প্রেরিতদের কার্য' (Acts of the Apostles) লিখেছিলেন, তিনি ছিলেন পলের ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং তিনি পলের দৃষ্টিভঙ্গিই ব্যক্ত করেছেন। এ থেকেই বুঝা যায় কেন তিনি শুধু পলের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়েই বার্নাবাসের কথা উল্লেখ করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পলীয় চার্চ একসময় যখন ত্রিত্ববাদ গ্রহণ করে তখন এ মতবাদের বিরোধী সকল প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা কালে The Travels and teachings of the Apostles- এর মত গ্রন্থও ধ্বংস করে ফেলা হয়। ফলে বার্নাবাস ও আদি খৃষ্টানদের সম্পর্কে অধিকাংশ গ্রন্থই বিলুপ্ত হয়। ত্রিত্ববাদদের এই নীতির কারণেই ৪টি গৃহীত গসপেল থেকে আশ্চর্যজনকভাবে যীশুর ধর্মপ্রচার কালীন সময়ে বার্নাবাসের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ কারণেই লূকের মতে যীশুর অন্তর্ধানের পর তার

শিষ্য ও অনুসারীদের নেতৃত্বদানের যোগ্যতা যে বার্নাবাস ছাড়া দ্বিতীয় আর কারো ছিল না, সে বার্নাবাস নিজে, পলের সাথে মতবিরোধ ও সঙ্গত্যাগের পরপরই ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যায়।

যীশুর ধর্মপ্রচারের গোড়া থেকেই বার্নাবাস তার সঙ্গে ছিলেন। তার গসপেল থেকে যীশুর প্রতি তার অতুলনীয় আনুগত্য ও ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। বার্নাবাস শুধু যীশুর সার্বক্ষণিক সহচরই ছিলেন না- তিনি তার মহান শিক্ষা আত্মস্থ ও স্মরণ রেখেছিলেন। তিনি অত্যল্পকালের মধ্যেই বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন, কারণ তিনি যীশুর কাছ থেকে লব্ধ শিক্ষা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম ছিলেন। যীশুর শিষ্য ও অনুসারীরা তাঁকে নাম দিয়েছিলেন তা থেকে বক্তা হিসাবে তার শক্তিমত্তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সান্ত্বনা ও উৎসাহের উৎস। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও উদার। যীশুর সাথে সাক্ষাতের পর তিনি তার সকল সম্পদ বিক্রি করে দেন এবং সে অর্থ যীশুর অনুসারীদের ব্যবহারের জন্য প্রদান করেন। তাঁকে যেসব নাম দেওয়া হয়েছিল তিনি তার সবগুলোতেই পরিচিত ছিলেন। এ থেকে তার প্রতি যীশু ও তার শিষ্যদের স্নেহ ও ভালোবাসার পরিচয় মেলে। যীশুর শিষ্যরা জুডাসের স্থলে এমন একজনকে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেন যিনি একবারে জনের দীক্ষিত করার সময় থেকে যীশুর সার্বক্ষণিক সহচর ছিলেন। তারা এ জন্য দু'জনকে মনোনীত করেন। একজন হলেন যোসেফ যাকে বার্নাবাস বলা হত। তার আর এক নাম ছিল জাষ্টাস (Justus) অন্যজন হলেন: ম্যাথিয়াস (প্রেরিত দূতদের কার্য ১ : ২২-২৩)। যীশুর জীবনকালে তার সঙ্গী হিসাবে নিউ টেস্টামেন্টে যে যোসেফের কথা

উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বার্নাবাস ছাড়া আর কেউ নন। কারণ এসময় শুধুমাত্র তাকেই যোসেফ নামে ডাকা হত। গুডস্পীড বলেন, সুতরাং সকল সম্ভাবনা যার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বার্নাবাস, কেননা ভয়ংকর বিষ পান করেও তার কোনো অসুবিধা হয় নি। যদি তাই হয়, তাহলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বার্নাবাস যদি যীশুর প্রথম সারির ১২ জন শিষ্যের একজন নাও হয়ে থাকেন তবে প্রথম ৭০ জন শিষ্যের মধ্যে অবশ্যই তিনি একজন ছিলেন। আসল ঘটনা হলো, যীশুর মূল দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে প্রথম শিষ্যের মর্যাদা লাভের যথেষ্ট যোগ্যতা তার ছিল। এর সমর্থন মেলে নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে। যীশুর মাতা মেরী যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তিনি ১২ জন শিষ্যের সকলকেই ডেকে পাঠান। যারা এসেছিলেন, তাদের মধ্যে বার্নাবাস ছিলেন অন্যতম। আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট ও (Clement of Alexandria) সব সময়ই বার্নাবাসকে ১২ জন শিষ্যের একজন হিসেবে উল্লেখ করে গেছেন। এমনটি হতে পারে যে, যীশু এসেনী সম্প্রদায় কর্তৃক লালিত পালিত হয়েছিলেন এবং জানা যায় যে বার্নাবাস সেকালের গোঁড়া ইয়াহূদীবাদের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক জামালিয়েল (Gamaliel)- এর একজন ছাত্র ছিলেন। সুতরাং যীশু বার্নাবাসের সাক্ষাতের অর্থ ছিল এই যে, এসেনীদের রহস্যময় অধ্যাত্মবাদী শিক্ষা ও মন্দিরের গোঁড়া ইয়াহূদীবাদের সমন্বয় ঘটেছিল। নিঃসন্দেহে তা উভয়ের মেধ্য সম্প্রীতি সৃষ্টিতে অবদান রেখেছিল। যেহেতু বার্নাবাস ছিলেন একজন লেভীয় পুরোহিত সে কারণে তিনি ধর্মপ্রাণ যোদ্ধাদের (Zealots) একটি ডিভিশনের কমান্ডার হয়ে থাকতে পারেন।

বার্নাবাস সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়। সর্বশেষ ঐতিহাসিক গবেষণায় ধীরে ধীরে তার ব্যাপারে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে যেহেতু তিনি ছিলেন যীশুর সার্বক্ষণিক সহচর। এখন একটা বিষয়ে সকলেই একমত যে, যীশুর 'লাষ্ট সাপার' বা শেষ সন্ধ্যা ভোজ বার্নাবাসের বোনের বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আলবার্ট শোয়েইটজার (Albert Sehweitzer) "দি কিংডম অব গড অ্যান্ড প্রিমিটিভক্রিশ্চিয়ান বিলিফ" গ্রন্থে লিখেছেন:

প্রেরিতদের কার্য (Acts) থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, যীশুর শিষ্য ও গ্যালীলির বিশ্বাস স্থাপনকারীরা জন মার্কের মায়ের বাড়িতে মিলিত হয়েছিলেন যিনি বার্নাবাস ও পলের প্রথম ধর্মপ্রচার সফরে তাদের সঙ্গী হয়েছিলেন (প্রেরিতদের কার্য ১২ : ২৫) ... তাদের সাক্ষাতের স্থানটি ছিল উপরের ঘর অর্থাৎ যেটি ছাদের ঠিক নীচেই অবস্থিত ছিল। (প্রেরিতদের কার্য ১ : ১২-১৪)। যীশুর সকল সহচরের উপস্থিতির ফলে সেটি ছিল এক বড় সমাবেশ। এটি ছিল সেই কক্ষ যে কক্ষে ইয়াহূদীদের পর্ব (Pentecost) উপলক্ষে একই স্থানে সকল বিশ্বাস স্থাপনকারী একত্র হয়েছিলেন (প্রেরিতদের কার্য ২ঃ১)। যীশু যে স্থানে তার শিষ্যদের নিয়ে "লাষ্ট সাপার" (Last Supper) এ মিলিত হয়েছিলেন, তার সাথে এ স্থানটি কি করে অভিন্ন বলে শনাক্ত করা গেল?

যীশু যখন বেথানী (Bethany) থেকে তার দু'জন শিষ্যকে তার জন্য ইয়াহূদী পর্বের ভোজ (Passover) আয়োজনের নির্দেশ দিয়ে শহরে

প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাদের বলেন যে পানিভরা কলস বহনকারী এক ব্যক্তি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলে তাদের তাকে অনুসরণ করতে হবে। সেই ব্যক্তি তাদের একটি বাড়িতে নিয়ে যাবেন যার ওপর তলাটি কম্বল বিছানো। সেখানেই তাদের খাবার প্রস্তুত করতে হবে। আমরা এই মূল্যবান তথ্যটি পাই মার্কের গসপেল থেকে (মার্ক ১৪ : ১৩-১৫), যার উৎস হলেন জন মার্ক। মথি শুধু এটুকু বলেছেন যে, যীশু শহরে কাউকে জানানোর জন্য দু'জন শিষ্যকে প্রেরণ করেন- "প্রভূ বললেন, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে; আমি ঐ বাড়িটিতে শিষ্যদের নিয়ে পর্বের দিন পালন করব" (মথি ২৬ : ৮)

থিওডোর যায়ন সেই মত পোষণকারীদের মধ্যে অন্যতম প্রথম যিনি বলেন যে, যীশু যে বাড়িতে শেষ খাবার গ্রহণ করেন তা মার্কের মায়ের বাড়িটির সাথে অভিন্ন ছিল এবং সেখানে যীশুর শিষ্যরা গ্যালীলি থেকে আগত বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন।[১]

যদিও শোয়েইটজার বলেছেন যে, সেই বাড়িটি জন মার্কের মায়ের, তিনি কিন্তু একথা স্মরণ করিয়ে দেন নি যে, মার্কের মা ছিলেন বার্নাবাসের বোন। যেহেতু বার্নাবাস তার যা কিছু সম্পদ ছিল তার সবই বিক্রি করে দিয়েছিলেন, সেহেতু ধারণা করা হয় যে, তিনি জেরুজালেমে থাকার সময় তার বোনের বাড়িতে যথেষ্ট বড় ঘর ছিল যা সকল শিষের স্থান সংকুলানের উপযুক্ত ছিল। নিউ টেস্টামেন্টে এ সব বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না হওয়ার কারণ সম্ভবত এটাই যে, যীশুর শিষ্যরা তাদের সাক্ষাতের স্থানকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। কেননা সেটা

ছিল এমন এক সময় যখন নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে তাদের ওপর নির্যাতন চলছিল।

এখন প্রশ্ন জাগে যে, বার্নাবাস সুস্পষ্টভাবে তার বোনের বাড়িতে যে কোনো সমাবেশের মেজবান হওয়া সত্ত্বেও গৃহীত ৪টি বাইবেলের ‘লাষ্ট সাপারের’ বর্ণনায় তার নাম উল্লেখ হয় নি কেন? হয় তার নাম উল্লেখিত ছিল কিন্তু পরে অপসারণ করা হয়েছে অথবা সোজা কথায় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এটা সম্ভব যে, কারাগারে থাকার কারণে সেখানে উপস্থিত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। লিখিত বর্ণনায় দেখা যায়, বারাববাস (Barabbas) নামক এক ব্যক্তি একদল লোক নিয়ে রোমান পন্থী ইয়াহূদীদের আক্রমণ করেন। আর এ সংঘর্ষ ঘটেছিল ইয়াহূদী পর্ব উপলক্ষে আয়োজিত ভোজের অত্যল্পকাল পূর্বে। এ সংঘর্ষে ইয়াহূদীদের নেতা নিহত হন, কিন্তু বারাববাস আটক হন ও তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এ সংঘর্ষের ঘটনাবলী বিশদভাবে পরীক্ষাকারী হেইনরিখ হলোজম্যান (Heinrich Holtzman) বলেন, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে বিখ্যাত বারাববাসও ছিলেন যিনি ছিলেন নিশ্চিতভাবে একজন দেশপ্রেমিক ও একজন রাজনৈতিক ‘নবী’। যীশুর সাথে প্রায় একই সময় তারও বিচার অনুষ্ঠিত হয়।[২] যেহেতু বার্নাবাস একজন লেবীয় পুরোহিত ছিলেন এবং যীশুর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন প্রধান, সে কারণে তিনি ধর্মপ্রাণ যোদ্ধাদের একটি ডিভিশনের প্রধান হয়ে থাকতে পারেন। মরু সাগর পুঁথি (Dead Sea Serolls) থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই ৪টি ডিভিশন ছিল এসেনী সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তারা বিদেশি আগ্রাসনকারী ও তাদের সমর্থকদের

কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। শুধু একদল ধর্মপ্রাণ যোদ্ধাদের পক্ষেই সে সময় রোমান পন্থী ইয়াহূদীদের ওপর সংগঠিত আক্রমণ চালানো সম্ভব। সুতরাং এটা হতে পারে যে, বারাববাস ও বার্নাবাস এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এটা খুবই সম্ভব যে, পলের কাহিনীর অংশ নয় এমন কোনো ঘটনার সাথে জড়িত হিসেবে বার্নাবাসের নাম উল্লেখ থাকলে পলীয় চার্চ অন্যান্য সংশোধনীর সাথে তা হয় অপসারণ, নয় পরিবর্তন করেছে। তারা এ প্রক্রিয়া সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে পারে নি। কারণ, নিউ টেস্টামেন্টে বার্নাবাসের উল্লেখ্য রয়েছে। প্রেরিতদের কার্য থেকে জানা যায়, চার্চের গোড়ার দিকের দিনগুলোতে বার্নাবাস পলকে যে সমর্থন দিয়েছিল, তিনি সেটা না করলে খৃষ্ট ধর্মের ইতিহাসে পলের কোনো স্থান থাকত কিনা সন্দেহ।

যীশুর অন্তর্ধানের পর তার নিকট অনুসারীদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল, সে ব্যাপারে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। মনে হয় যীশুর কথিত ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর তাদের অনেকেই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কিছুকাল পরে তারা জেরুজালেমে আবার জড়ো হতে শুরু করেন। ১২ জন শিষ্য এবং ৭০ জন ঘনিষ্ঠ অনুসারীর মধ্যে কতজন ফিরে এসেছিলেন তা জানা যায় না। এটা নিশ্চিত যে, যারা ফিরে এসেছিলেন তারা ছিলেন বিশ্বাসী, আন্তরিক ও সাহসী এবং যীশুর জন্য তাদের ছিল সুগভীর ভালোবাসা। যীশুর ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে বার্নাবাসের অবস্থান শিষ্যদের ছোট দলটির মধ্যে তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। তারা ইয়াহূদী হিসেবেই জীবন যাপন করতেন এবং যীশু তাদের যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা পালন করতেন। তারা নবীগণের বিধান অনুসরণ

করতেন যা "ধ্বংস নয়, পরিপূর্ণ করার জন্যই" যীশু আগমন করেছিলেন (মথি ৫ : ১৭)। সে কারণে তাদের কারো কাছেই যীশুর শিক্ষা নতুন কোনো ধর্ম ছিল না। তারা ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ ইয়াহূদী এবং প্রতিবেশীদের সাথে তাদের পার্থক্য ছিল যীশুর প্রচারিত বাণীতে তাদের বিশ্বাস। গোড়ার দিকের এই দিনগুলোতে তারা নিজেদের একটি পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে সংগঠিত করেন নি এবং তাদের কোনো সিনাগগও (ইয়াহূদীদের উপাসনালয়) ছিল না। মূসা আলাইহিস সালাম প্রচারিত ধর্মেরই অব্যাহত ও পুনর্ব্যক্ত রূপ। যে সকল ইয়াহূদী মূসা আলাইহিস সালামের বাণীকে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করছিল এবং যারা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যে, যীশুর অনুসারীদের সমর্থনের অর্থ হবে অনিবার্যরূপে নিজেদের সম্পদ, শক্তি ও অবস্থানের জন্য ক্ষতিকর, সে সব ইয়াহূদীদের কারণেই যীশুর অনুসারী ও ইয়াহূদীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। উচ্চ শ্রেণির ইয়াহূদীরা তাদের বিশেষ স্বার্থ ও শত শত বছর ধরে ভাগকৃত সুযোগ সুবিধা রক্ষার জন্য রোমানদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। এর ফলে তারা এমনকি নিজেদের ধর্ম থেকেও সরে গিয়েছিল। যাদের কথা ও কাজের ফলে তাদের কৃতকর্ম প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকা ছিল, এমন ব্যক্তিদের ওপর নির্যাতন চালানোর জন্য এ সব ইয়াহূদী রোমানদের সক্রিয়ভাবে সমর্থন দিয়েছিল। তাই দেখা যেত যে, যীশুর একজন অনুসারী যখন তাকে গ্রহণ করেছে, সেখানে একজন ইয়াহূদী তাকে প্রত্যাখ্যান করছে। একদিকে রোমানরা তাদের রাজনৈতিক শক্তির প্রতি হুমকি বলে তাদের তাড়া করে ফিরত,

অন্যদিকে নিজেদের 'ধর্মীয় কর্তৃত্ব' খর্ব হবে এ আশংকায় ইয়াহূদীরাও তাদের খুঁজে বেড়াত।

পরবর্তী বছরগুলোতে যীশুকে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক ইয়াহূদী ও যীশুর অনুসারীদের মধ্যকার ব্যবধান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ৭০ সনে জেরুজালেম অবরোধের সময় যীশুর অনুসারীরা নগর ত্যাগ করে। ১৩২ সনে বার কোয়াচাবা (Bar Coachaba) বিদ্রোহের সময়ও একই ঘটনা ঘটে।

যীশুর আবির্ভাব তার বৈশিষ্ট্য ও ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের বিষয় পরবর্তীকালে বিপুল আলোচনা-ব্যাখ্যার উৎস হলেও তার আদি অনুসারীদের মধ্যে এ সব ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন দেখা দেয়নি। যীশু ছিলেন একজন মানুষ যিনি ছিলেন একজন নবী এবং এমনই এক ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের কাছে থেকে অনেক কিছু লাভ করেছিলেন। তারা কোনো প্রশ্ন ছাড়াই তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। যীশুর কথায় বা পৃথিবীতে তার অবস্থানকালীন জীবনে এমন কিছু ছিল না যাতে এ ধারণার কোনো ব্যত্যয় হয়। আরিষ্টাইডস (Aristides) এর মতে, গোড়ার দিকের খৃষ্টানরা ইয়াহূদীদের চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে একেশ্বরবাদী ছিল।

এই বিশ্বস্ত অনুসারী চক্রের মধ্যেই টারসসের পল বা পৌল (Paul of Tursus) বিচরণ করেছিলেন। তিনি কখনোই যীশুর সাথে সাক্ষাৎ করেন নি, কিংবা যীশুর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের কারো সাথেই তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। বরং যীশুর একজন বড় শত্রু হিসেবেই তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি ষ্টিফেন (Stephen) এর প্রতি পাথর নিক্ষেপ সতর্ক

দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ষ্টিফেন ছিলেন ধর্ম ও পবিত্র আত্মায়, (Holy ghost) পূর্ণ বিশ্বাসী (প্রেরিতদের কার্য ৬ : ৫) এবং সেই ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ভক্তদের একজন যিনি যীশুর অন্তর্ধানের পর তার অনুসারীদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। পলের নিজের শিক্ষক জামালিয়েল ষ্টিফেনকে রক্ষা করার চেষ্টা করলে তাকেও পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। জানা যায় যে, পল, যাকে তখন সল (Saul) বলে ডাকা হত, সে সময় চার্চের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অত্যাচার চালানোর জন্য দায়ী ছিলেন। তিনি গির্জাগুলো ধ্বংস করেন এবং ঘরে ঘরে প্রবেশ করে নারী ও পুরুষদের টেনে হিঁচড়ে বের করে এনে কারাগারে বন্দী হিসেবে নিক্ষেপ করেন (প্রেরিতদের কার্য ৮ : ১-৩)। পলের নিজের স্বীকারোক্তি:

“আপনারা শুনেছেন ......... কি প্রচণ্ড অত্যাচার আমি চালিয়েছি ঈশ্বরের চার্চের ওপর এবং সেগুলোকে ধ্বংস করেছি- আমি আমার স্বদেশীয় অনেকের চাইতে ইয়াহূদী ধর্মের কাছ থেকে লাভবান হয়েছি, কারণ আমি আমার পূর্বপুরুষদের চাইতেও অনেক বেশি ধর্মান্ধ। (গালাতীয়ান্স (Galatians) ১ : ১৩-১৫)

এবং প্রেরিত পুরুষদের কার্য ৯ : ৪১- এ এ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

পল যীশুর অনুসারীদের হুমকি প্রদান ও হত্যা চালিয়ে যেতে থাকলেন। তিনি প্রধান পুরোহিতের কাছে গেলেন এবং তার কাছে দামেশকের সিনাগগ গুলোর কাছে চিঠি লিখে দেওয়ার আবেদন জানালেন যাতে যীশুর অনুসারী কাউকে পাওয়া গেলে তা সে নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন, তাকে যেন জেরুজালেমে নিয়ে আসতে পারেন।

এই দামেশক যাত্রাপথে পল যীশুকে স্বপ্নে দেখেছিলেন এবং পরিণতিতে তার অনুসারীতে পরিণত হয়েছিলেন বলে কথিত আছে।

এসব ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার কিছু দিন আগে পল পোপিয়া (Ppea) নামি এক মহিলাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই মহিলা ছিলেন ইয়াহূদীদের সর্বোচ্চ পুরোহিতের আকর্ষণীয় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী কন্যা। তিনি পলকে পছন্দ করা সত্ত্বেও তার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ও রোমে গিয়ে অভিনেত্রী হন।

মঞ্চ থেকে ধাপে ধাপে তার উন্নতি হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তিনি সম্রাট নীরোর শয্যা পর্যন্ত পৌঁছে যান। শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে বিয়ে করেন ও রোম সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হন। সুতরাং ইয়াহূদী ও রোমান উভয়ের প্রতিই পলের বিতৃষ্ণা হয়ে ওঠার সংগত কারণ ছিল। মূলত পোপিয়া কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরই পল ধর্মান্তরিত হন। সে সময় তিনি অত্যন্ত আবেগতাড়িত ও মানসিক বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে ছিলেন। ইয়াহূদী ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর্থক হওয়ার পরিবর্তে তিনি যে এক বিরাট শত্রুতে পরিণত হন তার পেছনে সম্ভবত তার জীবনের এই সংকটের একটি ভূমিকা ছিল।

ধর্মান্তরিত হওয়ার পর পল দামেশকে যীশুর অনুসারীদের সাথে অবস্থান করেন এবং “সরাসরি সিনাগগগুলোতে গমন করে যীশু ঈশ্বরের পুত্র” বলে প্রচার করতে থাকেন (প্রেরিতদের কার্য ৯ : ২০)। এর ফলশ্রুতিতে তিনি অত্যাচারের স্বাদ লাভ করতে শুরু করলেন যার সাথে নিকট অতীতে তিনি নিজেই জড়িত ছিলেন। যদি তিনি যীশুর বর্ণনা

করতে গিয়ে সত্যই তাঁকে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে আখ্যায়িত করে থাকেন, তাহলে সম্ভবত তা ইয়াহূদীদের ক্রুদ্ধ করে তোলায় সহায়ক হয়েছিল। যেহেতু তারা ছিল ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী সে কারণে ঈশ্বরের একটি পুত্র থাকার ধারণাটি তাদের কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য ছিল।

এরপর পল দামেশক ত্যাগ করেন। তিনি যীশুর অন্যান্য অনুসারীদের সাহচর্য সন্ধানের পরিবর্তে আরবের মরুভূমিতে গমন করেন। সেখানে তিনি ৩ বছর লুকিয়ে থাকেন। খুব সম্ভবত এ নির্জনবাসেই তিনি যীশুর প্রচারিত শিক্ষার ভিত্তিতে নিজস্ব একটি রূপ তৈরির কাজ শুরু করেন। এর মধ্যে ছিল ইয়াহূদী আইন প্রত্যাখ্যান। যীশু তার জীবনব্যাপী একজন আচারনিষ্ঠ ইয়াহূদীই ছিলেন এবং তিনি মূসা আলাইহিস সালামের শিক্ষাকেই সর্বদা সমুন্নত রেখেছিলেন। কিন্তু পল এ সত্যকে অস্বীকার করেন।

মরুভূমির নির্জনবাস শেষে পল জেরুজালেমে ধর্ম প্রচারকদের কাছে আগমন করেন। তার আকস্মিক আগমনের ঘটনা বিস্ময় সৃষ্টির চাইতে সন্দেহ সৃষ্টি করে বেশি। পল যীশুর অনুসারীদের প্রতি যে নির্যাতন চালিয়েছিলেন, তার স্মৃতি তখনও তাদের মনে জাগরুক ছিল। একটি চিতাবাঘ কি তার শরীরের দাগ পরিবর্তন করতে পারে? যীশুর শিষ্যদের পক্ষে পলকে তাদের মধ্যে গ্রহণ করার কোনো কারণ ছিল না। তিনি যে তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন শুধু তাই নয়, তিনি আরো দাবি করেছিলেন যে, যীশুর শিক্ষা সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত অথচ তিনি তাকে কোনো দিন দেখেন নি ও তার সাথে কখনোই অবস্থান করেন নি।

এমনকি যীশুর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের সাথেও তিনি কখনো থাকেননি। যীশুর জীবিতকালে যারা তার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছিলেন, তাদের কাছ থেকে কিছু জানা ও শেখার বদলে পল তাদের শিক্ষা প্রদান করতে চাইলেন। পল পরে গালাতীয়দের কাছে লেখা তার চিঠিপত্রে তার এ পদক্ষেপের যৌক্তিকতা বর্ণনা করে বলেন,

ভাইসব, আমি এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে আমার দ্বারা প্রচারিত গসপেল কোনো মনুষ্য রচিত নয়। আমি কোনো মানুষের কাছ থেকে এটি লাভ করিনি কিংবা কেউ আমাকে এটা শিক্ষাও দেয়নি, এটি হলো যীশুর প্রত্যাদেশ থেকে প্রাপ্ত। (গালাতীয় ১ : ১০-১২)

এভাবেই পল যীশুর সাথে নিজের সম্পৃক্ততার দাবি করেন যা যীশুর জীবৎকালিন ঘনিষ্ঠ অনুসারীরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পল তাকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছি বলে দাবি করেন তা স্বয়ং যীশুর মুখ থেকে ধর্ম প্রচারকদের শোনা শিক্ষার সাথে মিলিয়ে দেখা হয় নি। এটা বোঝা যায় যে, তারা ধর্মান্তরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন এবং তার কথিত "প্রত্যাদেশ"-কে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেন নি। অনেকে সম্ভবত সন্দেহ করেছিলেন যে, তিনি যীশু অনুসারীর ছদ্মবেশে গুপ্তচর চাড়া আর কিছু নন।[৩] পলকে গ্রহণ করা হবে কিনা এ নিয়ে এক তিক্ত বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলাফল ছিল পূর্ব নির্ধারিত। এমতাবস্থায় জামালিয়েলের ছাত্র হিসেবে বার্নাবাস তার সহপাঠী পলের পক্ষে হস্তক্ষেপ ও প্রচারণা শুরু করেন। যীশুর অনুসারীদের তার সহপাঠী পলের পক্ষে হস্তক্ষেপ ও প্রচারণা শুরু করেন। যীশুর অনুসারীদের

সর্বসম্মত বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি পলকে তাদের দ্বারা গ্রহণ করান। এ থেকে ধর্ম প্রচারকদের ওপর বার্নাবাসের প্রভাবের মাত্রা এবং যীশুর জীবিত থাকা অবস্থায় তার সাথে তার সুগভীর ঘনিষ্ঠতার আভাস পাওয়া যায়। পল অবশ্যই এ কথা উপলব্ধি করেছিলেন যে, শুধুমাত্র বার্নাবাসের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বলেই তিনি গৃহীত হয়েছেন, নিজের প্রচেষ্টায় নয়। এর ফলে সম্ভবত তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাই এ ঘটনার পর পরই তিনি যে তার নিজের শহর টারসসে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সম্ভবত তার অন্যতম কারণ ছিল এটাই। অবশ্য এ কথাও জানা যায় যে, তার জীবন বিপদাপন্ন হওয়ার কারণেই তিনি জেরুজালেম ত্যাগ করেন।

রোমান ইয়াহূদীদের নির্যাতনের কারণে যীশুর বহু অনুসারী দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন। পল ও তার অনুসারীদের নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ধর্ম প্রচারক এন্টিওকের (Antioch) উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্যে রোম ও আলোকজান্দ্রিয়ার পর এন্টিওক ছিল তৃতীয় বৃহত্তম নগরী। এক সময় তা ছিল গ্রীক সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং ব্যবসা ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে নগরটি বিকশিত হয়েছিল। সম্পদের প্রাচুর্যে স্ফীত জনগণ বিলাসী হয়ে ওঠে। শিগগিরই তাদের অধঃপতন ঘটে এবং এন্টিওক নৈতিকতাহীন জীবনযাত্রার নগরী বলে কুখ্যাতি লাভ করে। এরকম একটি নগরে গায়ে শুধু কম্বল জড়ানো ক্ষুদ্র একদল আগন্তুক সহজ, সরল ও সততাপূর্ণ ঈশ্বর ভীতিপূর্ণ জীবন যাপন শুরু করে। নৈতিকতাহীন জীবন যাপনে ক্লান্ত নগরবাসীরা

তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভিড় জমাতে শুরু করে। কিন্তু অধিকাংশ লোকের কাছেই তারা ছিল অবজ্ঞা ও উপহাসের পাত্র। এসব নগরবাসী তাদের 'খৃষ্টান' বলে ডাকত। সামান্য কিছু লোকের কাছে এ শব্দটি ছিল শ্রদ্ধাব্যাঞ্জক, কিন্তু অন্যরা এ শব্দটিকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করত। এ সময় পর্যন্ত যীশুর অনুসারীরা নাজারিনি (Nazarene) নামেই পরিচিত ছিলেন। হিব্রু এ শব্দটির মূল অর্থ "রক্ষা করা বা 'প্রহরা দেওয়া।' এভাবেই এ বিশেষণটি যীশুর শিক্ষার রক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে তাদের ভূমিকার ইঙ্গিত বহন করছিল।

লাইবেনিয়াস (Libanius) বলেছেন যে, এন্টিওকের ইয়াহূদীরা দিনে তিনবার প্রার্থনা করত, "নাজারিনিদের ওপর ঈশ্বরের অভিশাপ প্রেরণ করা।" অন্য এক ঐতিহাসিক প্রফেরী (Prophery), যিনি সবসময় নাজারিনিদের বিরোধী ছিলেন, তিনি তাদের জীবন পদ্ধতিকে "বর্বর, নতুন ও অদ্ভুত ধর্ম" বলেন বর্ণনা করেছেন। সেলসাস (Celsus) বলেন, জেরোমের (Jerome) মতে খৃষ্টানদের "গ্রীক ভন্ড ও প্রতারক" বলে আখ্যায়িত করা হতো। কারণ গ্রীক মন্দিরের পুরোহিতরা যে আলখেল্লা পরিধান করতেন তারাও সেই একই গ্রীক আলখেল্লা পরিধান করতেন।

যীশুর অনুসারীরা এ ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও এ অদ্ভুত নবাগতদের কাছে লোকজনের আসা যাওয়া অব্যাহত ছিল এবং তাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাদের আগ্রহ দেখে উৎসাহিত হয়ে এন্টিওকের যীশু অনুসারীদের চারপাশের পৌত্তলিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সত্য বাণী ও যীশুর শিক্ষা প্রচারের জন্য একজন ধর্ম প্রচারককে

প্রেরণের জন্য জেরুজালেমে ধর্মপ্রচারকদের কাছে খবর প্রেরণ করেন। যীশুর শিষ্যরা এ কাজের জন্য বার্নাবাসকেই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনীত করেন। এভাবে বার্নাবাস হলেন খৃষ্টধর্মের ইতিহাস প্রথম মিশনারি বা ধর্ম প্রচারক। বার্নাবাস এন্টিওক গমন করেন এবং অকল্পনীয় সাফল্য লাভ করেন। তার প্রচেষ্টায় "বহু সংখ্যক লোক যীশুর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করে" (প্রেরিতদের কার্য, ১১ : ১৪)। এর কারণ বার্নাবাস ছিলেন একজন সৎ লোক এবং ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। এক বছর পর তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, এন্টিওকের বাইরে তার কর্মকাণ্ড প্রসারিত করার সময় এসেছে। তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, এ কাজে পল তার ভালো সাহায্যকারী হবেন। তিনি টারসস গমন করেন এবং পলকে নিয়ে ফিরে আসেন।[৪] এভাবে পল সেসব লোকের কাছে ফিরে এলেন যারা তারই হাতে নির্যাতিত হয়েছিল এবং তিনি পুনরায় বৈরিতা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হন। আরেকবার বার্নাবাস হস্তক্ষেপ করলেন এবং এন্টিওকের যীশু অনুসারী সমাজে পল গৃহীত হলেন। এ ঘটনা থেকে যীশু অনুসারী সমাজে বার্নাবাসের গুরুত্ব ও মর্যাদার বিষয়টি পুনরায় প্রমাণিত হয়। মনে হয় বার্নাবাস তার সাবেক সহপাঠীর শুধু ভালোটুকুই দেখেতে পেয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন, যে ধর্মীয় আবেগ ও উদ্দীপনা পলকে একজন অত্যাচারীতে পরিণত করেছিল তা যদি যীশুর ধর্মীয় প্রচারের কাজে লাগানো যায় তাহলে তিনি অসাধারণ ও অমূল্য অবদান রাখবেন।

কিন্তু সকল যীশু অনুসারী এ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হতে পারেন নি। পিটার সরাসরি পলের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। পলের অতীত

কার্যকলাপের কথা স্মরণ করে এ বৈরিতা আরো জোরালো হয়ে উঠার পাশাপাশি আরো দু'টি বিষয়ে মত পার্থক্য দেখা দেয়। যীশুর শিক্ষা কার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং শিক্ষা দেওয়া হবে সে ব্যাপারে তারা একমত হতে পারলেন না। পিটার মত প্রকাশ করেন যে, ইয়াহূদীদের কাছে প্রচারিত ধর্ম পুনরুজ্জীবনের জন্যই যীশুর আগমন ঘটেছিল। সে কারণে তার শিক্ষা শুধুমাত্র ইয়াহূদীদের মধ্যেই প্রচার হবে। অন্যদিকে পল শুধু যে ইয়াহূদী ও অন্যদেরসহ সকলের কাছেই ধর্ম প্রচারের পক্ষ মত প্রকাশ করেন তাই নয়, উপরন্তু বলেন যে যীশুর অন্তর্ধানের পর তিনি তার কাছ থেকে অতিরিক্ত নির্দেশনা লাভ করেছেন। তিনি আরো বলেন যে সময় ও পরিস্থিতির দাবির সাথে যীশুর শিক্ষার প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করতে হবে। বার্নাবাস উভয় পক্ষের মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি মত দিলেন যে, তাদের শুধু সে শিক্ষাই দান করা উচিৎ যা যীশু শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তবে তিনি বলেন, এ শিক্ষা তার কাছেই প্রচার করা উচিৎ যার এতে কল্যাণ হবে এবং যে সাড়া দিবে, সে ইয়াহূদীই হোক আর অ-ইয়াহূদীই হোক। বার্নাবাস ও পিটার যীশুর কাছ থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাকে তারা ইয়াহূদী ধর্মের (Judaism) অব্যাহত ও সম্প্রসারিত রূপ হিসাবেই গণ্য করতেন। তারা স্বয়ং যীশুর কাছ থেকে যা শুনেছিলেন তার সাথে পলের শিক্ষার যেখানে মিল ছিল না, সে অংশটি গ্রহণ করতে পারেন নি। তারা বিশ্বাস করতেন যে, পলের নয়া ধর্মমত সম্পূর্ণরূপেই তার একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি। আলবার্ট শোয়েইটজার (Albert Shweitzer)

তার ‘Paul and His Interpreters’ গ্রন্থে বলেছেন যে, পল কখনোই তার গুরুর (যীশু) বাণী ও নির্দেশ প্রচার করেন নি।[৫]

মনে হয়, বার্নাবাস আশা করেছিলেন যে, এ দুই চরমপন্থী নমনীয় হবেন এবং বিশেষ করে পল যীশুর অনুসারীদের সাহচর্য থেকে যীশুর শিক্ষার পূর্ণ উপলব্ধি ও রূপায়ণের মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞানের স্বার্থে নিজের ধারণা পরিত্যাগ করতেন। পলের প্রতি এ পর্যায়ে বার্নাবাসের সমর্থন যে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কারণ বার্নাবাস ধর্ম প্রচারকারীদের সর্বসম্মত বিরোধিতার মুখে পলকে আশ্রয় প্রদান ও রক্ষা করেছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই বার্নাবাসের জীবনের এ পর্যায়টি ধর্ম প্রচারকদের কর্মকান্ডে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রেরিতদের কার্য, ১৩ : ১-২ তে বার্নাবাস ও পলের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে বলা হয়েছে:

“এন্টিওকের চার্চে বার্নাবাস ও সিমেওনের মত কতিপয় ধর্মগুরু ও শিক্ষক ছিলেন যাদেরকে সাইরিনের নাইজার (Niger of Cyrene) ও মানায়েনের লুসিয়াস (Lucius of Manaen) বলে আখ্যায়িত করা হত যাদের কে হেরোদ দি টেট্রার্ক (Herod the Tetrarch) এবং সলের (Saul) সাথে প্রতিপালন করা হয়েছিল। যখন তারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও উপবাস করলেন তখন পবিত্র আত্মা বললেন: বার্নাবাস ও সলকে আমার সে কাজের জন্য পৃথক কর যে কাজের জন্য আমি তাদের আহ্বান করেছি।”

এসব অনুসারীদের নামের তালিকায় লূক বার্নাবাসকে প্রথম ও পলকে শেষে স্থান দিয়েছেন। একত্রে কাজ করার জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর

তারা বার্নাবাসের বোনের পুত্র জন মার্ককে নিয়ে যীশুর শিক্ষা প্রচারের জন্য গ্রীস যাত্রা করেন। যোসেফের ঔরসে জন্মলাভকারী মেরীর পুত্র জেমসকে এন্টিওকে যীশুর অনুসারীদের প্রধান নির্বাচিত করা হয়। পিটারও সেখানেই থেকে যান।

প্রেরিতদের কার্য-তে (Acts) আছে যে, কয়েকটি স্থানে তাদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও এ দুই ধর্ম প্রচারক সামগ্রিকভাবে সফল হন। সত্যানুসারী ব্যক্তি হিসেবে তাদের খ্যাতি দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। তারা যখন লুকাওনিয়া (Lucaonia) পৌঁছে এবং একজন পঙ্গুকে রোগমুক্ত করেন তখন গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মানুষের ছদ্মবেশে ঈশ্বরগণ আমাদের কাছে নেমে এসেছেন। তারা বার্নাবাসকে জুপিটার (Jupiter) নামে এবং পলকে মার্কারিয়াস (Mercurius) নামে আখ্যায়িত করে। তখন জুপিটারের পুরোহিতরা..... গরু ও মালা নিয়ে তোরণদ্বারে এল এবং সেগুলোকে জবাই করল। বার্নাবাস ও পল যখন এটা শুনতে পেলেন, তারা তাদের পোশাক ছেঁড়ে ফেলে কাঁদতে কাঁদতে লোকজনের কাছে দৌড়ে গেলেন। তারা বললেন . তোমরা এ সব কী করছ? আমরা তোমাদেরই মত সাধারণ মানুষ, আমরা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের কথা প্রচার করতে এসেছি যিনি স্বর্গ, পৃথিবী ও সমুদ্র সহ বিশ্বমণ্ডলের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। (প্রেরিতদের কার্য, ১৪ : ১১-১৫)

গ্রীসের অধিবাসীদের এই প্রতিক্রিয়া যদি স্বাভাবিক হয়ে থাকে তবে তা ছিল বাস্তব সমস্যার ইঙ্গিত বহনকারী যার সম্মুখীন হয়েছিলেন বার্নাবাস

ও পল। একজন প্রকৃত ইয়াহূদী যীশুর শিক্ষাকে মূসা আলাইহিস সালামের প্রচারিত ধর্মেরই পুনর্ব্যক্ত রূপ বলে তাৎক্ষণিকভাবে স্বীকার করবে। কিন্তু বহু মূর্তিপূঁজকের কাছেই সেটি নতুন ও অদ্ভুত এবং কিছুটা জটিল বলে মনে হবে। অধিকাংশ পৌত্তলিক তখন পর্যন্ত বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল। তারা মনে করত, ঈশ্বরগণ মানুষের সাথে অবাধ মেলা মেশা করে, তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং মানব জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ছিল তাদের একজন ঈশ্বরের অনুরূপ এবং এ অর্থে তারা যীশুকে গ্রহণ করতে সম্ভবত প্রস্তুত ছিল। সেখানে আরো একজন ঈশ্বরের স্থান ছিল। যা হোক, যীশুর প্রকৃত শিক্ষা তাদের সকল ঈশ্বরকে নাকচ করে দেয় ও এক ঈশ্বরের কথা ব্যক্ত করে। বহু পুতুল পূঁজারির কাছেই এ কথা গ্রহণযোগ্য ছিল না। অধিকন্তু, যীশুর ধর্মশিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল আচরণ বিধি যা কেউ অনুসরণ করতে চাইলে তার জীবনধারাই পালটে যেত। এটা একজন ইয়াহূদীর পক্ষেই সম্ভব ছিল, পৌত্তলিকের পক্ষে নয়। ইয়াহূদীদের সুদখোর জাতি হিসেবে গণ্য করা হত, অ-ইয়াহূদীদের সবাই তাদের পছন্দ করত না।

“ইয়াহূদী নয় এমন জনসমাজের মধ্যে ইয়াহূদীদের প্রতি ঘৃণা এতই প্রবল ছিল যে তাদের যৌক্তিক বা প্রয়োজনীয় কিছু করতে দেখলেও যেহেতু ইয়াহূদীরা সেটা করছে শুধু সে কারণেই জনসমাজ তা করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করত।[৬]

কোনো রকম আপোশ না করে গ্রীসে যীশুর প্রচারিত ধর্মের অনুসরণে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বার্নাবাসের মত নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা আর কারো ছিল

না। পল ইতিমধ্যেই যীশুর শিক্ষা পরিবর্তনে তার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এখন গ্রীক জনসাধারণের রুচি অনুযায়ী যীশুর শিক্ষার সমন্বয় সাধন অত্যাবশ্যক বলে মনে করলেন। গ্রীস তখন ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অংশ। রোমান দেবতা গ্রীকের দেবতাদের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত ছিলেন এবং তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ছিল গ্রীক দেবতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মতই একটি ভ্রান্ত ধারণা। পল এর আগে কিছু দিন রোমে কাটিয়েছিলেন এবং তিনি রোমান নাগরিক ছিলেন। সম্ভবত রোমান জীবনধারা তার নিজস্ব বিচারবোধকে প্রভাবিত করেছিল। রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে সাধারণ জনগণের ওপর গ্রেকো-রোমান (Graeco-Roman) ধর্মের জোরালো প্রভাব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, নিজেদের শিক্ষার পরিবর্তন ঘটানো ছাড়া তাদের ধর্ম রীতি পরিবর্তন করা সহজ হবে না। অন্য দিকে বার্নাবাস জানতে যে, তার স্রষ্টার ইচ্ছা নয় যে, তিনি তার আইনের এক বিন্দুমাত্র বিরূপ বা পরিবর্তন করেন। সে কারণে তিনি তার ধর্মমতের কোনো পরিবর্তনের ব্যাপারে অনড় ছিলেন। খৃষ্টধর্ম প্রচারের এ পর্যায়ে বিতর্কের প্রধান উৎস অধ্যাত্ম দর্শন (Metaphysical) সম্পর্কিত ছিল না। বুদ্ধিজীবীদের সূক্ষ্ম যুক্তি, তর্ক ও চুলচেরা- বিশ্লেষণের বিকাশ আরো পরবর্তী কালের ঘটনা। বার্নাবাস ও পলের মধ্যে যেসব বিষয় নিয়ে মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে ছিল তা ছিল মানুষের প্রাত্যহিক জীবন ও জীবন ধারা সম্পর্কিত। পল তার ও বার্নাবাসের গ্রীসে আগমনের পূর্বে সেখানে প্রচলিত ও পালিত আচার প্রথার আকস্মিক পরিবর্তন ঘটাতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই তিনি পশুর

গোশত হালাল হওয়া সম্পর্কিত এবং পশু কুরবানি বিষয়ে মূসা আলাইহিস সালামের প্রচলিত বিধান পরিত্যাগের ইচ্ছা পোষণ করেন। এমনকি তিনি খতনা সংক্রান্ত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রতিষ্ঠিত নিয়মও বাতিলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যীশুর শিক্ষার এসব দিক প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার প্রেক্ষিতে পল ও বার্নাবাসের মধ্যকার ব্যবধান বিদূরিত হওয়ার পরিবর্তে আরো ব্যাপকতর হয়ে ওঠে।

এ পর্যায়ে দু'জনের মধ্যে যেসব মতপার্থক্যের কথা বলা হয়েছে, সম্ভবত তা সঠিক নয়। পল ও বার্নাবাস উভয়েই যীশুর জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বাস্তব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। একেশ্বরবাদের শিক্ষা সমর্থন করা অত্যাবশ্যক ছিল। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে পৌত্তলিকদের আচার অনাচরণের চাইতে পৃথক ও বৈশিষ্ট্যময় আচার- আচরণের একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন ছিল। স্পষ্টতই দৈনন্দিন জীব নাচারের মধ্য দিয়েই সেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আচার- আচরণ পর্যায়ক্রমে গৃহীত ও আত্মকৃত হতে পারত। কোনো পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের পক্ষেই যীশুর সকল শিক্ষা ও আচরণ রাতারাতি গ্রহণ করে ফেলা সম্ভব ছিল না। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, পল ও বার্নাবাস কোনো স্থানেই দীর্ঘদিন অবস্থান করেন নি। স্বল্প সময়ের মধ্যে যীশুর সামগ্রিক শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সে কারণেই তারা প্রথমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর শিক্ষা প্রদান করতেন। তাদের ইচ্ছা ছিল, পরবর্তীকালে ফিরে এসে পুনরায় তারা তাতে সংযোজন করবেন এবং আরো নির্দেশনা প্রদান করবেন। বার্নাবাস

যেখানে যীশুর সমগ্র শিক্ষা প্রচার করতে আগ্রহী ছিলেন, পল সেখানে প্রয়োজন মত প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তিনি তার নিজের যে নয়া ধর্মমত গড়ে তুলছিলেন, সেখানে সেগুলোর আর প্রয়োজন ছিল না। যা হোক, তারা জেরুজালেম প্রত্যাবর্তনের পর পৃথক যুক্তিতে নিজ নিজ কর্মকান্ডের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। তারা যৌথভাবে যেসব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন তারও বর্ণনা দেন। তা সত্ত্বেও তাদের মতপার্থক্য বহাল রইল এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পথ পৃথক হয়ে যায়।

বলা হয়ে থাকে যে পল জন মার্ককে ভবিষ্যৎ কোনো সফরে সাথে নেয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যদিকে বার্নাবাস জনকে তাদের সফর সঙ্গী করার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করেন। আর এ কারণেই তাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। প্রেরিতদের কার্য, ১৫ : ৩৯-৪০-এ বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে বিরোধ এত তীব্র হয়ে ওঠে যে, তারা একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং এর পর বার্নাবাস মার্ককে নিয়ে সাইপ্রাস সফরে যান যেটি ছিল বার্নাবাসের জন্মভূমি। জন মার্কের বার্নাবাসের সফর সঙ্গী হওয়ার ঘটনা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তার ও তার মামার ধর্ম বিশ্বাস একই রকম ছিল। পল যে তাকে সঙ্গী রাখতে চান নি, সম্ভবত এটা তার অন্যতম কারণ। বাইবেলে এ বিষয়ের পর বার্নাবাসের উল্লেখ করা হয় নি বললেই চলে।

কৌতূহলের বিষয় যে প্রেরিতদের কার্য-এ উল্লেখ আছে, "পবিত্র আত্মা" (Holy Ghost) বার্নাবাসকে মনোনীত করলেও পল তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। মনে হয়, পল উপলব্ধি করেছিলেন যে, তার আর বার্নাবাসের

প্রয়োজন নেই। তার প্রথম দিনকার দিনগুলোতে যখন জানাজানি হয়ে যায় যে, তিনি যীশুর সঙ্গী ছিলেন না তখন কেউ তার ওপর আস্থাশীল ছিল না। কিন্তু যখন তিনি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন, তখন বিষয়টি আগের মত থাকে নি। তার খ্যাতি এতটাই হয়েছিল যে, তিনি কোনো ভীতি বা প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা ছাড়াই নিজের ধর্মমত প্রচার করতে পারবেন বলে উপলব্ধি করেছিলেন। এমনকি যীশুর শিক্ষা বহির্ভূত কিছু প্রচার করলে বার্নাবাস তার বিরোধিতা করতে পারেন, এ ধরনের সম্ভাবনাকেও তিনি আমলে আনেন নি। উপরন্তু পল ছিলেন একজন রোমান নাগরিক। তিনি অবশ্যই রোমানদের ভাষা শিখেছিলেন। সম্ভবত তিনি গ্রীক ভাষাতেও কথা বলতেন। কারণ, তিনি যে এলাকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেখানকার সরকারী ভাষা ছিল গ্রীক। তিনি গ্রীসের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কাছে যেসব পত্র লিখেছিলেন তা অবশ্যই তাদের মাতৃভাষায় লেখা হয়েছিল। এর অর্থ তিনি গ্রীস ও সম্ভবত ইতালিতেও ভাষার কোনো সমস্যা ছাড়াই সফর করেছিলেন। অন্যদিকে বার্নাবাস এ দু'ভাষার কোনোটিই বলতে পারতেন না। জন মার্ক গ্রীক ভাষা জানতেন। তাই, গ্রীসে বার্নাবাসের প্রথম ধর্মপ্রচার সফরে তিনি তার দোভাষী হিসেবে কাজ করেছিলেন। বার্নাবাস যদি সেখানে একা যেতেন, তাহলে তার কথা কেউ বুঝতে বা তিনিও কারো কথা বুঝতে পারতেন না। সুতরাং মার্কের সাথে সফরে যেতে পলের অস্বীকৃতি ছিল বার্নাবাস যাতে তার সাথে ভ্রমণে না যান, সেটা নিশ্চিত করার প্রয়াস। দু'জনের পৃথক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ম্যাকগিফার্ট

(Mc Giffert) তার The History of Christianity in the Apostolic Age গ্রন্থে বলেছেন:

বার্নাবাস, ইয়াহূদী নয় এমন জনসমাজের মধ্যে যার ধর্ম প্রচারের কাজ জেরুজালেমে স্বীকৃতি লাভ করেছিল.... তার ফিরে আসা, নিজকে পৃথক করে নেওয়া ছিল এক আশ্চর্য ঘটনা। সকল প্রকার আইন থেকে খৃষ্টানদের মুক্তিদানের পলের মতবাদের প্রতি বার্নাবাসের পূর্ণ সমর্থন ছিল না..... প্রেরিতদের কার্য-এর এ লেখক, পল ও বার্নাবাসের মধ্যে সম্পর্কছেদের ঘটনাকে মার্ককে নিয়ে মত পার্থক্যের পরিণতি বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রকৃত কারণ নিহিত ছিল আরো গভীরে...... খৃষ্টান হিসেবে পলের জীবন শুরুর পর গোড়ার দিকের বছরগুলোতে পলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ যিনি ছিলেন, তিনি বার্নাবাস। বার্নাবাস জেরুজালেমের চার্চের সদস্য ছিলেন......... তার বন্ধুত্ব পলের জন্য ছিল অনেক বেশি কিছু এবং নিঃসন্দেহে তা খৃষ্টানদের মধ্যে পলের সুনাম ও প্রভাব বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রেখেছিল। খৃষ্টানদের মনে যখন পলের নির্যাতনের স্মৃতি জাগরূক ছিল সেই দিনগুলোতে বার্নাবাস পলের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।[৭]

পলের প্রতি বার্নাবাসের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল পলের সাথে সফরকালে অর্জিত অভিজ্ঞতার কারণে। পল তার মত পরিবর্তন করবেন এবং যীশুর একজন প্রকৃত অনুসারী হবেন বলে বার্নাবাস যে আশা পোষণ করেছিলেন, প্রথম সফরেই তা অপসৃত হয়েছিল। সম্ভবত, শুধুমাত্র ইয়াহূদীদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত ধর্ম প্রচারের চেষ্টার

অসারতা এবং তা যে ফলপ্রসূ হচ্ছে না, তা উপলব্ধি করতে পেরে বার্নাবাস তা ত্যাগ করেন। তবে তার আগে পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে যীশুর ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু সে চেষ্টা চালানোর পর বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, তা সম্ভব ছিল না। সে তুলনায় এন্টিওকে তার সাফল্য ছিল অনেক বেশি। কেননা সেখানে জনসাধারণ যীশুর অনুসারীদের কাছে আগমন করে খৃষ্টধর্মে তাদের ধর্মান্তর করার অনুরোধ জানাচ্ছিল। পক্ষান্তরে তিনি ও পল গ্রীসে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের খৃষ্টান হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছিলেন।

বার্নাবাস সাইপ্রাসে ফিরে আসার পর তার কী ঘটেছিল সে ব্যাপারে কোনো লিখিত বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে জানা যায় যে, নয়া নবীর শিক্ষার অনুসারী অন্য বহু ব্যক্তির মত তিনি একজন শহীদ হিসেবেই ইন্তিকাল করেন। বাইবেলের বহু পৃষ্ঠা থেকে বার্নাবাসকে মুছে ফেলা সত্ত্বেও এটা পরিদৃষ্ট হয় যে, তিনি খৃষ্টধর্মের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবার মতো কেউ নন। চার্চের গোড়ার দিকে তিনি যীশুর কাছ থেকে যা শিখেছিলেন তা প্রকাশ্য সমর্থন ও শিক্ষাদানের জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিলেন এমন এক সময় যখন যীশুর অতি ঘনিষ্ঠ শিষ্যগণও যীশুর সাথে তাদের সম্পর্কের কথা স্বীকার করতে ভীত ছিলেন। যীশুর প্রতি বার্নাবাসের আনুগত্যের বিষয়টি তার শত্রু-মিত্র সকলেই স্বীকার করতেন। যীশু তার বোনের বাড়িতেই জীবনের শেষ আহার গ্রহণ করেন এবং সে বাড়িটি যীশুর অন্তর্ধানের পর তার অনুসারীদের সাক্ষাৎ ও সভাস্থল হিসেবেই ছিল। ধর্ম প্রচারকারী ও যীশুর অন্যান্য অনুসারীদের ওপর বার্নাবাসের প্রভাবের

প্রমাণ খোদ বাইবেলেই রয়েছে। তাকে বলা হত একজন নবী, একজন শিক্ষক এবং লূক তাকে একজন ধর্ম প্রচারকারী হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। পলের প্রতি তার সমর্থন ছিল প্রশ্নাতীত। সর্বোপরি তাঁকে স্মরণ করা হয় এমন এক ব্যক্তি হিসেবে যিনি যীশুর বাণী সম্পর্কে কোনো আপোশ বা পরিবর্তনে রাজি হন নি।

বার্নাবাস সাইপ্রাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পর পল যা শুরু করেছিলেন, তা অব্যাহত রাখেন। তখন তার সাথে এমন অনেক খৃষ্টান ছিলেন যারা দীর্ঘদিন পলকে স্বীকার করে নেননি। পল তার দুর্বল অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এ সময় তাকে যীশুর প্রেরিত ধর্ম প্রচারকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়। অবশ্য তাতে যীশু জীবদ্দশায় তার সাথে তার সাক্ষাৎ না হওয়ার সত্যটির কোনো পরিবর্তন হয় নি। যদিও তিনি যীশুর কাছ থেকে বাণী লাভ করেছেন বলে দাবি করেছিলেন, তা সত্ত্বেও জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচারকালে যীশুর সঙ্গী ছিলেন, এমন একজন ব্যক্তিকে তার সাথে রাখা প্রয়োজন ছিল। কারণ একজন প্রত্যক্ষদর্শী সঙ্গী তার জন্য এক অমূল্য সমর্থন এবং তার যুক্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করত। তিনি পিটারকে তার সাথে যোগ দিতে রাজি করান।

এই দু'ব্যক্তি, যারা অতীতে ছিলেন পরস্পর ঘোর বিরোধী, তারা কি করে, একত্র হলেন তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। যা হোক, পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছিল। অনেকেই পলকে একজন খৃষ্টান হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাকে আর সম্ভাব্য গুপ্তচর বা অত্যাচারী হিসেবে গণ্য

করতেন না। গ্রীক দার্শনিক ও খৃষ্টানদের তীব্র সমালোচক সেলসাস (Celsus) বলেছেন যে, এন্টিওকে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্যের মূল কারণ ছিল পিটারের জনপ্রিয়তায় পলের ঈর্ষা। কিন্তু পরে পলের নিজের খ্যাতি বৃদ্ধি পাওয়ায় পিটারের প্রতি তার ঈর্ষার অবসান ঘটে। তা ছাড়া খৃষ্টানদের প্রতি নিপীড়নও সম্ভবত তাদের দু'জনকে এক করার পিছনে কাজ করেছিল। সে সময় খৃষ্টানদের প্রতি রোমান ও তাদের সমর্থক ইয়াহূদীদের নিপীড়নের মাত্রা ভয়াবহ রকম বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইতিপূর্বে যীশুর কথিত বিচার ও ক্রুশবিদ্ধ করার সময় চাপের মুখে অথবা আশু বিপদের সম্মুখীন হওয়ার কারণে যীশুর সহচর থাকার কথা অস্বীকার করে পিটার তার দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এখন তিনি যীশুর বাণীর কিছুটা রদবদলের ব্যাপারে পলের পদক্ষেপ আগ্রহভরে সমর্থন করলেন। আর তা সম্ভবত এ কারণে যে, এ ধরনের পরিবর্তন নিপীড়নকে হ্রাস করবে।

সেই দিনগুলোতে পরিস্থিতি ছিল এমনই যে, যীশুর বাণীর পরিবর্তন ও তাতে নতুন কিছু সংযোজন করা হলো যাতে তা অ-ইয়াহুদীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, উপরন্তু তা যেন দেশের কর্তৃপক্ষের প্রতি আক্রমণাত্মক বা হুমকি জনক না হয়। বিশ্বজগতের স্রষ্টার বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ হোক বা না হোক, শাসকগণ ও তাদের আইনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে প্রণীত এই নীতির কথা পিটারের প্রথম পত্রে (৩ : ১৩-১৮) বিধৃত রয়েছে।

ঈশ্বরের দোহাই, তোমরা মানুষের আইন মান্য কর: সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী হিসেবে রাজা বা গভর্নর যারই সে আইন হোক না কেন, তোমরা তা মান্য কর যা অন্যায়কারীদের শাস্তিদানের জন্য এবং শাসকদের প্রশংসার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, তাতে রয়েছে কল্যাণ। এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এভাবেই তোমরা মূর্খ ব্যক্তিদের মূর্খতা থেকে মুক্ত হতে পারবে। তোমরা তোমাদের স্বাধীনতাকে বিদ্বেষ পরায়ণতার জন্য ব্যবহার করনা। ঈশ্বরের ভৃত্য তোমরা সকল মানুষকে সম্মান কর। মানুষকে ভালোবাস। ঈশ্বরকে ভয় কর। রাজাকে সম্মান কর। ভৃত্যগণ! অন্তরে ভীতিসহ প্রভূর অনুগত হও, শুধু ভালো ও সৎ লোকদের প্রতিই নয়, অন্যায়কারীদের প্রতিও।

পল পিটারের সাথে পশ্চিমে ভ্রমণ করেছিলেন। আন্তরিকতা ছাড়া ও বার্নাবাসের প্রভাব দমন করে তারা নয়া ধর্মমত এবং আপোসরফা হিসেবে সংযোজনকৃত আচরণ ও ব্যবহার বিধির ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই স্বল্প প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। রোমিয় ১৬ : ২০-২১- এ তিনি বলেছেন:

হ্যাঁ, এভাবেই আমি গসপেল প্রচারের জন্য সংগ্রাম করেছি, যেখানে খৃষ্টের নাম নেই, যাতে আমাকে অন্য কারো ভিত্তির ওপর নির্মাণ করতে না হয়। বরং যেমনটি লিপিবদ্ধ রয়েছে: যাদের কাছে তিনি বাণী প্রচার করেন নি তারা দেখবে এবং তারা যা শোনে নি তা বুঝতে পারবে।

পল যদি যীশুর প্রকৃত শিক্ষা প্রচার করতেন তাহলে অন্য ব্যক্তির ভিত্তি ঠিক তার মতই হত। তারা উভয়ে একই কাঠামো নির্মাণে নিয়োজিত

ছিলেন। যেসব লোক প্রথমবারের মত পলের মুখ থেকে যীশু বা খৃষ্টের কথা জানতে বা শুনতে পারছিল, তাদের পক্ষে যেসব ধর্মপ্রচারকারী তখনও যীশুর শিক্ষা ধারণ করেছিলেন, তার সাথে তুলনা করে দেখা সম্ভব ছিল না। কার্যত তারা যা জানছিল, তা ছিল শুধু পলের শিক্ষা।

পল তার নিজের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে আপ্পোলোস নামক আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আগত এক জ্ঞানী ইয়াহূদীর ব্যাপক সাহায্য লাভ করেন। তিনি জনসাধারণের মধ্যে পলের মতবাদ প্রচারে বিপুল সাফল্য লাভ করেন। বলা হত, পল চারা রোপণ করেছিলেন এবং আপ্পোলোস (Appolos) তাতে পানি সিঞ্চন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এমনকি আপ্পোলোসও পলের সকল ধর্মীয় উদ্ভাবন মেনে নিতে পারেন নি এবং বার্নাবাসের মত তিনিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

পল যীশুর শিক্ষা থেকে ক্রমশই বেশি করে দূরে সরে যেতে থাকেন এবং তিনি স্বপ্নে যার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন বলে দাবি করেন সেই খৃষ্টের প্রতি অধিকতর হারে গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করেন। যীশুর ধর্মের পরিবর্তন সাধনের অভিযোগে যারা তাকে অভিযুক্ত করেন তাদের বিরুদ্ধে তার যুক্তি ছিল এই যে, তিনি যা প্রচার করছেন তার মূল হলো যীশুর কাছ থেকে সরাসরি লাভ করা প্রত্যাদেশ। এটি পলকে ঐশী কর্তৃত্ব প্রদান করেছিল। এই কর্তৃত্বের সুবাদে তিনি দাবি করেন যে, গসপেলের আশীর্বাদ শুধু ইয়াহূদীদের জন্য নয়, বরং যারা এতে বিশ্বাস করবে তাদের সকলের জন্যই। উপরন্তু তিনি একথাও বলেন যে, মূসার ধর্মের চাহিদাসমূহ শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, তা ঈশ্বরের কাছ থেকে তার

কাছে সরাসরি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তার বিরোধীও বটে। তিনি বলেন, আসলে এগুলো অভিশাপ। এভাবে পল যীশুর অনুসারীদের সহ সকল ইয়াহূদীকেই ক্রুদ্ধ করে তুললেন। কারণ তিনি তাদের উভয় 'নবী'রই বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, কেন তিনি শুধু তাদের মধ্যেই তার শিক্ষা প্রচার করছিলেন যারা ইয়াহূদীদের ঘৃণা করত এবং যীশুর সত্য সম্পর্কে অবগত ছিল না।

পল নিম্নোক্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তার মতবাদের যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন:

ভাইসব, তোমরা কি জান না (আমি বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত লোকদের উদ্দেশ্যে বলছি) যে একজন মানুষ যতদিন জীবিত থাকে ততদিনই তার ওপর আইনের নিয়ন্ত্রণ থাকে। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে যার স্বামী আছে সে তার স্বামী জীবিত থাকা পর্যন্ত আইন দ্বারা তার সাথে বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু যদি তার স্বামী মারা যায় তখন মৃত স্বামীর সাথে তার আইনের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। যদি তার স্বামী জীবিত থাকে এবং সে অন্য লোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাকে ব্যভিচারিণী বলে আখ্যায়িত করা হবে। কিন্তু যদি তার স্বামী মারা যায় তাহলে উক্ত আইন থেকে সে মুক্ত। তখন সে অন্য কোনো লোককে বিবাহ করলেও সে আর ব্যভিচারিণী হবে না। সুতরাং হে আমার ভ্রাতৃগণ! খৃষ্টের মৃত্যুর সাথে সাথে তার আইনও তোমাদের ক্ষেত্রে মৃত। তার অর্থ তুমি অন্যকে বিবাহ করতে পার, এমনকি সে ব্যক্তিকেও যিনি মৃত্যু থেকে

পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন যাতে আমরা ঈশ্বরের জন্য ফলপ্রসূ কাজ করতে পারি।

এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পল যীশু ও 'খৃষ্ট' এর মধ্যে একটি পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। তার যুক্তি অনুযায়ী যে আইন যীশু ও তার অনুসারীদের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করেছিল, তিনি মারা যাওয়ার পর তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। তারা আর যীশুর সাথে নয়, খৃষ্ট এর সাথে "বিবাহিত" যিনি অন্য এক আইন এনেছেন। সুতরাং এখন যীশু নয়, খৃষ্টের অনুসরণ প্রয়োজন। যদি কেউ যীশুর শিক্ষা মান্য করে তাহলে সে বিপথে চালিত হচ্ছে। এ যুক্তির সাথে তিনি প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিকারের নিজস্ব ধর্মমতের সংযোজন করে যে মতবাদ প্রণয়ন করেন তা যীশু কখনোই শিক্ষা দেন নি। এটা এক বিরাট সাফল্য এনে দেয় যেহেতু অন্য কথায়- এতে প্রচার করা হচ্ছিল যে, একজন মানুষ তার যা খুশি তাই করতে পারে এবং সে তার কৃতকর্মের জন্য অবশ্যম্ভাবী পরিণতির সম্মুখীন হবে না। যদি সে দিনের শেষে এ কথাটি বলে: "আমি খৃষ্টে বিশ্বাস করি।" যা হোক, যে মূল ভিত্তির ওপর পলের যুক্তি নির্ভরশীল ছিল তা ছিল মিথ্যা। কারণ যীশু ক্রুশবিদ্ধও হন নি কিংবা পুনরুজ্জীবিতও হন নি। পলের প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিকারের মতবাদ ছিল ভ্রান্তিপূর্ণ।

পলের যুক্তি প্রদর্শনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি দেখা গিয়েছিল। এর ফলে শুধু যীশুর শিক্ষারই পরিবর্তন ঘটে নি, উপরন্তু তা যীশু কে ছিলেন সে বিষয়ে জনসাধারণের ধারণারও সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তিনি

লোকের মনে একজন “মানুষ” থেকে একটি ধারণায় পর্যবসিত হন। কিছু লোক যীশুর পৃথিবীতে অবস্থান কালেই তার বাণী ও অলৌকিক কর্মকান্ডে বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে তার ওপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করেন। কেউ কেউ ভুল করে তাকে নবীদের চেয়ে বেশি কিছু বিবেচনা করতেন। তার কোনো কোনো শত্রু গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, তিনি ছিলেন “ঈশ্বরের পুত্র।” এর উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের সাথে তাঁকে সংশ্লিষ্ট করার জন্য গোঁড়া ইয়াহূদীদের তার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা। এভাবে তার অন্তর্ধানের আগেই তার প্রকৃত সত্ত্বার একটি অলৌকিক রূপদান এবং তার ওপর ঈশ্বরত্ব আরোপের একটি প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। খৃষ্টের এই কাল্পনিক রূপ যা যীশুর প্রচারিত শিক্ষাকে হয়তো বাতিল করে দেওয়ার শক্তি রাখত, তা স্পষ্টতই কোনো সাধারণ ব্যাপার ছিল না এবং অনিবার্যরূপে বহু মানুষই ঈশ্বর সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এভাবে এই কাল্পনিক রূপই উপাসনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায় এবং ঈশ্বরের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়।

একজন মানুষ থেকে যীশুর খৃষ্টরূপী ঈশ্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার এ ঘটনা গ্রীস ও রোমের বুদ্ধিজীবীদেরকে পল ও তার অনুসারীদের প্রচারিত ধর্মকে তাদের নিজস্ব দর্শনের সাথে অঙ্গীভূত করতে সক্ষম করে। তারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এখন পলীয় চার্চের ধর্মমতের “পিতা ঈশ্বর” ও “ঈশ্বরের পুত্র” এর সাথে ত্রিত্ববাদের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল শুধু “পবিত্র আত্মা” যোগ করার। কাল পরিক্রমায় এ দু’টি চিত্র একটিতে অঙ্গীভূত হলো এবং ত্রিত্ববাদের জন্ম ঘটল। এ সময় গ্রীসে বিরাজিত দার্শনিক ধারণা তাতে যেমন রং চড়াল, তেমনি

গ্রীকভাষাও এ শিক্ষার প্রকাশকে প্রভাবিত করে এর অর্থকে সীমাবদ্ধ করে দিল। গ্রীক ভাষা গ্রিকদের দর্শনকে ধারণ করতে সক্ষম ছিল, কিন্তু যীশু যা বলেছিলেন তা ধারণের মত বিশালতা বা গভীরতা এ ভাষার ছিল না। তাই যীশুর একজন প্রকৃত অনুসারী যদি স্বচ্ছন্দে গ্রীক ভাষা বলতেও পারতেন, তবুও এ ভাষাতে যীশুর শিক্ষার সার্বিকতা প্রকাশ করতে পারতেন না। এ জন্য তাকে বার বার উপযুক্ত শব্দের সন্ধান করতে হত। যখন হিব্রু গসপেলগুলো গ্রীকে ভাষান্তরের সময় এল, এ সীমাবদ্ধতা তখন স্থায়ী রূপ গ্রহণ করল এবং শেষ পর্যন্ত হিব্রুতে লিখিত সকল গসপেল যখন ধ্বংস হয়ে যায়, তখন তা মোহরাঙ্কিত হয়ে গেল।

যদিও পল প্রকৃত পক্ষে যীশুর ঈশ্বরত্ব বা ত্রিত্ববাদ প্রচার করেন নি, তার প্রকাশ ভঙ্গি এবং তার কৃত পরিবর্তন এ উভয়ই ভ্রান্ত ধারণার জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল এবং ইউরোপে তার ধর্মমত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিল। এটি সেই ধর্মমত যা মেরীকে “ঈশ্বরের মাতা” হিসেবে গণ্য করার মত এক অসম্ভব স্থানে তাকে অধিষ্ঠিত করেছিল।

পল এ কথা বলে তার কর্মকান্ডকে যৌক্তিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যে, যীশু যে সময়ে বাস করতেন এবং তিনি নিজে (পল) যে সময়ের মানুষ- এ দুয়ের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই। সময়ের পরিবর্তন হয়েছে এবং এখন যে পরিস্থিতি বিরাজিত তাতে যীশুর শিক্ষা পুরোনো হয়ে গেছে, তা আর অনুসরণযোগ্য নয়। নৈতিকতার একটি

নতুন ভিত্তি খুঁজে পাওয়ার জন্য তখন এ যুক্তি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। পল তখনকার বিরাজমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেছিলেন এবং তখন প্রয়োজন অনুযায়ীই তিনি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন:

আমার সব কিছুই আইন সম্মত, কিন্তু আমি কারো ক্ষমতার অধীন নই। (১ করিনথীয় ৭ : ১২)

পল শুধু মূসা ও যীশুকে প্রত্যাখ্যানই করেন নি, তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, তার আইন তিনি নিজেই। স্বাভাবিকভাবেই বহু লোকই সে কথা মেনে নেয় নি। পল তাদের জবাব দিয়েছেন এ বলে:

যদি আমার মিথ্যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সত্য ও গরিমা প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে আমি কেন বিচারে পাপী হব? (রোমীয় ৩ : ৭-৮)

পলের এই বক্তব্য থেকে দেখা যায়, যদিও তিনি জানতেন যে, তিনি মিথ্যা বলছেন, পল মনে করতেন তর উদ্দেশ্যের জন্য এটা যৌক্তিক। কিন্তু এটা বুঝা মুশকিল যে মিথ্যার মধ্য দিয়ে সত্য কীভাবে প্রকাশিত হয়। এ যুক্তি অনুযায়ী মানুষ যীশু যদি ঈশ্বরের সমকক্ষ হন তাতে যীশুর অনুসারীদের আপত্তির কি আছে?

পল এমন এক ধর্মের জন্ম দিয়েছেন যা বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী উপাদান দ্বারা পরিবেষ্টিত। তিনি ইয়াহূদীদের একত্ববাদ গ্রহণ করেন এবং তার মধ্যে পৌত্তলিকদের দর্শন যুক্ত করেন। এই অদ্ভুত মিশ্রণের মধ্যে ছিল কিছু যীশুর শিক্ষা এবং কিছু ছিল যা পল খৃষ্টের কাছ থেকে

লাভ করেছিলেন বলে দাবি করেছিলেন। পলের ধর্মতত্ত্বের ভিত্তি ছিল সমকালীন গ্রীক চিন্তাধারার আলোকে ব্যাখ্যাকৃত তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যীশুর ওপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করা হয়েছিল এবং তার পবিত্র মুখে বসিয়ে দেওয়া হয়েছি প্লটোর (Plato) কথা। প্রায়শ্চিত্তের তত্ত্ব ছিল পলের মস্তিস্কপ্রসূত যা যীশু ও তার শিষ্যদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এগুলোর ভিত্তি ছিল 'আদি পাপ' 'ক্রুশবিদ্ধকরণ' ও 'পুনরুজ্জীবন'- এ বিশ্বাস যার কোনোটিরই কোনো বৈধতা ছিল না। এভাবেই একটি কৃত্রিম ধর্মের সৃষ্টি হয়। তার নাম খৃষ্ট ধর্ম যা গাণিতিকভাবে উদ্ভট, ঐতিহাসিকভাবে মিথ্যা, তবুও মনস্তাত্ত্বিকভাবে আকর্ষণীয়। ধর্মীয় উন্মাদনা নিয়ে পল ধর্মের যে জমকালো মন্দির তৈরি করেছিলেন তার সব দিকেই তিনি দরজা নির্মাণ করেছিলেন। এর ফল হয়েছিল এই যে, যারা প্রথমবারের মতো তার খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা ইয়াহূদী বা গ্রীক যাই হোক না কেন, তারা যখন সেই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করল, তাদের এ ধারণাই দেওয়া হলো যে তারা সেই দেবতার প্রতিই শ্রদ্ধা নিবেদন করছে যাকে তারা সব সময় উপাসনা করে আসছে। পলের ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা লাভের পর যারা ভাবত যে, তারা যীশুর অনুসরণ করছে, তারা তাদের অজান্তে যীশুর পরিবর্তে পলের ধর্মমতের অনুসারীতে পরিণত হলো।

হেইনজ জাহরনট (Heinz Zahrnt) পলকে "যীশুর গসপেলের বিকৃতকারী"[৮] বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। ওয়ারডি (Werde) তাকে বর্ণনা করেছেন "খৃষ্টান ধর্মের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা" হিসেবে। উভয় বক্তব্যেরই কিছু যৌক্তিকতা আছে। ওয়ারডি বলেন, পলের কারণে:

ঐতিহাসিক যীশু ও চার্চে খৃষ্টের মধ্যে অসামঞ্জস্য এত বেশি প্রকট যে, তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য খুঁজে পাওয়া একেবারেই কঠিন[৯]

শনফিল্ড (Schonfield) লিখেছেন:

গোঁড়ামির (Orthodoxy) পলীয় ধর্মমত খৃষ্টান ধর্মের ভিত্তিরূপে গণ্য হয় এবং বৈধ চার্চ ধর্মবিরোধী বলে পরিত্যক্ত হয়।[১০]

এভাবে বার্নাবাস পরিগণিত হন প্রধান ধর্ম বিরোধীরূপে।

যীশুর অনুসারীদের কাছে সত্যের পথ জ্যামিতির সরল রেখার মত- দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু কোনো বিস্তার নেই। তারা যীশুর শিক্ষার কোনো পরিবর্তন করতে রাজি হন নি, কারণ এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল সুবিধা লাভ। তাদের কাছে যীশুর শিক্ষাই ছিল সত্য এবং পরিপূর্ণ সত্য। বার্নাবাস ও তার অনুসারীরা যীশুর কাছ থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তার প্রচার ও অনুসরণ অব্যাহত রেখেছিলেন। তারা সর্বদাই এবং এখন পর্যন্ত একটি শক্তি হিসেবেই গণ্য। তাদের মধ্য থেকেই “সন্ত” (Saint) ও পণ্ডিতদের আবির্ভাব ঘটেছিল। তারা খৃষ্টানদের প্রতিটি সম্প্রদায়ের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

যীশুর অনুসারীগণ ও বার্নাবাস কখনোই একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে তোলেননি যদিও নেতাদের সত্যনিষ্ঠার কারণে অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল দ্রুত। এসকল নেতা ছিলেন প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানী যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন ও তার ভয়ে ভীত ছিলেন। তারা মরুভূমি ও পর্বতে গমন করেছিলেন। প্রতিটি সন্তকে ঘিরে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গড়ে

উঠেছিল। তারা সকলেই ছিলেন একে অপর থেকে পৃথক। এর কারণ ছিল তাদের বাসস্থানের চারপাশের দুর্গম অঞ্চল। সংগঠন কাঠামোর অনুপস্থিতি ছিল তাদের শক্তির একটি উৎস, করণ এর ফলে নিপীড়নকারীদের পক্ষে তাদের আটক করা সম্ভব ছিল না। পলের খৃষ্টধর্ম গ্রীস হয়ে ইউরোপে প্রসারিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে এ ঈশ্বরপ্রেমীরা তাদের জ্ঞানের শক্তিতে দক্ষিণে, চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তর আফ্রিকা বরাবর বিস্তার লাভ করেছিলেন। তাদের প্রতিষ্ঠিত যুবসমাজ যীশুর অনুসারী ছিল। যারা তখনও যীশুর শিক্ষা ধারণ করেছিলেন তারা তাদের জ্ঞানের অধিকাংশই সরাসরি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে চড়িয়ে দিয়েছিলেন। আচার- ব্যবহার অনুকরণ করা হত এবং ধর্মশিক্ষা দেওয়া হত মৌখিকভাবে। তারা ঈশ্বরের একত্ব প্রচার অব্যাহত রেখেছিলেন। যীশুর অন্তর্ধানের পর প্রথম দিকের শতকগুলোতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যেমন. এবোনাইটস (Ebonites), সেরিনথিয়ানস (Cerinthians), ব্যাসিলিডিয়ানস (Basilidians), যারা ঈশ্বরকে পিতা হিসেবে উপাসনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তারা ঈশ্বরকে বিশ্বজগতের সর্বশক্তিমান শাসক, সমকক্ষহীন সর্বোচ্চ সত্ত্বা হিসেবেই উপাসনা করত।

বর্তমানে যীশুর জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে বহু ধরনের লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। যীশু যে ভাষায় কথা বলেছিলেন, তা ছিল আরবীর এক কথ্য রূপ- এরামিক। এ ভাষা সাধারণভাবে লিখিত হতো না। প্রথম গসপেল লিখিত হয় হিব্রুতে। সেই গোড়ার দিকের দিনগুলোতে কিছুই আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত বা বর্জিত হয় নি। প্রতিটি খৃষ্টান তার

সম্প্রদায়ের নেতার ওপর নির্ভর করত যে, তিনি কোনো গ্রন্থ ব্যবহার করবেন। যার কাছ থেকে তারা শিক্ষা লাভ করবে তার ওপর নির্ভর করে প্রতিটি সম্প্রদায় একটি পৃথক সূত্রের কাছে গমন করত। যারা বার্নাবাসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন তারা এক সূত্রের কাছে যেতেন, আবার যারা পলের অনুসারী ছিলেন তারা যেতেন অন্যের কাছে।

এভাবে পৃথিবী থেকে যীশুর অন্তর্ধানের পর পরই যীশুর অনুসারী ও পলীয় চার্চের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপকতর ব্যবধান সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, পলীয় চার্চ পরে রোমান ক্যাথলিক চার্চ নামে আখ্যায়িত হয়। এ পার্থক্য শুধু যে জীবনাচারণ ও ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই বিরাজিত ছিল তা নয়, ভৌগোলিকভাবেও এই পার্থক্য সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। পলীয় চার্চ যত বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করে তা যীশুর অনুসারীদের প্রতি তত বেশি বৈরী হয়ে ওঠে। পলের অনুসারীরা রোমান শাসকদের সাথে ক্রমশ অধিক হারে নিজেদের সম্পৃক্ত করে ফেলার প্রেক্ষিতে খৃষ্টান নামের পরিচয় দানকারীরা যে, নিপীড়নের শিকার হয়েছিল পরবর্তীতে একত্ববাদের সমর্থকরা সেই নিপীড়নের প্রধান শিকারে পরিণত হয়। একত্ববাদীদের ধর্ম বিশ্বাস পরিবর্তনের এবং ধর্মগ্রন্থ ধ্বংসসহ তাদের নির্মূল করারও চেষ্টা চলে। সে কারণে আদি শহীদদের অধিকাংশই ছিলেন একত্ববাদী। ত্রিত্ববাদের যত বেশি প্রসার ঘটতে থাকে তার অনুসারীরা তত বেশি একেশ্বরবাদ সমর্থকদের বিরোধী হয়ে উঠে। এ সময় সম্রাট জুলিয়ান (Julian) ক্ষমতাসীন হন। তার আমলে খৃষ্টানদের অন্তর্বিরোধ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে তিনি বলতে বাধ্য হন: “খৃষ্টান সম্প্রদায়গুলো

সাধারণভাবে পরস্পরের যতটা বৈরী কোনো বন্য পশুও মানুষের প্রতি ততটা বৈরী নয়।”

স্বাভাবিকভাবেই, যীশুর শিক্ষা থেকে যারা সরে এসেছিল তারা বাইবেলের পরিবর্তন ঘটাতেও প্রস্তুত ছিল, এমনকি তাদের মতের সমর্থনে মিথ্যা বক্তব্য সংযোজন করতেও তারা পিছপা ছিল না। টোলান্ড (Toland) তার (The Nazarenes) গ্রন্থে আদি একেশ্বরবাদী শহীদদের অন্যতম ইরানিয়াসের (Iranius) এর এতদবিষয়ক ভাষা উদ্ধৃত করেছেন :

“সরল মানুষ ও সত্য ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের বিভ্রান্ত করতে তারা অন্যায়ভাবে তাদের ওপর নিজেদের রচিত মিথ্যা ও জাল ধর্মগ্রন্থের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।”

টোলান্ড আলো বলেন, “আমরা ইতোমধ্যেই জানি যে, খৃষ্টান চার্চের প্রাথমিক পর্যায়ে কী পরিমাণ প্রতারণা ঘটেছিল ও ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছিল। খৃষ্টান চার্চগুলোই সকল জাল ও ভুয়া ধর্মগ্রন্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহী ভূমিকা পালন করে।...... যখন যাজকরাই ছিল ধর্মগ্রন্থের একমাত্র প্রতিলিপি রচনাকারী এবং ভালো বা মন্দ সকল ধর্মগ্রন্থের একমাত্র হিফাযতকারী, সে সময়েই ব্যাপক মাত্রায় এ অপকর্ম সংঘটিত হয়। কিন্তু পরে সময়ের পালা বদলে খৃষ্টধর্মের সূচনা ও প্রকৃত রূপ উদ্ধার করা, কল্পকাহিনী থেকে ইতিহাসকে অথবা ভ্রান্তি থেকে সত্যকে চিহ্নিত করা প্রায় সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।....

প্রেরিতদের অব্যবহিত উত্তরসূরিরা কি করে তাদের গুরুদের প্রকৃত শিক্ষাকে তাদের ওপর আরোপিত মিথ্যা শিক্ষাগুলোর সাথে তালগোল পাকিয়ে ফেললেন? অথবা তারা যদি এগুলো সম্পর্কে অন্ধকারেই থাকবেন তাহলে সেগুলো এত তাড়াতাড়ি কি করে তাদের অনুসরণের মধ্য দিয়ে অধিক গুরুত্ব লাভ করল? দেখা যায়, এ ধরনের মিথ্যা ও জাল ধর্মগ্রন্থগুলো গির্জার পুরোহিতদের 'ক্যাননিকাল' (Canonical) গ্রন্থসমূহের সাথে প্রায়ই সমমর্যাদায় স্থাপন করা হত এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবকটি গ্রন্থেই উদ্ধৃত হত ঐশী ধর্মগ্রন্থ হিসেবে অথবা কোনো কোনো সময় যেমনটি আমরা দেখি, তারা সেগুলোকে ঐশী হিসেবে অস্বীকার করত। প্রশ্ন করা যায়, কেন ক্লিমেন্ট অব আলেকজান্ডার, ওরিজেন, টারটালিয়ান ও এ ধরনের বাকি লেখকগণ কর্তৃক খাঁটি গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত সকল গ্রন্থই সমভাবে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হবে না? এবং যেসব যাজক বা পুরোহিত, যারা শুধু একে অন্যের বিরোধিতাই নয়, উপরোক্ত একই ঘটনা সম্পর্কে তাদের বর্ণনার মধ্যে প্রায়ই স্ববিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়, তাদের সাক্ষ্যের ব্যাপারেই বা কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া যাবে?

টোলান্ড বলেন যে, এ সব 'ভণ্ড পুরোহিত ও জালিয়াতি' সম্পর্কে যখন প্রশ্ন তোলা হয় তখন তারা যুক্তি খণ্ডন করার চেয়ে প্রশ্ন উত্থাপনকারীকে ধর্মবিরোধী ও আত্মগোপনকারী নাস্তিক বলে আখ্যায়িত কতে শুরু করে। তিনি বলেন, তাদের এ আচরণ তাদের প্রতি সকলের কাছে প্রতারক ও জালিয়াত হিসেবে সন্দেহ সৃষ্টি করে, কারণ মানুষ

স্বাভাবিকভাবেই তার দুর্বল স্থানে আঘাত লাগলে চিকিৎসা করবে।.......
যার কাছে প্রশ্নের জবাব আছে সে ক্রুদ্ধ হবে না। ..........

অবশেষে টোলান্ডের প্রশ্ন:

সকল চার্চ ঐতিহাসিক সর্বসম্মতভাবে নাজারিনি (Nazarenes) অথবা এবিওনাইটসদের (Ebionites) খৃষ্টধর্ম গ্রহণকারী হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন, অথবা সেই ইয়াহূদীরা যারা তার নিজের লোক হিসেবে খৃষ্টের ওপর বিশ্বাস সহ তার জীবিত থাকা ও অন্তর্ধানের কথা বিশ্বাস করতেন, তারাই তার কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং তারা সবাই তার ধর্মের প্রচারকারী ছিলেন। এ সব বিষয় বিবেচনা করে আমার বক্তব্য যে তাদের পক্ষে কি করে (যাদের সবাইকে প্রথম ধর্মদ্রোহী বলে আখ্যায়িত ও অনেককেই দন্ডিত করা হয়েছিল) যীশুর ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা বা তা নিয়ে চক্রান্ত করা সম্ভব? এ কাজটি সেসব গ্রীকদের পক্ষে কীভাবে সম্ভব যারা যীশুর অন্তর্ধানের পর প্রচারকারীদের মধ্যমেই তার অনুসারী হয়েছিল এবং তার প্রকৃত সত্য সম্পর্কে কখনোই অবহিত ছিল না অথবা ঈশ্বর বিশ্বাসী ইয়াহূদীগণ ছাড়া যখন তাদের কোনো তথ্য জানার কোনো উপায়ই ছিল না?[১১]

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## খৃষ্টধর্মের আদি একত্ববাদীগণ

খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের (প্রেরিতদের, যীশু ও বার্নাবাসের অনুসারীরা এ নামে পরিচিত ছিলেন) মধ্য থেকে বেশ কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ও সন্তের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাদের ধর্মভক্তি ও জ্ঞানের জন্য তারা এমনকি আজও বরিত ও সমাদৃত। তাদের ধর্মগ্রন্থ-গুলোর ভাষ্য ঐতিহাসিক এবং তাতে বর্তমান গোঁড়া ক্যাথলিক চার্চ এর প্রচলিত বাইবেলের মত মূল ভাষ্যে রূপক আকারে কোনো অর্থ লুকিয়ে রাখা হয় নি, বরং প্রেরিত নবীর ব্যক্ত বাণীর সরল অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। বাইবেলের কিছু অংশকে অন্যান্য অংশের চাইতে বেশি গুরুত্ব প্রদানের বিরুদ্ধেও তারা সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। তারা ঈশ্বরের একত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং ত্রিত্ববাদের সামান্যতম সমর্থন করে, এমন মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তারা ঐতিহাসিক যীশুর ওপরই জোর দিয়েছিলেন এবং তার সম্পর্কে কথা বলার সময় 'পুত্র' শব্দটি পরিহার করেছিলেন। যীশু যেভাবে জীবন যাপন করতেন এবং যেমন আচরণ করতেন তারা ঠিক তারই অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। তাদের অনেকেই উত্তর আফ্রিকায় বসবাস করতেন। যীশুর এসব অনুসারীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন সম্পর্কে নীচে উল্লেখ করা হলো:

### ইরানিয়াস (Iranaeus) ১৩০-২০০ খৃ.)

ইরানিয়াসের জন্মকালে যীশুর প্রকৃত অনুসারী ধর্ম প্রচারকদের প্রচারিত খৃষ্টধর্ম উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন এবং দক্ষিণ ফ্রান্স পর্যন্ত প্রসার লাভ করেছিল। লিয়ঁ (Lyons)-এর বিশপ পথিনাসের (Pothinus) পক্ষ থেকে রোমে পোপ এলুথেরামের কাছে প্রেরিত এক দরখাস্ত প্রসঙ্গে ইরানিয়াস সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এ দরখাস্তে পলীয় চার্চের ধর্মমতের সাথে একমত নয় এমন খৃষ্টানদের ওপর নিপীড়ন বন্ধের জন্য পোপের কাছে আবেদন জানানো হয়। ইরানিয়াসই এ দরখাস্ত বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি রোমে থাকা অবস্থায়ই শুনতে পান যে সকল ভিন্ন মতাবলম্বী খৃষ্টানসহ বিশপ পথিনাসকে হত্যা করা হয়েছে। রোম থেকে ফেরার পর তিনি লিয়ঁর বিশপ হিসেবে পথিনাসের স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯০ খৃস্টাব্দে ইরানিয়াস নিজেই শুধুমাত্র ধর্মীয় ভিন্নমতের কারণে খৃষ্টানদের গণহত্যা বন্ধ করার জন্য পোপ ভিক্টরকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন। কিন্তু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং তিনি নিজেই ২০০ খৃস্টাব্দে নিহত হন। এভাবে খৃষ্টধর্মের জন্য ইরানিয়াসের জীবন উৎসর্গিত হয়।

ইরানিয়াস এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন এবং যীশুর মানবিকতার মতের সমর্থক ছিলেন। তিনি খৃষ্টধর্মে পৌত্তলিক ধর্ম পটোনীয় দর্শন প্রবিষ্ট করার জন্য পলকে দায়ী করে তার তীব্র সমালোচনা করেন। ইরানিয়াস তার লেখায় বার্নাবাসরে গসপেলের ব্যাপক উদ্ধৃতি দিতেন। তার লেখা পড়েই ফ্রা মারিনো উক্ত গসপেলের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং

তার পরিণতিতেই তিনি পোপের লাইব্রেরিতে বার্নাবাসের গসপেলের ইতালীয় পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন।

### টারটালিয়ান (Tertullian) (১৬০-২২০খৃ.)

টারটালিয়ান আফ্রিকান চার্চের অনুসারী ছিলেন। তিনি ছিলেন কার্থেজের অধিবাসী। তিনি ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ইয়াহূদী মেসিয়াহকে যীশু হিসাবে চিহ্নিত করেন। আনুশাসনিক অনুতাপ প্রকাশের পর গর্হিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় বলে পোপ ক্যালিসটাস যে বিধান জারি করেন, তিনি তার বিরোধিতা করেন। তিনি ঈশ্বরের একত্বের ওপর জোর দেন।

টারটালিয়ান লিখেছিলেন: “সাধারণ মানুষ যীশুকে একজন মানুষ হিসেবেইভাবে।” তিনিই প্রথম ল্যাটিন ভাষায় গীর্জা সম্পর্কিত রচনায় ত্রিত্ববাদের নতুন অদ্ভুত ধর্মমত আলোচনা করতে গিয়ে ‘ত্রিত্ববাদ’ শব্দটি ব্যবহার করেন। অনুপ্রাণিত ধর্মগ্রন্থগুলোতে এক সময় এ শব্দটি ব্যবহারই করা হয় নি।

### অরিজেন (Origen) (১৮৫-২৪৫ খৃ.)

অরিজেন জন্মসূত্রে মিশরীয় ছিলেন। সম্ভবত তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা থিওনিডাস একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ক্লিমেন্টকে এর প্রধান নিয়োগ করেন। অরিজেন এখানেই শিক্ষা লাভ করেন। লিওনিডাস খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের প্রচারিত ধর্মের অনুসারী ছিলেন। পলীয় চার্চ তার ধর্ম বিশ্বাস অনুমোদন

করে নি। কারণ, তিনি পলের ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও নতুন সংযোজন মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। ২০৮ খৃস্টাব্দে লিওনিডাসকে হত্যা করা হয়। অরিজেন এই মর্মন্তুদ ঘটনায় এতটা বিচলিত হন যে, তিনি খৃষ্টধর্মের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে তথা শহীদ হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার মায়ের বাধার কারণে তা সম্ভব হয় নি।

নিজের জীবন বিপন্ন দেখে অরিজেনের শিক্ষক ক্লিমেন্ট আলেকজান্দ্রিয়া থেকে পলায়ন করেন। পিতা নিহত, শিক্ষক পলাতক। সেই শঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে অরিজেন নিজেও বিপদাপন্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু পিতার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের নয়া প্রধান হিসেবে তিনি শীঘ্রই জ্ঞান ও অধ্যবসায়ের কারণে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। তার ঈশ্বরভক্তি ও অতিরিক্ত ধর্মপ্রীতি তার জন্য দুর্ভোগের কারণ হয়। মথির ১৯ : ১২ শ্লোকে বলা হয়েছে:

কিছু নপুংসক মানুষ আছে যারা মাতৃ গর্ভ থেকে নপুংসক শিশুর মতই জন্ম নেয় এবং কিছু মানুষ আছে যাদের নপুংসক করা হয় এবং এমন কিছু মানুষ আছে যারা পরলৌকিক সুফল লাভের জন্য নিজেদেরকে নপুংসক করে নেয়। যে তা করতে সক্ষম, তাকে তা করতে দাও।

২৩০ খৃস্টাব্দে অরিজেন ফিলিস্তিনে পাদ্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু বিশপ ডেমারিয়াস (Demerius) তাকে উৎখাত করেন এবং নির্বাসনে পাঠান। ২৩১ খৃস্টাব্দে তিনি কায়সারিয়ায় আশ্রয় লাভ করেন। পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণে তিনি কায়সারিয়ায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিদ্যালয়টিও অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করে। চতুর্দশ শতাব্দীতে গ্রীক বাইবেল

প্রথম ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন সাধু জেরোম (Jerome)। তিনি অরিজেনের প্রতি শুরুতে সমর্থন জানান। কিন্তু পরে তিনি ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং অরিজেনের শত্রুতে পরিণত হন। অরিজেন যাতে চার্চ কর্তৃক দন্ডিত হন, সে জন্য জেরোম চেষ্টা চালান। কিন্তু অরিজেনের জনপ্রিয়তার কারণে বিশপ জন (Bishop John) তা করার সাহস পান নি। প্রকৃতপক্ষে অরিজেন নিজেই দেশত্যাগী হন। যা হোক, শেষ পর্যন্ত ২৫০ খৃস্টাব্দে জেরোম সফল হন। আলেকজান্দ্রিয়ার কাউন্সিল অরিজেনকে দন্ডিত করে। তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। দীর্ঘকাল নির্যাতনের ফলে অবশেষে ২৫৪ খৃস্টাব্দে কারাগারেই অরিজেন মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার কারাদন্ডের কারণ ছিল তিনি ত্রিত্ববাদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং একত্ববাদ প্রচার করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ, যীশু তার সমকক্ষ ছিলেন না, বরং তার বান্দা ছিলেন।

অরিজেন প্রায় ৬শ' গবেষণামূলক গ্রন্থ ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁকে চার্চের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় (Appealing) চরিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যৌবনের প্রথম থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন অকুতোভয়। তিনি ছিলেন বিবেকজ্ঞান সম্পন্ন, ও সহিষ্ণু এবং একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সকল গুণাবলি তার ছিল। যারা তার কাছে শিক্ষা লাভ করেছিল তারা তাঁকে ভালোবাসত। তার পার্থক্য নিরূপণ ক্ষমতা ও সৃজনশীল শক্তি ও বিপুল জ্ঞান খৃষ্টান সমাজে ছিল তুলনাহীন।

**ডায়োডোরাস (Diodorus)**

ডায়োডোরাস ছিলেন টারসসের একজন বিশপ। যীশুর আসল শিক্ষার অনুসারী খৃষ্টানদের মধ্যে তাঁকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে গণ্য করা হত।

ডায়োডোরাস মত পোষণ করতেন যে বিশ্ব পরিবর্তনশীল। কিন্তু এ পরিবর্তন স্বয়ং একটি শুরুর শর্ত হিসেবে কাজ করে যার পিছনে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন ধারা। উপরন্তু জীবনের বৈচিত্র্য এবং পরিবর্তনের এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় যে প্রজ্ঞা পরিলক্ষিত হয় তা মূলের ঐক্য নির্দেশ করে এবং একজন স্রষ্টা ও দূরদর্শীর উপস্থিতির প্রমাণ দেয়। এ ধরনের স্রষ্টা শুধু একজনই হতে পারেন।

ডায়োডোরাস মানবিক প্রাণ ও রক্ত- মাংসের শরীর সম্পন্ন যীশুকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ বলেই গণ্য করতেন।

## লুসিয়ান (Lucian)

একজন জ্ঞানী হিসেবে লুসিয়ানের যতটা খ্যাতি ছিল ঠিক ততটাই খ্যাতি ছিল তার ঈশ্বর- ভীরুতার জন্য। তিনি হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ২২০ খৃস্টাব্দ থেকে ২৯০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি চার্চ সম্প্রদায়ের বাইরে অবস্থান করেন। তার পবিত্রতা ও গভীর পান্ডিত্য বিপুল সংখ্যক লোককে আকৃষ্ট করে। তার বিদ্যালয়টি শিগগিরই পরবর্তী কালে 'আরিয়ান' নামে পরিচিত মতবাদের লালন কেন্দ্র হয়ে ওঠে। আরিয়াস ছিলেন তার একজন ছাত্র।

লুসিয়ান ধর্মগ্রন্থের ব্যাকরণিক ও আক্ষরিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ধর্মগ্রন্থের প্রতীকী ও রূপক অর্থ সন্ধানের প্রবণতার বিরোধিতা করেন। তিনি ধর্ম গ্রন্থের গবেষণামূলক ও সমালোচনামূলক পদ্ধতি সমর্থন করতেন। এই পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, এ সময় লোকে ক্রমশই অধিকতর মাত্রায় ধর্মগ্রন্থের ওপর আস্থাশীল হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে যীশুর শিক্ষার মৌখিক ভাষ্যের ওপর ক্রমশই তাদের আস্থা হ্রাস পাচ্ছিল। তা ছাড়া যীশুর শিক্ষা সামগ্রিকভাবে যে কত দ্রুত বিলুপ্ত হয় এ থেকে তারও আভাস মেলে।

লুসিয়ান একজন বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ওল্ড টেস্টামেন্টের গ্রীক অনুবাদটি সংশোধন করেছিলেন। গসপেলসমূহ গ্রীক ভাষায় অনুদিত হওয়ার পর সেগুলোতে যেসব পরিবর্তন ঘটানো হয় তিনি তার অনেকটাই নির্মূল করেন এবং ৪টি গসপেল প্রকাশ করেন। তার মতে সেগুলোই ছিল সত্য গসপেল। এখন পলীয় চার্চ কর্তৃক গৃহীত যে ৪টি গসপেল রয়েছে সেগুলো লুসিয়ানের গসপেলের অনুরূপ নয়।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যীশু ঈশ্বরের সমকক্ষ নন এবং তিনি ছিলেন ঈশ্বরের অধীনস্থ বান্দা। এ বিশ্বাসের কারণে তিনি পলীয় চার্চের শত্রুতে পরিণত হন। ব্যাপক নির্যাতনের পর ৩১২ খৃস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়।

**আরিয়াস (Arius) (২৫০-৩৩৬ খৃ.)**

আরিয়াসের জীবনের সাথে সম্রাট কনস্টানটাইনের জীবন এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত যে একজনকে না জেনে অন্যকে জানা সম্ভব

নয়। রোমক চার্চের অনুসারী সম্রাট কনস্টানটাইন খৃষ্টান চার্চের সংস্পর্শে কিভাবে এলেন সে কাহিনি উল্লেখ করা যেতে পারে।

কনস্টানটাইন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ক্রিসপাসের (Crispus) প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তরুণ রাজকুমার সুন্দর ব্যবহার, চমৎকার আচরণ এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাহসিকতার জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সম্রাট তার নিজের অবস্থান যাতে বিপন্ন না হয় সে জন্য ক্রিসপাসকে হত্যা করেন। ক্রিসপাসের মৃত্যুতে সমগ্র সাম্রাজ্যে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। জানা যায় যে, ক্রিপাসের সৎ মাতা নিজের পুত্রের সিংহাসনে আরোহণের পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। সে কারণে ক্রিসপাসকে হত্যা করা তার অভিপ্রায় ছিল। কনস্টানটাইন এ কারণে এ হত্যার জন্য তাঁকে দায়ী করেন এবং গরম পানি ভর্তি চৌবাচ্চার মধ্যে নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করেন। এভাবে তিনি এক হত্যা দ্বারা আরেকটি হত্যার দায় অপনোদন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর ফল তিনি যা ভেবেছিলেন তার বিপরীত হয়। নিহত রাণীর সমর্থকরা তার মৃত পুত্রের সমর্থকদের সাথে মিলিত হয় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠে। কনস্টানটাইন উপায়ন্তর না দেখে রোমের জুপিটারের মন্দিরের পুরোহিতদের শরণাপন্ন হন। কিন্তু তারা বলেন যে, এমন কোনো উৎসর্গ বা প্রার্থনা নেই যা তাকে এ দু'টি হত্যার দায় থেকে মুক্ত করতে পারে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, কনস্টানটাইন রোমে অবস্থানে স্বস্তি বোধ না করায় বাইজানটিয়াম চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বাইজানটিয়ামে পৌঁছে তিনি তার নামে শহরটির নামকরণ করেন। তখন থেকে শহরটির নাম হয় কনস্টান্টিনোপল (Constantinople)। এখানে তিনি পলীয় চার্চের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সমর্থন লাভ করেন। তারা তাকে জানায় যে, তিনি যদি তাদের চার্চে প্রায়শ্চিত্ত করেন তবে তার পাপ মুক্তি ঘটবে। কনস্টানটাইন এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। শুধু দু'টি হত্যার রক্তে কনস্টানটাইনের হাত যে রঞ্জিত ছিল তাই নয়, সাম্রাজ্য শাসনের বিভিন্ন সমস্যায়ও তিনি হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। এভাবে অপরাধ স্বীকারের মাধ্যমে বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি লাভ করে এবং দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেয়ে তিনি সাম্রাজ্যের দিকে মনোনিবেশ করলেন। তিনি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চার্চকে ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখলেন এভাবে যে, তিনি যদি চার্চের আনুগত্য লাভ করেন তাহলে তিনিও চার্চকে পূর্ণ সমর্থন দেবেন। তার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সমর্থন লাভ করে চার্চ রাতারাতি শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। কনস্টানটাইন এর পূর্ণব্যবহার করেন। ভূমধ্যসাগরের চারপাশের দেশগুলোতে অসংখ্য খৃষ্টান চার্চ ছিল। সম্রাট কনস্টানটাইন যে লড়াই করছিলেন সে লড়াইয়ে চার্চগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে বিপুল সুবিধা লাভ করেন। বহু পুরোহিতই তার গোয়েন্দা বৃত্তির কাজে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিলেন। ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যকে তার অধীনে একত্রিত করার প্রচেষ্টায় এ সাহায্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অংশত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য এবং অংশত জুপিটারের মন্দিরের যে রোমান পুরোহিতরা তাঁকে সমর্থন দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত করার জন্য তিনি রোমে একটি চার্চ প্রতিষ্ঠার জন্য খৃষ্টানদের

উৎসাহিত করেন। যা হোক, কনস্টানটাইন নিজে খৃষ্টান হলেন না, কারণ তার বহু সহযোগীই জুপিটার এবং রোমের দেবতার মন্দিরের অন্যান্য দেবতাদের বিশ্বাস করতেন। তাদের মনে যাতে কোনো সন্দেহের উদ্রেক না হয় সে জন্য তিনি বহুসংখ্যক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি রোমান দেবতাদেরই উপাসনা করতেন। যখন পলীয় চার্চ ও যীশুর প্রকৃত অনুসারী খৃষ্টানদের চার্চের মধ্যে পুরোনো বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তখনও সব কিছু ভালোভাবেই চলছিল বলে অনুমিত হয়।

এ সময় যীশু অনুসারী চার্চের নেতা ছিলেন একজন যাজক যিনি ইতিহাসে আরিয়াস নামে পরিচিত। তিনি জন্মগত সূত্রে ছিলেন লিবিয়ার অধিবাসী। যীশু অনুসারী চার্চকে তিনি এক নয়া শক্তি দান করেছিলেন। তিনি যীশুর শিক্ষার দ্ব্যর্থহীন অনুসারী ছিলেন এবং পলের প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। আরিয়াসের কথা ছিল, যীশু যে ধর্ম প্রচার করছেন সেটাই অনুসরণ করতে হবে- অন্যকিছু নয়। এখন পর্যন্ত একেশ্বরবাদের সমর্থক হিসেবে তার নাম স্মরণ করা হয়ে থাকে। এ থেকে তার ভূমিকা ও আবেদনের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

পলীয় চার্চ আরিয়াসের কাছ থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিল। তার শত্রুদের মত তিনি কোনো কুচক্রী ব্যক্তি ছিলেন না। তাই সাধারণ মানুষের মত তারাও তাকে বিশ্বস্ত ও নির্দোষ যাজক হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। যে সময় মুখে মুখে ধর্মপ্রচারের প্রথা দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করেছিল (যে যীশুর শিক্ষাকে জীবন্ত রেখেছিল) এবং যখন লিখিত

ধর্মগ্রন্থের প্রতিও বিশ্বাস হ্রাস পেতে শুরু করেছিল তখন আরিয়াস তার প্রাণশক্তি ও জ্ঞান দিয়ে উভয়েরই পুনরুজ্জীবন ও নবায়ন সাধন করেছিলেন। পলীয় চার্চ ও সম্রাট কনস্টানটাইনের মধ্যে গড়ে ওঠা আঁতাত থেকে তিনি দূরে সরে ছিলেন।

আরিয়াস পলীয় চার্চের কট্টর সমালোচক, ধর্মের জন্য জীবনোৎসর্গকারী, পান্ডিত্যের জন্য সুখ্যাত এন্টিওকের লুসিয়ানের (Lucian) শিষ্য ছিলেন। লুসিয়ান তার পূর্বসূরির মতই পলীয় চার্চের ধর্মমত অনুসরণ না করার কারণে নিহত হন। এই চার্চের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এমন ধর্ম বিশ্বাস লালন করার বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে আরিয়াস সচেতন ছিলেন। তার প্রথম জীবন রহস্যের আড়ালে আবৃত থাকলেও জানা যায় যে, ৩১৮ খৃস্টাব্দে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার বকালিস (Baucalis) চার্চের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নগরীর চার্চগুলোর মধ্যে এটি ছিল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চার্চ।

প্রাপ্ত অপর্যাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, আরিয়াস ছিলেন দীর্ঘ ও কৃশকায়। তিনি হয়তো সুদর্শন ছিলেন, কিন্তু অতিশয় কৃশকায় হওয়ার কারণে তার মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত ফ্যাকাশে, অন্যদিকে দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার জন্য তার দৃষ্টি থাকত আনত। তার পোশাক ও ব্যবহার ছিল একজন নিষ্ঠাবান তাপসের। তিনি একটি খাটো হাতা দীর্ঘ কোট পরিধান করতেন। তার মাথার চুল ছিল জট পাকানো। সাধারণত তিনি নীরব থাকলেও কোনো কোনো উপলক্ষে প্রচণ্ড উত্তেজিত স্বরে কথা বলতেন। তার কণ্ঠস্বরে একটি মাধুর্য ছিল। তার নিকট সান্নিধ্যে যারা আসত তারা

তার আন্তরিকতা ও ব্যবহারে মুগ্ধ হত। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যাজক হিসাবে সকলের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন:

তাঁর খ্যাতি শিগগিরই আলেকজান্দ্রিয়ার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। একজন নিষ্ঠাবান কর্মী এবং কঠোর তাপস জীবন তাঁকে এ খ্যাতি এনে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন ক্ষমতাশালী ধর্ম- প্রচারক যিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে খোলাখুলি ধর্মের মহান নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। তার ছিল অপূর্ব বাগ্মিতা ও চমৎকার ব্যক্তিত্ব। তিনি যে বিষয়ে আগ্রহ বোধ করতেন তা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করতে সক্ষম ছিলেন। বিশ্বের অন্যান্য মহান ধর্মীয় নেতাদের মত তিনিও ছিলেন গোঁড়া ধর্মনিষ্ঠ এবং তিনি যে ধর্মমত প্রচার করতেন তা ছিল বলিষ্ঠ ও ফলপ্রসূ।[১]

জানা যায় যে, আলেকজান্দ্রিয়ার বহু মহিলা তার অনুসারী হয়েছিল। এ খৃষ্টান মহিলাদের সংখ্যা ৭শত'র কম ছিল না।[২]

এ সময় পর্যন্ত একজন খৃষ্টানকেও তার ধর্ম বিশ্বাসের জন্য পীড়ন করা হয় নি। বিভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে মত পার্থক্য ছিল, কখনো তা গভীর ও তিক্ত রূপ পরিগ্রহ করত, কিন্তু কোনো ব্যক্তির ধর্ম বিশ্বাস ছিল তার নিজস্ব ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ও আন্তরিকতার বিষয়। পৃথিবী থেকে যীশুর অন্তর্ধানের পরের এ সময়কালে সাধু ও 'ধর্ম শহীদ'রা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে আপোষ করার চেয়ে হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছেন। শাসক কর্তৃপক্ষ এ ধর্মবিশ্বাসীদের নির্মূল করার জন্য তলোয়ার উত্তোলন

করলেও নিশ্চিতভাবে তাদের ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনে বাধ্য করে নি। কনস্টানটাইন যখন পলীয় চার্চের সাথে প্রথম জোটবদ্ধ হলেন, তখন পরিস্থিতিতে নাটকীয় পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি রোমান দেবতাদের পূঁজারি ছিলেন এবং পৌত্তলিক রাষ্ট্রের ধর্মীয় প্রধান হওয়া সত্ত্বেও সরাসরি পলীয় চার্চকে সমর্থন করতে শুরু করেন। পলীয় খৃষ্টধর্ম ও যীশুর মূল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে একটি বিভেদ সৃষ্টি করাই সম্ভবত তার উদ্দেশ্য ছিল। এ আনুকূল্য খৃষ্টানধর্মকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে এবং কার্যত তা রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম বিশ্বাসে পরিণত হয়। বহু লোকের জন্যই খৃষ্টান ধর্ম আকস্মিকভাবে যুগপৎ নীতি ও সুবিধা লাভের বিষয় হয়ে ওঠে। ফলে সামান্য সরকারী চাপ প্রয়োগ করতেই এ যাবৎ নিরপেক্ষ কিছু লোক পলীয় চার্চের অনুসারীতে পরিণত হয়। তবে বহু লোকই অন্তর থেকে নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। খৃষ্টান ধর্ম এক গণ আন্দোলন হয়ে উঠে।[৩] যাহোক, এ ঘটনা পলীয় চার্চ ও যীশুর প্রকৃত অনুসারী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় বিভক্তি ঘটায়। যারা সুবিধা লাভের জন্য খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা স্বভাবতই অনেক কম কঠোর পলীয় চার্চকে বেছে নিয়েছিল। অন্যদিকে যীশুর প্রকৃত ধর্মের অনুসারী চার্চ তাদেরই আমন্ত্রণ জানাত যার নিষ্ঠার সাথে এ ধর্মটি গ্রহণ ও পালনে সম্মত ছিল। কনস্টানটাইন, যিনি এ পর্যায়ে না খৃষ্টধর্মকে উপলব্ধি করতেন না তাতে বিশ্বাস করতেন, একটি ঐক্যবদ্ধ চার্চের রাজনৈতিক সুবিধা উপলব্ধি করেন যা তাকে মান্য করবে এবং যার কেন্দ্র হবে রোম, জেরুজালেম নয়। যীশুর ধর্মের প্রকৃত অনুসারী চার্চ যখন তার ইচ্ছা পালনে অস্বীকৃতি

জানায় তখন তিনি বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের বশীভূত করার চেষ্টা করলেন। এ অকারণ চাপ কিন্তু প্রত্যাশিত ফল বয়ে আনতে পারে নি। যীশুর প্রকৃত ধর্মের অনুসারী বেশ কিছু খৃষ্টান সম্প্রদায় তখন পর্যন্ত রোমের বিশপের প্রভূত্ব মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তারা এ ঘটনাকে একজন বিদেশি শাসকের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের এবং যীশুর শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি পদক্ষেপ হিসেবেই গণ্য করে।

প্রথম বিদ্রোহের ঘটনাটি গটে উত্তর আফ্রিকায় বারবার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে আরিয়াস নন, ডোনাটাস (Donatus) নামক এক ব্যক্তি এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। বারবাররা সামগ্রিকভাবে কতিপয় মৌলিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস। তারা যীশুকে একজন নবী হিসেবেই বিশ্বাস করত, ঈশ্বর হিসেবে কখনোই নয়। যেহেতু যীশু তার ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে রোমের কথা কখনোই উল্লেখ করেন নি, সেহেতু তাদের কাছে এ রকম কোনো ধারণা গ্রহণযোগ্য ছিল না। ৩১৩ খৃস্টাব্দে এসব লোক ডোনাটাসকে তাদের বিশপ হিসেবে নির্বাচন করে। প্রায় ৪০ বছর ধরে ডোনাটাস তাদের চার্চের নেতৃত্বে দেন যা রোমের বিশপের প্রতিপক্ষ হিসেবেই ক্রমশ প্রসার লাভ করে। জেরোমের মতে, ‘ডোনাটাসবাদ’ এক প্রজন্মের মধ্যে প্রায় সমগ্র উত্তর আফ্রিকার ধর্মে পরিণত হয়। কোনো শক্তি বা যুক্তি দিয়েই তার পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না।

রোমের বিশপ ডোনাটাসের স্থলে কার্থেজে আর একজন নিজের বিশপকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। তার নাম ছিল কেসিলিয়ান (Cacealian)। সম্রাট কনস্টানটাইনের মর্যাদার কারণে উভয় বিবদমান পক্ষই এ ব্যাপারে তার শরণাপন্ন হয়। মনে হয়, তারা ভেবেছিল যে কোনো এক রাজার সমর্থন লাভ করলে আর লড়াই করতে হবে না। সম্রাট কনস্টানটাইনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের এ প্রয়াস খৃষ্টান ধর্মের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে। এই প্রথমবারের মত মতবিভেদ ও প্রচলিত ধর্মমতে অবিশ্বাস নিরপেক্ষ আইন দ্বারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়া সম্ভব হলো। এই আইনে ধর্মের রক্ষাকবচ সেই পাবে যে নিজেকে কট্টর ধর্ম বিশ্বাসী বলে প্রমাণ করতে পারবে এবং তা পারার পর এ আইন তার বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হবে যে ধর্ম বিশ্বাসের নয়া মানদণ্ডের সাথে ভিন্নমত পোষণ করবে। কনস্টানটাইন কেসিলিয়ানের পক্ষ সমর্থন করলেন। কার্থেজের অধিবাসীরা রোমান উপ-কনসালের অফিসের সামনে জড়ো হলো এবং কেসিলিয়ানের নিন্দা করল। কনস্টানটাইন তাদের আচরণে বিরক্ত হলেন। তা সত্ত্বেও তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার জন্য রোমের বিশপের নেতৃত্বে একটি ট্রাইবুনাল গঠন করেন। ডোনাটাস সেখানে হাযির হন নি এবং তার পক্ষে যুক্তি-তর্ক পেশ করারও কেউ সেখানে ছিল না। তার অনুপস্থিতিতেই তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়। আফ্রিকায় যীশুর প্রকৃত শিক্ষার অনুসারী চার্চ রোমান বিশপের প্রদত্ত একতরফা রায় প্রত্যাখ্যান করে। এ ঘটনায় কনস্টানটাইনের বিরুদ্ধে এ বলে ক্ষোভ প্রকাশ করা হলো যে, “ঈশ্বরের মন্ত্রীগণ ফালতু মামলাবাজদের

মত নিজেদের মধ্যে বাক- বিতণ্ডায় লিপ্ত ছিলেন”[৪] হতাশ হওয়া সত্ত্বেও কনস্টানটাইন আরলেসে নতুন করে একটি ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করলেন। উভয় পক্ষের শুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে কোনো রকম সংঘর্ষ যাতে না ঘটে সে জন্য তাদের পৃথক পৃথক পথে আরলেসে আসার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ডোনাটাসের সমর্থকরা পুনরায় পরাজিত হন। এ ট্রাইবুনালের রায়ে বলা হয়: “বিশপগণ নিজেদের বিপজ্জনক লোকদের সাথেই দেখতে পেয়েছেন যাদের দেশের কর্তৃপক্ষ- বা ঐতিহ্যের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নেই। একমাত্র শাস্তিই তাদের প্রাপ্য।”[৫] আগের রায়ের চেয়ে এ রায় কোনোভাবেই পৃথক ছিল না। ফলে উত্তর আফ্রিকার খৃষ্টানদের কাছে তা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। বাস্তবে রোমান উপ-কনসাল ও রাজ-কর্মচারীদের প্রতি তাদের সামান্যই শ্রদ্ধা ছিল। কয়েক প্রজন্ম ধরে খৃষ্টানরা তাদের নিপীড়নের শিকার হয় এবং শয়তানের চেলা হিসেবে তাদের আখ্যায়িত করা হয়। আগে তারা নিপীড়িত হত খৃষ্টান হওয়ার কারণে। এখন তাদের ওপর নিপীড়ন নেমে আসে তারা প্রকৃত খৃষ্টান নয় বলে। উত্তর আফ্রিকার খৃষ্টানরা শুধুমাত্র রোমের পলীয় চার্চের বিশপের রায় বলবৎ করার জন্য রোমান সাম্রাজ্যের রাজকর্মচারীদের রাতারাতি ঈশ্বরের সেবক বনে যাওয়ার বিষয়টিকে মেনে নিতে পারে নি। এ সময় পর্যন্ত ডোনাটাস তাদের বিশপ ছিলেন। এখন তিনি তাদের জনপ্রিয় নেতায় পরিণত হলেন।

এই বিখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। তিনি যেসব গ্রন্থ লিখেছিলেন সেগুলো সহ বহু মূল্যবান গ্রন্থ সমৃদ্ধ তার লাইব্রেরিটি

রোমান সৈন্যরা পুড়িয়ে দেয়। এ কাজটি তারা করেছিল রোমান খৃষ্টান চার্চের নামে যা তখন এক পৌত্তলিক রাজার সমর্থনে ক্রমশ গুরুত্ব লাভ ও শক্তি অর্জন করছিল। যা হোক, ডোনাটাসের অতীত জীবন, তার ব্যক্তিগত জীবন, তার বন্ধু- বান্ধব বা জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। শুধু জানা যায় যে, তিনি একজন চমৎকার বাগ্মী এবং একজন বিরাট নেতা ছিলেন। তিনি যেসব স্থানে গিয়েছিলেন, তার মৃত্যুর বহুকাল পরও সে সব স্থানে তাকে স্মরণ করা হত। তার অনুসারীরা তার 'শ্বেত শুভ্র কেশ' স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন সে সব ধর্মপ্রাণ যাজকদের অনুসরণীয় আদর্শ যারা নিশ্চিত ছিলেন যে সঠিক পথ অনুসরণ করলে ইহকাল ও পরকালেও তার সুফল লাভ করবেন। তার নিষ্ঠা ও সততা শত্রু-মিত্র সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। তিনি একজন ধর্মীয় সংস্কারক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। "যিনি কার্থেজ-এ চার্চকে ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করেছিলেন।"[৬] জনসাধারণ তাকে একজন অলৌকিক কর্মী এবং দানিয়েলের চেয়ে জ্ঞানী তাপস হিসেবে সম্মান করত। যীশুর প্রকৃত শিক্ষা বিলোপ ও পরিবর্তনের সকল অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি এক অটল পাহাড়ের মত দণ্ডায়মান ছিলেন।

সম্রাট কনস্টানটাইন দুই চার্চের কাছে লেখা এক পত্রে তাদের মধ্যকার বিরোধ ভুলে যেতে এবং তার সমর্থিত চার্চের অধীনে উভয় পক্ষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। এ পত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ এ কারণে যে এতে কনস্টানটাইন নিজেকে চার্চের সর্বময় কর্তা হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং এতে যীশু সম্পর্কে কোনো প্রকার উল্লেখ না থাকায়

বিষয়টি নজর কাড়ে। তবে কেউ এ পত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয় নি এবং আরলেস এর ট্রাইব্যুনালে যে সিদ্ধান্ত হয় তা বাস্তবায়নেরও কোনো অগ্রগতি দেখা যায় নি।

৩১৫ খৃস্টাব্দে সম্রাট রোমে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতালির উত্তরে ফ্রাংকরা যে হামলা শুরু করে তা দমনের জন্য মিলান গমন করা সম্রাটের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছিল। এ সময় তিনি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে আফ্রিকায় প্রেরণের জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশন সেখানে পৌছলে তাকে বর্জন করা হয় এবং এমন সহিংস দাঙ্গা শুরু হয় যে কমিশনের সদস্যরা কোনো সাফল্য অর্জন ছাড়াই ইতালিতে ফিরে আসতে বাধ্য হন। এই অপ্রীতিকর সংবাদ কনস্টানটাইনের কাছে পৌঁছে ৩১৬ খৃস্টাব্দে। তিনি স্বয়ং উত্তর আফ্রিকা গমন এবং সঠিক কীভাবে সর্বোচ্চ ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ফরমান জারির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

লক্ষণীয় যে, কনস্টানটাইন এ ধরনের একটি রায় প্রদান তার কর্তৃত্বের এখতিয়ারভূক্ত বলে গণ্য করেছিলেন। আফ্রিকায় দুই চার্চের কাছে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন:

“আমার পক্ষে আরো যা করা যেতে পারে তা হলো সকল ভ্রান্তি দূর করে এবং হঠকারী মতামত ধ্বংস করে দিয়ে সকল লোককে সত্য ধর্ম ও সরল জীবনের পথ অনুসরণ এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রাপ্য উপাসনা করার আহ্বান জানানো।”[৭]

এটা সুস্পষ্ট যে, যীশুর দৃষ্টান্ত ভুলে যাওয়া ও উপেক্ষা করার প্রবণতা শুরু হওয়ার পর থেকে 'সত্য ধর্ম' এক মতামতের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং কনস্টানটাইন নিজে যে মত সমর্থন করতেন তা ছাড়া অন্য কোনো মতামত ছিল না। এভাবে সম্রাট কনস্টানটাইন এমন একটি ধর্মের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন যা তিনি নিজে অনুসরণ করতেন না। কনস্টানটাইন নিজেকে চার্চের নেতাদের চেয়েও অধিক কর্তৃত্ববান মনে করতেন এবং মনে হয় নিজকে সাধারণ মরণশীল মানুষের চাইতে ঈশ্বরের নিজস্ব প্রতিনিধি হিসেবেই বিবেচনা করতেন। আরলেস (Arles)- এর ট্রাইব্যুনালে যেসব পলীয় বিশপ বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তারাও সম্ভবত কনস্টানটাইনের মতই ধারণা পোষণ করতেন। তারা দাবি করতেন যে, তাদের পরিকল্পনা "পবিত্র আত্মা ও তার দেবদূতের সামনেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল।"[৮] কিন্তু তাদের রায় যখন উপেক্ষিত হলো তখন তারা সাহায্যের জন্য সম্রাটের শরণাপন্ন হলেন।

কনস্টানটাইন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও আফ্রিকা সফরে যান নি। ডোনাটাস পন্থীরা এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন যে সম্রাটকে ডোনাটাস ও কেসেয়িনের মধ্যকার বিরোধে ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়। যদি তার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ ব্যর্থ হত তবে সেটা হত তার মর্যাদার প্রতি এক বিরাট আঘাত। তাই তিনি ডোনাটাসের নিন্দা করে একটি ফরমান জারি করলেন। এতে সর্বোচ্চ ঈশ্বরের যথোচিত পন্থায় প্রার্থনার সুযোগ সুবিধা বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।[৯] যখন তা উপেক্ষিত হলো তখন অত্যন্ত কঠোর এক আইন' জারি

করে আফ্রিকায় প্রেরিত হলো। এতে ডোনাটাসের অনুসারীদের সকল চার্চ বাজেয়াপ্ত এবং তাদের সকল নেতাকে নির্বাসনে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। কেসেলিয়ান প্রথমে ডোনাটাসপন্থী চার্চদের নেতাদের উৎকোচ দিয়ে হাত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। ডোনাটাসপন্থীরা রাজকীয় ফরমান অগ্রাহ্য ও উৎকোচ উপেক্ষা করে। তারা অর্থ উৎকোচের প্রস্তাবের বিষয়টি প্রকাশ্যে ফাঁস করে দেয়। কেসেলিয়ান "কসাই এর চাইতেও নির্মম এবং একজন স্বৈরাচারীর চাইতেও নিষ্ঠুর" হিসেবে আখ্যায়িত হন।[১০]

ইতোমধ্যে 'ক্যাথলিক' বিশেষণ গ্রহণকারী রোমের চার্চ ডোনাটাসপন্থীদের কাছে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানিয়েছিল। ঈশ্বরের উপাসনায় তাদের ধর্মমতকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যেই তারা এ নামটি গ্রহণ করে। যা হোক, তাদের আবেদনের কোনো সাড়া মিলে নি এবং ডোনাটাস কেসেলিয়ানের কাছে তার চার্চগুলো হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানান। শেষ পর্যন্ত রোমান সেনাবাহিনী মাঠে নামে। পাইকারীভাবে লোকজনকে হত্যা করা হয়। মৃতদেহেগুলো কূপের মধ্যে নিক্ষেপ এবং বিশপদের তাদের চার্চের অভ্যন্তরে হত্যা করে। কিন্তু ডোনাটাস বেঁচে যান এবং অনমনীয় থাকেন। এরপর তাদের আন্দোলন আগের চেয়েও জোরদার হয়। তারা শহীদদের চার্চ (Church of Martyrs) নামে নিজেদের চার্চের নামকরণ করেন। এ সকল ঘটনায় ডোনাটাসপন্থী ও ক্যাথলিক চার্চ পৌত্তলিক বিচারকগণ (Magistrates) ও তাদের সৈন্যদের সাথে একজোট হয়ে কাজ করছিল, সেহেতু তাদের

বিভেদপন্থী এবং তাদের চার্চগুলোকে ‘ঘৃণ্য প্রতিমা উপাসনার স্থান’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

কনস্টানটাইন, যিনি একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, বল প্রয়োগে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও ঐক্য পুনরুদ্ধারে তার ব্যর্থতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। বিচক্ষণতা বীরত্বের অঙ্গ এ বিবেচনায় তিনি উত্তর আফ্রিকার জনসাধারণকে তাদের নিজেদের ওপর ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ সব ঘটনা ও সেগুলোর ফলাফল পরবর্তীকালে তার কাউন্সিল অব নিসিয়া (Council of Nicea) আহবানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে।

এ সময় আরিয়াসের কণ্ঠস্বর কেবল শোনা যেতে শুরু করেছিল। তার কাহিনিতে ফিরে যাওয়ার আগে ইসলামের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ডোনাটাসপন্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা প্রয়োজন। যেহেতু কনস্টানটাইন উত্তর আফ্রিকা থেকে তার মনোযোগ সরিয়ে এনে সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের দিকে নিবদ্ধ করেছিলেন সে কারণে ডোনাটাসপন্থীদের ওপর নিপীড়নের মাত্রা অনেক কমে এসেছিল। তাদের সংখ্যা পুনরায় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তারা এতটা শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে সম্রাট যখন ৩৩০ খৃস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় ক্যাথলিকদের জন্য একটি চার্চ নির্মাণ করেন তখন ডোনাটাসপন্থীরা তা দখল করে নেয়। সম্রাট এ ঘটনায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু আরেকটি চার্চ নির্মাণের জন্য ক্যাথলিকদের পর্যাপ্ত অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা ছাড়া তার আর কিছু করার ছিল না। ডোনাটাসপন্থীদের আন্দোলন

রোম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। রোমে তাদেরও একজন বিশপ ছিলেন, তবে পদমর্যাদার দিক থেকে তাকে কার্থেজ (Carthage) ও নিকোমেডিয়ার (Nicomedia) বিশপের চেয়ে একধাপ নীচে বলে গণ্য করা হত।[১১]

ডোনাটাস কার্থেজে সার্বভৌম কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। জনগণ অন্যান্য মরণশীল মানুষের চাইতে তাকে আরো উচ্চপর্যায়ের মানুষ বলে বিবেচনা করত। তাকে কখনোই বিশপ বলে ডাকা হতো না, বরং তিনি ‘কার্থেজের ডোনাটাস’ নামেই পরিচিত ছিলেন। আগাস্টাইন একবার অভিযোগ করেন যে, ডোনাটাসপন্থীরা যীশুর বিরুদ্ধে ধর্মীয় অবমাননার চাইতে ডোনাটাসের বিরুদ্ধে অপমানজনক কিছুর ক্ষেত্রে বেশি কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ঘটনাটি সত্য ছিল। কারণ তৎকালীন ক্যাথলিকরা ডোনাটাস সম্পর্কে কিছু বলার সময় কঠোর ও নিষ্ঠুর ভাষা ব্যবহার করত।

যখন কনস্টানটাইনের রাজত্বের অবসান ঘটে, তখন ডোনাটাসপন্থীরা চার্চের স্বাধীনতার জন্য তৎপরতা অব্যাহত রাখে। তারা ধর্মের ব্যাপারে সম্রাট অথবা রাজকর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিল। তবে, তারা কিন্তু আর যাই হোক, সংকীর্ণ চিত্ত ছিল না। আগাষ্টাইন বলেছেন যে, তারা ক্যাথলিকদের ওপর নিপীড়ন চালাত না, এমনকি তারা যখন তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি হয়ে পড়ে, তখনও না। ক্যাথলিকগণ, যারা সব সময় নিজেদের সহিষ্ণু বলে দাবি করতে প্রস্তুত ছিল, তারা এটা বরদাশত করতে সম্মত ছিল না। যখন আরো একবার ভয়- ডরহীন

ডোনাটাসপন্থীদের দমনের জন্য রাজকীয় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হয়, তখন এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যা হোক, দমন-নিপীড়ন অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও ডোনাটাসপন্থীরা সম্রাটকে তাদের ধর্মমত বা ঈশ্বর- উপাসনার পন্থা পরিবর্তন করতে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তাদের অভিমত ছিল এই যে, "ক্যাথলিকগণের পুরোহিতরা অসৎ ব্যক্তি যারা ইহলোকের রাজন্য বর্গের সাথে কাজ করে। রাজ- অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল হয়ে তারা যীশুর অবমাননা করেছে।[১২]

ডোনাটাসের মৃত্যুর পর উত্তর আফ্রিকার অধিবাসীরা তার আদর্শ অনুসরণ অব্যাহত রাখে। তারা ৩শত' বছর ধরে তার প্রচারিত যীশুর শিক্ষা অনুসরণ করে। পরে ইসলামের আগমন ঘটলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে যা ছিল কার্যত তাদের অনুসৃত ধর্মেরই এক সম্প্রসারিত ও সমর্থনকারী ধর্ম।

ডোনাটাসের আন্দোলনের পাশাপাশি একই সময়ে অথচ সম্পূর্ণ স্বাধীন এক আন্দোলন দক্ষিণ মিসরে চলছিল। কনস্টানটাইন যখন ৩২৪ খৃস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার জট খোলার জন্য আরেকবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তখনি তার দৃষ্টি মিশরের ওপর পতিত হয়। মিশর তখন বিদ্রোহ গোলযোগ ও অরাজকতায় আকীর্ণ ছিল। ডায়োক্লোশিয়ানের (Diocletioan) নেতৃত্বে খৃষ্টানদের প্রতি নিপীড়ন যখন তুঙ্গে উঠেছিল, তখন অনেকেই তা পরিহারের জন্য তার সাথে সমঝোতা করেছিল। মেলেটিয়াস (Meletius) নামক একজন পুরোহিত এ সময় বলেন যে, যেসব পুরোহিত প্রকাশ্যে খৃষ্টধর্মের নিন্দা করেছে তাদের যাজকবৃত্তির

কাজ পুনরায় শুরু করার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া উচিৎ। তিনি আরো উপলব্ধি করেন যে, প্রায়শ্চিত্তের পর্যাপ্ত প্রমাণ না প্রদর্শন করা পর্যন্ত সকল বিশুদ্ধ প্রার্থনা সমাবেশে তাদের যোগদান বন্ধ করতে হবে। এ সময় আলেকজান্দ্রিয়ার প্রধান যাজক পিটার আরো নমনীয় পন্থার পরামর্শ দেন। তবে অধিকাংশ লোকই মেলেটিয়াসকে সমর্থন করে। আলেকজান্ডার যখন যাজকদের প্রধান হলেন, তিনি মেলেটিয়াসকে মাইনেস-এ (Mines) নির্বাসিত করেন।

মেলেটিয়াস ফিরে আসার পর বহু অনুসারী তার চারপাশে সমবেত হন। তিনি বিশপ, পুরোহিত ও উচ্চপদের যাঁজকদের নিয়োগ দান এবং বহু গির্জা নির্মাণ করেছিলেন। তার অনুসারীরা তাদের নিপীড়নকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেছিল। মেলেটিয়াস তার চার্চকে “শহীদদের চার্চ” (Church of the Martyrs) নামে আখ্যায়িত করেন। আলোকজান্ডারের অনুসারীরা এর বিরোধী ছিল। কারণ, তারা নিজেদের ক্যাথলিক নামে আখ্যায়িত ও পলের প্রচারিত খৃষ্টধর্মের অনুসরণ করত। মেলেটিয়াসের মৃত্যুর পর আলেকজান্ডার তার অনুসারীদের প্রার্থনা সমাবেশ নিষিদ্ধ করেন। এ আদেশের বিরোধিতা করে তারা সম্রাট কনস্টানটাইনের কাছে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। একমাত্র নিকোমেডিয়ার ইউসেবিয়াসের (Eusebius) সাহায্য লাভ করে তারা সম্রাটের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করে। সম্রাটের দরবারে তাদের উপস্থিতির ঘটনা নিসিয়ার কাউন্সিল আহবানের অন্যতম কারণ ছিল। ইউসেবিয়াস আরিয়াসের বন্ধু ছিলেন। এই

সাক্ষাতের মধ্যদিয়ে আরিয়ান ও মেলেটিয়ান আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়।

এই দু'টি শহীদের চার্চের প্রেক্ষাপটে আরিয়াসের নেতৃত্বে আন্দোলন সংঘটিত হয়। আরিয়াসের সমর্থনে লেখা কোনো বিষয় এবং তার আন্দোলনের কোনো প্রকার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন কার্যত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন আরিয়াস সম্পর্কে যেসব বইতে উল্লেখ পাওয়া যায় তার প্রায় সবই তার শত্রুদের লেখা। সে কারণে তার জীবন ও কর্মের পূর্ণ বিবরণ প্রদান একেবারেই অসম্ভব। বিভিন্ন সূত্র থেকে তার সম্পর্কে যেসব চিত্র পাওয়া যায় তা জোড়া দিলে এই দাঁড়ায়: আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ পিটার তাঁকে একজন উচ্চ পদমর্যাদার যাজক হিসেবে নিয়োগ করেন, কিন্তু পরে তাকে তিনি বহিষ্কার করেন। পিটারের উত্তরসূরি পুনরায় তাঁকে পুরোহিত নিয়োগ করেন। আরিয়াস এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন যে, যখন আচিলাসের (Achillas) মৃত্যু গটে তখন তার স্থান দখলের সর্বপ্রকার সুযোগ জড়িত হওয়ার কোনো ইচ্ছা তার ছিল না। ফলে যাজকদের সর্বোচ্চ পদটিতে আলেকজান্ডার সহজেই অধিষ্ঠিত হন। আরিয়াসের প্রচারিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ করা হয়েছিল। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এ মামলার বিচারক। পরিণতিতে তাঁকে আবার বহিষ্কার করা হয়।

এ পর্যায় পর্যন্ত খৃষ্টানদের ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিরাট স্বাধীনতা ছিল। যারা নিজেদের খৃষ্টান বলে আখ্যায়িত করত তাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক লোক ত্রিত্ববাদকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ কি সে ব্যাপারে

কেউই নিশ্চিত ছিল না। কিছু লোক অন্ধভাবে এর সমর্থন করত। অন্য দিকে ডোনাটাস ও মেলেটিয়াসের মত কিছু লোক তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর এ দুয়ের মধ্যে যারা অবস্থান করছিল, তারা নিজেরা যেভাবে ভালো মনে করত, ত্রিত্ববাদের সেভাবে ব্যাখ্যা করার স্বাধীনতা তাদের ছিল। দুই শতাব্দী ধরে আলোচনার পরও কেউই এ ধর্মমতকে সন্দেহমুক্তভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয় নি। আরিয়াস ত্রিত্ববাদের সংজ্ঞা প্রদানের জন্য চ্যালেঞ্জ জানালেন। আলেকজান্ডার তখন সম্পূর্ণ পশ্চাদপসরন করলেন। তিনি যতই এর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেন ততই তিনি বিভ্রান্তির শিকার হলেন। আরিয়াস যুক্তি দিয়ে এবং পবিত্র গ্রন্থের প্রামাণিকতার ওপর নির্ভর করে ত্রিত্ববাদকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করলেন।

এর পর আরিয়াস যীশু সম্পর্কে আলেকজান্ডারের দেওয়া ব্যাখ্যা খণ্ডন করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, যীশু যদি প্রকৃতই 'ঈশ্বরের পুত্র' হয়ে থাকেন তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পুত্রের পূর্বে পিতার অস্তিত্ব ছিল। অতএব, এমন একটি সময় অবশ্যই ছিল যখন সন্তানের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং এর অর্থ এটাই হয় যে, পুত্র ছিল কোনো সত্ত্বা বা প্রাণ দ্বারা গঠিত সৃষ্টি যা সব সময়ই অস্তিত্বশীল ছিল না। যেহেতু ঈশ্বর অনাদি ও চিরস্থায়ী সত্ত্বা, সে কারণে যীশু ঈশ্বরের মত একই সত্ত্বা হতে পারেন না।

আরিয়াস সব সময় যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে কথা বলতেন। যেহেতু আলেকজান্ডার যুক্তি প্রমাণ সহ পাল্টা জবাব দিতে ব্যর্থ হতেন সে

কারণে তিনি চট করেই ক্রুদ্ধ হয়ে পড়তেন। তার সাথে তর্কের সময় আরিয়াস বলতেন: "আমার যুক্তির ত্রুটি কোথায় এবং আমার ন্যায়ানুমান কোথায় ভঙ্গ হয়েছে?" এর জবাব মিলত না। ফলে ৩২১ খৃস্টাব্দে নাগাদ আরিয়াস হয়ে উঠেছিলেন একজন জনপ্রিয় বিদ্রোহী পুরোহিত, বিপুল রকম আত্মবিশ্বাসী এবং নিজের বিশ্বাসের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন।

বিতর্কে এই ব্যক্তিগত বিপর্যয় ঘটার পর আলেকজান্ডার আরিয়াসের ধর্মমতের ব্যাপারে রায় ঘোষণার জন্য এক প্রাদেশিক সভা আহ্বান করেন। প্রায় ১শ' মিশরীয় ও লিবীয় বিশপ এতে যোগদান করেন। আরিয়াস অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তার অবস্থানের কথা ব্যাখ্যা করেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, এমন এক সময় ছিল যখন যীশু অস্তিত্বশীল ছিলেন না, অথচ ঈশ্বর তখনও বিরাজিত ছিলেন। যেহেতু যীশু ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট সে কারণে তার সত্ত্বা সীমাবদ্ধ, সুতরাং তিনি চিরন্তন হতে পারেন না। একমাত্র ঈশ্বরই চিরন্তন। যেহেতু যীশু সৃষ্ট প্রাণী, সে কারণে তিনিও অন্যান্য সকল যুক্তিবাদী প্রাণীর মতোই পরিবর্তনশীল। একমাত্র ঈশ্বরই অপরিবর্তনীয়। এভাবে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, যীশু ঈশ্বর ছিলেন না। অবিরাম যুক্তি সহকারে তার বক্তব্য পেশের পাশাপাশি তিনি বাইবেল থেকে অজস্র শ্লোক উদ্ধৃতি করতেন যেগুলোর কোথাও ত্রিত্ববাদের ব্যাপারে কোনো উল্লেখই ছিল না। তিনি বলেন, যদি যীশু বলে থাকেন 'আমার পিতা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ'[১৩] তাহলে ঈশ্বর ও যীশু সমকক্ষ এ কথায় বিশ্বাস করার অর্থ বাইবেলের সত্যকে অস্বীকার করা।

আরিয়াসের যুক্তি সমূহ অখণ্ডনীয় ছিল। কিন্তু আলেকজান্ডার তার অবস্থানের সুবাদে তাকে নির্বাসনে প্রেরণ করেন। তবে আরিয়াসের অনুসারীর সংখ্যা এত বিপুল ছিল যে, পলীয় চার্চ তাকে উপেক্ষা করতে পারে নি। বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের অনেক বিশপই আলেকজান্ডারের জারি করা আদেশ মেনে নিতে পারেন নি। যে বিতর্ক ৩শ' বছর ধরে টগবগ করে ফুটছিল তা এবার বিস্ফোরিত হলো। পূর্বাঞ্চলের এত বেশি সংখ্যক বিশপ আরিয়াসকে সমর্থন করেন যে, আলেকজান্ডার রীতি মত সমস্যার সম্মুখীন হন। এ সব বিশপের প্রধান মিত্র ছিলেন নিকোমেডিয়ার ইউসেবিয়াস। তিনি আরিয়াস ছিলেন বন্ধু ও লুসিয়ানের ছাত্র যিনি তার পবিত্রতা ও জ্ঞানের জন্য সার্বজনীন মর্যাদার পাত্র ছিলেন। সম্ভবত ৩১২ খৃস্টাব্দে লুসিয়ানের হত্যার ঘটনা তাদের বন্ধুত্বকে আরো শক্তিশালী ও অভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসে আরো দৃঢ় প্রত্যয়ী করেছিল।

আলেকজান্ডার কর্তৃক নির্বাসিত হওয়ার পর আরিয়াস কনস্টান্টিনোপলে ইউসেবিয়াসের কাছে একটি পত্র লেখেন। সে পত্রটি আজও রয়েছে। আরিয়াস এ পত্রে আলোকজান্ডারের বিরুদ্ধে নিপীড়নের অভিযোগ আনেন যিনি আরিয়াসকে একজন অধার্মিক নাস্তিক হিসেবে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বহিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ আরিয়াস ও তার বন্ধুরা বিশপের প্রচারিত ধর্মের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করতে রাজি হন নি। আরিয়াস পত্রে বলেন, “আমরা নির্যাতিত হচ্ছি এ কারণে যেহেতু আমরা বলি যে, যীশু উদ্ভূত হয়েছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর উদ্ভূত হন নি, তিনি অনাদি।[১৪] এ ঘটনার ফলে আরিয়াস

ইউসেবিয়াসের কাছ থেকে আরো বেশি করে সমর্থন লাভ করেন। ইউসেবিয়াসের ব্যাপক প্রভাব ছিল। আর শুধু জনসাধারণের ওপরই নয়, খোদ রাজ প্রসাদেও তার প্রভাব বিস্তৃত ছিল। তবে এই সমর্থন লাভ সত্ত্বেও আরিয়াস মনে হয় বিরোধিতার চাইতে একটি সমঝোতার প্রতিই সর্বদা আগ্রহী ছিলেন। সম্ভবত চার্চের অভ্যন্তরে একটি শৃঙ্খলা বজায় থাকুক, এটা তিনি বিশেষভাবে চাইতেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে ইতিহাসে খুব সামান্য উপাদানই পাওয়া যায়। আরিয়াসের কিছু পত্র এখনও টিকে আছে যা থেকে দেখা যায় যে, আরিয়াসের একমাত্র লক্ষ ছিল যীশুর শিক্ষাকে বিশুদ্ধ ও পরিবর্তন থেকে মুক্ত রাখা এবং খৃষ্টানদের মধ্যে বিচ্যুতি না ঘটানো। অন্যদিকে আলেকজান্ডারের লেখা পত্রসমূহ থেকে দেখা যায় যে, তিনি সর্ব সময়ই আরিয়াস ও তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু ভাষা ব্যবহার করেছেন। এক পত্রে তিনি লিখেছেন: তারা শয়তানের দ্বারা চালিত, শয়তান তাদের মধ্যে বাস করে এবং তাদের উত্তেজিত করে; তারা ভেলকি জানে এবং প্রতারক, চতুর, জাদুকরের মতো কথায় মোহাবিষ্ট করে, তাহারা হলো দস্যু, নিজেদের আস্তানায় তারা দিন রাত খৃষ্টকে অভিশাপ দেয়... তারা শহরের চরিত্রহীন তরুণী-রমণীদের মাধ্যমে লোকজনকে ধর্মান্তরিত করে।”[১৫] এ ধরনের হিংস্র ও অপমানকর ভাষা ব্যবহার থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, বিশপ আলেকজান্ডার তার নিজের ধর্মমতের দুর্বলতার ব্যাপারে অবশ্যই সচেতন ছিলেন।

ইউসেবিয়াস বিশপ আলেকজান্ডারের মনোভাবে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তিনি পূর্বাঞ্চলীয় বিশপদের এক সভা আহ্বানপূর্বক তাদের কাছে সম্পূর্ণ বিষয়টি উত্থাপন করেন। এ সমাবেশের ফল ছিল একটি পত্র যা পূর্ব ও পশ্চিমের সকল বিশপের কাছে প্রেরণ করা হয়। পত্রে তাদেরকে আরিয়াসকে চার্চে ফিরিয়ে নিতে আলেকজান্ডারকে রাজি করাতে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু আলেকজান্ডার আরিয়াসের পূর্ণ আত্মসমর্পণ চাইলেন। আরিয়াস ফিলিস্তিনে ফিরে আসেন ও তার অনুসারীদের নিয়ে প্রার্থনা সমাবেশ করতে থাকেন। আলেকজান্ডার তখন "তার ক্যাথলিক চার্চের সহযোগী কর্মীদের" কাছে দীর্ঘ এক পত্র লেখেন যাতে আরিয়াসের পুনরায় সমালোচনা করা হয়। আলেকজান্ডার এ পত্রে ইউসেবিয়াসের নাম উল্লেখ করে তাকে অভিযুক্ত করেন এ বলে যে, "তিনি মনে করেন যে, তার সম্মতির ওপরই চার্চের কল্যাণ নির্ভর করে।"[১৬] তিনি আরো বলেন, ইউসেবিয়াস আরিয়াসকে সমর্থন করেন, আর তা শুধু তিনি যে আরিয়াসের মতবাদে বিশ্বাস করেন সে জন্যই নয়, এর পিছনে রয়েছে তার নিজস্ব উচ্চাকাঙ্খাজনিত স্বার্থ। এভাবে যাজকদের মধ্যকার বিরোধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিশপদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধের রূপ গ্রহণ করে।

এ বিষয়টি নিয়ে বিশপদের পর্যায় থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন প্রশ্ন ছড়িয়ে পড়ে। নাইসিয়ার গ্রেগরী (Gregory of Nyssea) লিখেছেন:

"রাস্তা-ঘাট, বাজার, মুদ্রা ব্যবসায়ীদের দোকান, খাবার দোকানসহ কনস্টান্টিনোপলের সর্বত্রই তাদের নিয়ে আলোচনা চলছিল। একজন দোকানিকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে অমুক জিনিসের মূল্য কত, সে তার জবাব দেয় উদ্ভূত সত্ত্বা ও উদ্ভূত নয় এমন সত্ত্বা সম্পর্কে জানতে চেয়ে। রুটিওয়ালার কাছে রুটির দাম জানতে চাইলে সে বলে, 'পুত্র তার পিতার বান্দা'; চাকরকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, গোসলখানা তৈরি করা হয়েছে কিনা, সে জবাব দেয়: 'পুত্র কোনো কিছু থেকে উদ্ভূত হয় নি।' ক্যাথলিকরা ঘোষণা করেছে, 'জন্মলাভকারীই শ্রেষ্ঠ' এবং আরিয়াসরা বলছে: তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি জন্মদান করেছেন।"[১৭]

লোকে রমণীদের কাছে জিজ্ঞাসা করত যে, কোনো পুত্র জন্মগ্রহণ করার আগে তার অস্তিত্ব থাকতে পারে কি? যাজক মহলের উচ্চ পর্যায়েও এ বিতর্ক ছিল সমানভাবে উত্তপ্ত ও তিক্ত। জানা যায় যে, "প্রতিটি শহরেই বিশপরা বিশপদের সাথে একগুঁয়ে বিরোধে লিপ্ত ছিল। জনসাধারণ ছিল জনসাধারণের বিপক্ষে... এবং তারা পরস্পরের সাথে সহিংস সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল।[১৮]

সম্রাট কনস্টানটাইন বিষয়টি অবহিত ছিলেন। ঘটনাবলী ক্রমশই অবনতির দিকে যাচ্ছিল। তিনি হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হলেন এবং আলেকজান্ডার ও আরিয়াস উভয়ের উদ্দেশ্যে একটি পত্র প্রেরণ করলেন। এতে তিনি বললেন যে, ধর্মীয় মতামতের ঐক্য তিনি একান্তভাবে কামনা করেন যেহেতু সাম্রাজ্যে শান্তির জন্য সেটাই হলো সর্বোত্তম গ্যারান্টি। উত্তর আফ্রিকার ঘটনাবলীতে গভীরভাবে হতাশ হয়ে

তিনি “প্রাচ্যের হৃদয়ের” (Bosom of East) কাছ থেকে উত্তম কিছু আশা করলেন যেখানে “ঐশ্বরিক আলোর প্রভাতের” (Dawn of Divine light) উদয় ঘটেছিল। তিনি লিখেছেন:

“কিন্তু হায় গৌরবময় ও পবিত্র ঈশ্বর! শুধু আমার কান নয়, আমার হৃদয়ও ক্ষত- বিক্ষত, যখন আমি শুনতে পেলাম যে, আপনার মধ্যে যে বিরোধ ও দলাদলি বিদ্যমান তা এমন কি আফ্রিকার চাইতেও মারাত্মক; সুতরাং আপনারা, যাদের আমি অন্যদের বিরোধ নিরসনের দৃষ্টান্ত হিসেবে আশা করি, তাদের চেয়ে আরো খারাপ হওয়ার আগেই এর প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন এবং এখনো, এই আলোচনার মূল কারণ সম্পর্কে সতর্ক অনুসন্ধান করার পর আমি দেখতে পেয়েছি যে, তা একেবারেই তাৎপর্যহীন এবং এ ধরনের বিবাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। .... আমার অনুমান যে, বর্তমান বিতর্কের উৎপত্তি ঘটেছে এভাবে: যখন আপনি, আলেকজান্ডার, প্রতিটি যাজককে জিজ্ঞাসা করলেন যে, পবিত্র গ্রন্থের কতিপয় অংশ সম্পর্কে তিনি কীভাবেন অথবা তিনি একটি অর্থহীন বোকামিপূর্ণ প্রশ্নের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে কী চিন্তা করেন এবং আপনি, আরিয়াস, যথাযথ বিবেচনা ছাড়াই আপনি এমন সব কথা বললেন যা কখনো প্রকাশই পায় নি অথবা পেলেও নীরবেই তার বিলুপ্তি ঘটেছে, আপনাদের মধ্যে ভিন্নমত দেখা দিল। যোগাযোগ ছিন্ন হলো এবং অধিকাংশ লোক দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, তারা আর অভিন্ন হিসেবে ঐক্যবদ্ধ রইল না।”

এর সম্রাট তাদের উভয়কেই অবান্তর প্রশ্ন ও হঠকারী জবাব বিস্মৃত হওয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান:

বিষয়টি আদতে কখনোই উত্থিত হওয়ার যোগ্য ছিল না, কিন্তু অলস লোকদের করার মত বহু অপকর্ম থাকে এবং অলস মস্তিষ্কগুলো এ চিন্তাই করে। আপনাদের মধ্যে যে মতপার্থক্য বা বিরোধ তা পবিত্র গ্রন্থভিত্তিক কোনো যাজকের ধর্মমত নয় কিংবা তা নয়া প্রবর্তিত কোনো মতবাদের কারণে নয়। আপনারা উভয়েই একই প্রকার এবং অভিন্ন মত পোষণ করেন। সুতরাং আপনাদের মধ্যে পুনর্মিলন সহজেই সম্ভব।

সম্রাট এ পত্রে পৌত্তলিক দার্শনিকদের উদাহরণ দেন যারা একই প্রকার বিশদ সাধারণ নীতিমালা ধারণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য পোষণে সম্মত হয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে তিনি প্রশ্ন করেন, নিছক তুচ্ছ ও মৌখিক মতপার্থক্যের কারণে খৃষ্টান ভাইদের একে অপরের সাথে শত্রুর মতো আচরণ করা কি ঠিক? তার মতে এ ধরনের আচরণ:

রুচিহীন, শিশুসূলভ ও বদমেজাজি ও দুর্ভাগা ঈশ্বরের যাজকগণ এবং বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ... এটা হলো শয়তানের ছলনা ও প্রলোভন। এ ব্যাপারে আসুন আমরা কিছু করি। আমরা সবাই যদি সকল বিষয়ে এক রকম ভাবতে নাও পারি, অন্তত বড় বিষয়গুলোতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। পবিত্র ঐশ্বরিক সত্ত্বা প্রসঙ্গে আসুন সবাই একই বিশ্বাস এক উপলব্ধি পোষণ এবং ঈশ্বর প্রসঙ্গে এক ও অভিন্ন মত অবলম্বন করি।

পত্রে এ বলে উপসংহার টানা হয়:

যদি তা না হয়, তাহলে আমার সেই শান্তিপূর্ণ ও সমস্যামুক্ত রাতগুলো ফিরিয়ে দিন যাতে আমি আমার আনন্দ এবং শান্তিপূর্ণ জীবনের উৎফুল্লতা লাভ করতে পারি। তা যদি না হয় তাহলে আমি অবশ্যই যন্ত্রণা কাতর ও অশ্রুসিক্ত হব এবং মৃত্যু পর্যন্ত আমি কোনো শান্তি পাব না। যেখানে ঈশ্বর প্রেমীগণ, আমার সহকর্মী সেবকগণ এ ধরনের বেআইনি ও ক্ষতিকর বিতর্কে লিপ্ত সেখানে আমি কীভাবে মনে শান্তি পাব?[১৯]

এ পত্র শুধু খৃষ্টধর্ম সম্পর্কেই নয়, অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কেও সম্রাটের চরম অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে যেহেতু তিনি মনে করতেন যে, একজন মানুষ যেভাবে খুশি ঈশ্বরের উপাসনা করুক অথবা ঈশ্বর নির্দেশিত পন্থায়ই উপাসনা করুক তা একই ব্যাপার। কার্যত তার কাছে আলেকজান্ডার ও আরিয়াসের মধ্যকার বিরোধ ছিল নেহায়েতই মৌখিক বিবাদ অথবা এক তাৎপর্যহীন এবং অপ্রয়োজনীয় তুচ্ছ বিষয়। এ দু'জনের মধ্যকার বিরোধকে নিছক তুচ্ছ বলে আখ্যায়িত করা থেকে বোঝা যায় যে, কনস্টানটাইন জানতেন না তিনি কোন বিষয়ে কথা বলছেন। একদিকে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস অন্য দিকে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস এর মধ্যে তার দৃষ্টিতে মৌলিক কোনো বিরোধ ছিল না। পত্র থেকে দেখা যায়, কনস্টানটাইন বাস্তব সত্য নিয়ে নয়, তার মনের শান্তির ব্যাপারেই বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। সুতরাং তার পত্রে যে কোনো ফল হয় নি, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কর্দোবার হোসিয়াস এ পত্র আলেকজান্দ্রিয়ায় বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। অল্প কয়েকদিন অবস্থানের

পর তিনি তার মিশনের ব্যর্থতা সম্পর্কে সম্রাটকে জ্ঞাত করার জন্য শূন্য হাতে ফিরে আসেন।

একদিকে যখন এসব ঘটনা ঘটে চলেছিল, অন্যদিকে কনস্টানটাইন তার ভগ্নীপতি লিসিনাসের (Licinus) সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়াই করছিলেন। যুদ্ধে লিসিনাস নিহত হন। লিসিনাস ছিলেন আরিয়াসের সমর্থক। সুতরাং তার মৃত্যুর ফলে সম্রাটের দরবারে আরিয়াসের অবস্থান আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। যা হোক, কনস্টানটাইন উপলব্ধি করলেন যে, একটি যুদ্ধে জয়লাভ করলেও শান্তি হারানো সম্ভব। হোসিয়াসের (Hosius) মিশনের ব্যর্থতার পর প্রাচ্যের পরিস্থিতি গোলযোগপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। আরিয়াসের বাণী ও যুক্তির পরিণতি হলো আলেকজান্দ্রিয়ায় রক্তপাত। সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল বা প্রাচ্যের সর্বত্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। ইতিপূর্বেই উত্তর আফ্রিকায় বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ ছিল। এ পর্যায়ে সম্রাট উপলব্ধি করেন যে, তার পলীয় চার্চের বন্ধুগণ তার কোনো সমস্যাই মিটিয়ে দেওয়ার মতো শক্তিশালী নয়। উত্তর আফ্রিকার বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন তা হলো: প্রকাশ্যে কোনো পক্ষ সমর্থন করা তার উচিৎ নয়। তাই তিনি আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেন। একজন পৌত্তলিক হিসেবে তার অবস্থান তাকে এক বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছিল। যেহেতু তিনি বিবাদমান কোনো সম্প্রদায়েরই অনুসারী নন, সে কারণে তিনি একজন নিরপেক্ষ বিচারক হতে পারবেন। তার ধারণা হলো, এর ফলে তখন পর্যন্ত বিশপরা যে সমস্যার সম্মুখীন ছিলেন, তা নিরসন হবে। কারণ, এ ধরনের একটি বিষয়ের নিষ্পত্তিকারী হিসেবে একজন

খৃষ্টানের সভাপতিত্বের বিষয়টি মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কনস্টানটাইনের নেতৃত্বে বিশপদের এ সভাটি আজ কাউন্সিল অব নিসিয়া (Council of Nicea) হিসেবে পরিচিত।

সভার জন্য আমন্ত্রণ লিপি প্রেরণ করা হলো। কনস্টানটাইন রাজকীয় কোষাগার থেকে এর সকল ব্যয় ভার বহন করেন। দু'বিবদমান পক্ষে নেতৃবৃন্দ ছাড়া অন্য যাদের আমন্ত্রণ জানানো হলো তারা সার্বিকভাবে তেমন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না। ডোনাটাসের প্রধান বিরোধী কেসেলিয়ানকে এ সভায় আমন্ত্রণ জানানো হলেও ডোনাটাসের চার্চের কাউকেই আমন্ত্রণ করা হয় নি। সভায় অংশগ্রহণকারী অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিশপগণ হলেন:

**কায়সারিয়ার ইউসেবিয়াস (Eusebius of Caesaria)**

ইউসেবিয়াস ছিলেন খৃষ্টীয় ধর্মীয় ইতিহাসের জনক। তার গ্রন্থ হলো বিভিন্ন বিবরণের প্রধান ভান্ডার যা খৃষ্টীয় ধর্মীয় ইতিহাসের চতুর্থ শতককে প্রথম শতকের সাথে সংযুক্ত করেছে। প্রভূত জ্ঞান ছাড়াও তার প্রভাব ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। প্রাচ্যের যাজকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি সম্রাটের মনের কথা বলতে পারতেন। তিনি সম্রাটের দোভাষী, নামমাত্র যাজক ও পাপের স্বীকারোক্তি শ্রবণকারী ছিলেন। তিনি মনে প্রাণে আরিয়াসের মতানুসারী ছিলেন এবং ফিলিস্তিনের অধিকাংশ বিশপের সমর্থন তিনি লাভ করেছিলেন।

**নিকোমেডিয়ার ইউসেবিয়াস (Eusebius of Nicomedia)**

তিনি ছিলেন এক অভিজাত পরিবারের সন্তান। তিনি একই সময় লুসিয়ান ও আরিয়াসের অনুসারী ছিলেন। তার আধ্যাত্মিক খ্যাতি সর্বত্র স্বীকৃত ছিল। ঐ সময় একই নামে (ইউসেবিয়াস) দু'জন ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি ছিলেন। যার ফলে সমকালীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে তাদের ব্যাপারে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। নিকোমেডিয়ার ইউসেবিয়াস আরিয়াসের অবিচল সমর্থন ছিলেন। আরিয়াসের অনুসারীরা তাকে "মহান" বলে আখ্যায়িত করেন। তার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। তিনি প্রথমে বৈরুতের বিশপ ছিলেন, পরে নিকোমেডিয়ায় বদলি হন। নিকোমেডিয়া তখন প্রাচ্যের রাজধানী ছিল। সম্রাটের ভগ্নীপতি ও প্রতিদ্বন্দ্বী লিসিনাস তার একজন ভালো বন্ধু ছিলেন। ফলে সম্রাটের বোন কনষ্টানটিনার (Constantina) ওপর তার ব্যাপক প্রভাব ছিল। লিসিনাস সম্রাটের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হন। এবং প্রাণ হারান। স্বামীর মৃত্যুর পর কনস্টানটিনা বসবাসের জন্য রাজ প্রসাদে চলে যান। এভাবে কনষ্টানটিনার মাধ্যমে ও রাজ পরিবারের সাথে তার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়তার কারণে রাজদরবারে তার ভালো প্রভাব ছিল এবং তা কখনোই খর্ব হয় নি। শুধু তার প্রভাবেই সম্রাট কনস্টানটাইন আরিয়াসের চার্চে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়েই মারা যান।

**এথানাসিয়াস (Athanasius):**

বয়সে তরুণ এই ব্যক্তিটি ত্রিত্ববাদের এক কট্টর সমর্থক ছিলেন। বার্ধক্যে উপনীত ও আরিয়াস কর্তৃক বহুবার বিপর্যস্ত আলেকজান্ডার

নিসিয়ার সভায় নিজে যাওয়ার পরিবর্তে প্রতিনিধি হিসেবে এথানাসিয়াসকে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

## হোসিয়াস (Hosius)

হোসিয়াস ছিলেন সম্রাটের প্রধান সভাসদ। তার গুরুত্ব ছিল এখানে যে তিনি পাশ্চাত্যে পলীয় চার্চের প্রতিনিধিত্ব করতেন যেখানে সম্রাটের প্রভাব ছিল দুর্বলতার। হোসিয়াস একজন ধর্মীয় পণ্ডিত হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। ইতিহাসে তিনি 'মাননীয় প্রবীণ ব্যক্তি' হিসেবে পরিচিত ছিলেন যাকে এথানাসিয়াস 'পবিত্র' (Holy) বলে আখ্যায়িত করেন। উচ্চ চরিত্র বলের জন্য তিনি সকলের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। সম্রাটের সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণে তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

উপরোক্ত কয়েকজন ছাড়াও কাউন্সিলে এমন সব ব্যক্তি ছিলেন যারা ধর্মনিষ্ঠার জন্য খ্যাতিমান হলেও জ্ঞানের জন্য খ্যাতিমান ছিলেন না। তাদের হৃদয় পবিত্র থাকলেও মুখের ভাষা সবসময় পরিশীলিত ছিল না।

## স্পিরিডেম (Spiridem)

স্পিরিডেম ছিলেন একজন অমার্জিত ও সরলমনা যাজক। তিনি ছিলেন সেসব অশিক্ষিত বিশপদেরই একজন যারা ঐ সময় ছিলেন চার্চগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে তিনি কী ধরনের মানুষ ছিলেন তা বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। তিনি ছিলেন একজন মেষ পালক। নিপীড়ন-নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি তার বিশ্বাসে অটল ছিলেন। ধর্মের রাজনীতির ব্যাপারে

তার জ্ঞান ছিল ভাষা। তার প্রতি বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা আরোপিত হওয়ার কারণে তিনি বিশপ নিযুক্ত হন। বিশপ হওয়ার পরও তার সাধারণ ও গেঁয়ো বেশ-ভূষার পরিবর্তন হয় নি। তিনি সব সময় পদব্রজে চলতেন। পল্লীয় চার্চের অন্যান্য 'রাজপুত্রগণ' তাকে পছন্দ করতেন না। তাদের উদ্বেগ ছিল যে, তিনি যথাসময়ে সভার অধিবেশনে যোগ দিতে নিসিয়া পৌঁছতে পারবেন কিনা। স্পিরিডেম যখন সম্রাটের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পত্র পেলেন, তিনি উপলব্ধি করলেন তিনি যদি যথাসময়ে পৌঁছতে চান তাহলে তাকে খচ্চরের পিঠে সাওয়ার হয়ে সফর করতে হবে। তিনি অন্যান্য বিশপদের মত দলবল না নিয়ে একজন মাত্র পরিচারক সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন। তারা দু'টি খচ্চরে চড়ে সফর করছিলেন। একটি রং ছিল সাদা, অন্যটির রং ছিল সাদা ও কালোয় মিশানো। এক রাতে তারা একটি সরাইখানায় আশ্রয় নেন। এ সময় সেখানে অন্যান্য বিশপরাও পৌঁছেন যারা নিশ্চিন্তে ছিলেন না যে, স্পিরিডেম সভার আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য আদৌ যোগ্য কিনা। পরদিন ভোরে স্পিরিডেম যখন নিদ্রায় বিভোর, তারা দু'টি খচ্চরকে হত্যাকরে সরাইখানা ত্যাগ করেন। স্পিরিডেম ঘুম থেকে জেগে খচ্চরগুলোকে আহার করিয়ে সেগুলোর পিঠে জিন চাপাতে পরিচারককে নির্দেশ দিলেন। সে খচ্চরগুলোকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্পিরিডেমকে সেই দুঃসংবাদ দিল। বিশপগণ খচ্চর দু'টির মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। তিনি পরিচারককে প্রতিটি খচ্চরের দেহের কাছে সে গুলোর কর্তিত মাথা এনে রাখতে বললেন। সে অন্ধকারের মধ্যে ভুল করে এক খচ্চরের মাথা অন্যটির কাছে নিয়ে রাখল। যেইমাত্র সে মাথাগুলো খচ্চরগুলোর দেহের কাছে রাখল, সাথে সাথে সেগুলো জীবন লাভ করে

উঠে দাঁড়াল। তারা তাদের যাত্রা আবার শুরু করলেন। কিছু সময় পরই তারা সেই বিশপদের দলকে অতিক্রম করলেন যারা ভেবেছিল যে, তারা স্পিরিডেমকে যথেষ্ট পিছনে ফেলে আসতে সক্ষম হয়েছে এবং তিনি যথা সময়ে নিসিয়া পৌঁছতে পারবেন না। তাদের বিস্ময় চরমে পৌঁছাল যখন তারা দেখল যে, সাদা খচ্চরটির মাথা সাদা কালো রং অন্যদিকে সাদা কালো রঙের খচ্চরটির মাথা সাদা।[২০]

**পাটামন (Patamon) তিনি একজন সন্ন্যাসী ছিলেন**

ওসিয়াস (Ocsius), তিনি শুধু তার আচারনিষ্ঠতার কারণে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

নিকোলাসের মাইজার (Myser of Nicholas), তার নামটি ইতিহাসে স্থান লাভ করেছে বিশেষত চার্চের ঐতিহাসিকগণের করণে, যেহেতু আরিয়াস যখন কথা বলছিলেন, তিনি তখন তার কানে ঘুসি মেরেছিলেন।

এভাবে দেখা যায়, নিসিয়ার (নিকিও) পরিষদ বেশির ভাগ সেসব বিশপদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল যারা একান্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু মূল বিষয়ে পর্যাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান তাদের ছিল না। এ সকল লোককে হঠাৎ করে সেকালের গ্রীক দর্শনের চটপটে ও অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যাখ্যাতাদের মুখোমুখি করা হয়েছিল। তাদের প্রকাশ ভঙ্গি ছিল এমন যে কী বলা হচ্ছে তার তাৎপর্য বুঝে ওঠা এসব বিশপের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারা তাদের জ্ঞানের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে অপরাগ হয়ে অথবা তাদের বিরোধীদের সাথে বিতর্কে অক্ষম হয়ে তাদের নিজেদের বিশ্বাসে

স্থিত হয়ে চুপ করে থাকা অথবা সম্রাটের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হওয়া ছাড়া তাদের আর কিছু করার ছিল না।

সভা শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগেই সকল প্রতিনিধি নিসিয়া পৌঁছেন। তারা ছোট ছোট দলে জড়ো হতেন এবং তাদের মধ্যে আসন্ন সভার বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে বিতর্ক হত। এসব সমাবেশে, যা সাধারণত জিমনাসিয়াম বা খোলা আকাশের নিচে অনুষ্ঠিত হত, গ্রীক দার্শনিকগণ তাদের যুক্তির বাণ ছুঁড়ে দিতেন এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতেন তবে তা আগত প্রতিনিধিদের বিভ্রান্ত করত না।

অবশেষে নির্দিষ্ট দিনটি এল। প্রত্যেকেই সভায় উপস্থিত হলেন। সম্রাট সভা উদ্বোধন করবেন। প্রাসাদের একটি বিশাল কক্ষ সভার জন্য নির্ধারণ করা হয়। কক্ষের মাঝখানে টেবিলে সেকালের সকল জ্ঞাত গসপেলের কপি সমূহ রাখা হয়ে ছিল। সেগুলোর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩শ’। প্রত্যেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল চমৎকার সাজে সজ্জিত কাঠের তৈরি রাজসিংহাসনের দিকে। সিংহাসনটি স্থাপন করা হয়েছিল পরস্পরের দিকে মুখ করে সন্নিবিষ্ট দু’সারি আসনের মধ্যে, কক্ষের উঁচু হয়ে উঠে যাওয়া দিকের শেষ প্রান্তে। মাঝে মাঝে দূরাগত মিছিলের শব্দ রোল ছাড়া কক্ষের মধ্যে গভীর নীরবতা বিরাজ করছিল। মিছিলটি প্রাসাদের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। এ সময় রাজদরবারের কর্মকর্তারা একে একে আসতে শুরু করলেন। শেষ মুহূর্তে কোনো ঘোষণা ছাড়াই সম্রাট এসে হাযির হলেন। সভায় আগত সমবেত প্রতিনিধিরা উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রথমবারের মত তারা সম্রাট কনস্টানটাইনের প্রতি সবিস্ময় দৃষ্টি

নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তিনি ছিলেন সম্রাট কনস্টানটাইন, বিজয়ী, মহান, শ্রেষ্ঠ। তার দীর্ঘ দেহ, সুগঠিত শরীর, প্রশস্ত কাঁধ এবং সুদর্শন মুখায়বর তার উচ্চ মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল। তার অভিব্যক্তি দেখে তাকে অবিকল রোমান সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর মতো মনে হচ্ছিল। বিশপদের অনেকেই তার ঝলমলে জমকালো রাজ পোশাক দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। তার দীর্ঘ চুলে ঢাকা মাথায় ছিল মনিমুক্তা খচিত রাজমুকুট। তার উজ্জ্বল লাল রঙ্গের আলখাল্লা ছিল মূল্যবান পাথর ও সোনার কারুকাজ খচিত। তার পায়ে ছিল টকটকে লাল রঙের জুতা যা সেকালে শুধুমাত্র সম্রাটরাই পায়ে দিতেন এবং এ কালে শুধুমাত্র পোপই তা পরেন।

সম্রাটের দু'পাশে আসীন ছিলেন হোসিয়াস ও ইউসেবিয়াস। ইউসেবিয়াস সম্রাটের উদ্দেশ্যে বক্তৃতার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করলেন। সম্রাট সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্যে দিয়ে তার জবাব দিলেন। তার ভাষণ ল্যাটিন থেকে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয় যা অল্প লোকেই বুঝতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি সম্রাট নিজেও তা তেমন বুঝতে পারেন নি। কারণ, গ্রীক ভাষায় তার জ্ঞান ছিল অতি সামান্য। সভার কাজ যতই অগ্রসর হতে থাকল, বিতর্কের তোরণদ্বার তত উন্মুক্ত হতে শুরু করল। কনস্টানটাইন তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা গ্রীক জ্ঞান নিয়ে একটা বিষয়েই তার সকল শক্তি নিয়োজিত করলেন। তা হলো, একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছা। তিনি প্রত্যেককে জানিয়ে দিলেন যে, বিভিন্ন দলের কাছ থেকে কয়েকদিন আগে তিনি যত অভিযোগ আবেদন পেয়েছিলেন তার সবই তিনি পুড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি আশ্বস্ত করলেন যে, যেহেতু

তিনি সেগুলোর কোনোটিই পড়েন নি, যেহেতু তার মন খোলা রয়েছে এবং তিনি পক্ষপাতদুষ্ট নন।

পলীয় চার্চের প্রতিনিধিগণ ঈশ্বরের ৩টি অংশ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা বাইবেল থেকে মাত্র দু'জনের পক্ষে যুক্তি পেশ করতে সক্ষম হন। তা সত্ত্বেও 'পবিত্র আত্মা' কে ঈশ্বরের তৃতীয় অংশ তথা তৃতীয় ঈশ্বর হিসেবে ঘোষণা করা হয় যদিও এ কল্পিত বিষয়ের সমর্থনে কোনো যুক্তি প্রদর্শন করা হয় নি। অন্যদিকে লুসিয়ানের শিষ্যরা তাদের ভিত্তি সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন এবং তারা ত্রিত্ববাদীদের একটি অসম্ভব অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যেতে বাধ্য করেন।

ত্রিত্ববাদীরা একজন খৃষ্টানের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে চাইছিল আরিয়াস ও অন্যান্য একত্ববাদী সমর্থকদের বাদ দিয়ে সে সংজ্ঞা নির্ধারণে সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে ত্রিত্ববাদ যাকে তারা দু'পক্ষের মধ্যে প্রধান বিতর্কিত বিষয় বলে গুরুত্ব আরোপ করেছিল, প্রকৃতপক্ষে কোনো গসপেলেই তার উল্লেখ ছিল না। তাদের বক্তব্য ছিল যে, তারা যাকে 'পুত্র' হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি ঈশ্বরের পুত্র। আরিয়াস পন্থীরা তার জবাবে বলে যে, তারা সকলেই 'ঈশ্বরের পুত্র', কারণ বাইবেলে লেখা আছে যে, "সকল কিছুই ঈশ্বর থেকে।"[২১] এ যুক্তি ব্যবহার করা হলে সকল সৃষ্টিরই ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়। পলীয় বিশপগণ তখন যুক্তি উত্থাপন করেন যে, যীশু শুধু 'ঈশ্বর হতে' নন, 'ঈশ্বরের সত্ত্বা থেকেও।' এ যুক্তি সকল সনাতনপন্থী খৃষ্টানের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তারা বলেন, বাইবেলে এ ধরনের কোনো কথাই নেই।

এভাবে যীশুকে ঈশ্বর প্রতিপন্ন করার চেষ্টা খৃষ্টানদের ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে তাদের মধ্যে আরো বিভক্তি সৃষ্টি করে। বেপরোয়া হয়ে ত্রিত্ববাদীরা তখন যুক্তি প্রদর্শন করে যে, বাইবেলে বলা হয়েছে "যীশু হলেন পিতা ও সত্য ঈশ্বরের চিরন্তন ভাবমূর্তি।"[২২] আরিয়াস পন্থীরা তার জবাবে বলেন, বাইবেলে একথাও বলা হয়েছে "আমরা মানবগণ ঈশ্বরের ভাবমূর্তি ও গৌরব।"[২৩] যা হোক, এ যুক্তি যদি গৃহীত হয় তাহলে প্রমাণিত হয় শুধু যীশুই নয়, সকল মানুষই ঐশ্বরিক বলে দাবি করতে পারে।

সভাকক্ষেই শুধু নয়, রাজপ্রাসাদের মধ্যেও আলোচনা চলতে থাকে। সম্রাটের মাতা হেলেনা পলীয় চার্চকে সমর্থন করেন। তিনি ছিলেন রাজনীতি বিশারদ, তার রক্তে ছিল শাসক গোষ্ঠীর ধারা প্রবাহ মান। অন্যদিকে সম্রাটের বোন কনষ্টানটিনা ছিলেন একত্ববাদে বিশ্বাসী। তিনি আরিয়াসকে সমর্থন করতেন। তার মতে আরিয়াস যীশুর শিক্ষার অনুসারী ছিলেন। তিনি রাজনীতি ঘৃণা করতেন এবং ঈশ্বরকে ভালো বাসতেন ও ভয় করতেন। বিতর্ক রাজ দরবারেও ছড়িয়ে পড়ে। সভায় যার শুরু হয়েছিল তা রাজ প্রাসাদ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় এবং তাতে রাজপুরুষ ও প্রাসাদের পাচকগণও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুকৌশলে সম্রাট দু'পক্ষ থেকে দূরত্ব বজায় রাখেন এবং সবাইকে আঁচ-অনুমানের মধ্যে রাখেন। একজন পৌত্তলিক হিসেবে তিনি খৃষ্টানদের কোনো সম্প্রদায়েরই পক্ষে ছিলেন না। এটি ছিল তার পক্ষে এক জোরালো যুক্তি।

বিতর্ক চলতে থাকা অবস্থায় উভয় পক্ষের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ সভায় কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না। তা সত্ত্বেও তারা সম্রাটের সমর্থনের প্রত্যাশা করলেন যেহেতু পলীয় চার্চের জন্য সেটা ছিল শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপার। অন্যদিকে উত্তর আফ্রিকাবাসীদের জন্য সম্রাটের সমর্থন লাভের অর্থ ছিল তাদের নিপীড়নের অবসান। কনস্টানটাইনের আনুকূল্য লাভের জন্য উপস্থিত সকল বিশপ ধর্মের কিছু পরিবর্তন সাধনে সম্মত হন। রাজকুমারী কনষ্টানটিনা ইউসেবিয়াসকে পরামর্শ দিলেন যে, সম্রাট একটি ঐক্যবদ্ধ চার্চ চান। কারণ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিভক্তি সাম্রাজ্যকে বিপদগ্রস্ত করবে। কিন্তু যদি কোনো ঐকমত্য না হয় তাহলে তিনি ধৈর্য্য হারাবেন এবং খৃষ্টানদের প্রতি তার সমর্থন প্রত্যাহার করবেন। যদি তিনি সে পন্থাই গ্রহণ করেন তাহলে খৃষ্টানদের পরিস্থিতি আগের চেয়েও খারাপ হবে এবং খৃষ্টান ধর্মও অধিকতর বিপন্ন হবে। ইউসেবিয়াসের পরামর্শক্রমে আরিয়াস ও তার অনুসারীরা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করলেন, তবে সভা যেসব পরিবর্তন সাধনের সিদ্ধান্ত নিল তা থেকে তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখলেন। যেহেতু সে সময় সাম্রাজ্যের সর্বত্র রোমান সূর্যদেবতার উপাসনা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং সম্রাটকে পৃথিবীতে দেবতার রূপ হিসেবে গণ্য করা হত, এ প্রেক্ষিতে পলীয় চার্চ:

- রোমান সূর্য- দিবস (Sun-day)- কে খৃষ্টানদের সাপ্তাহিক ধর্মীয় দিবস ঘোষণা করল;
- সূর্য-দেবতার প্রচলিত জন্ম দিবস ২৫ ডিসেম্বরকে যীশুর জন্ম দিবস হিসেবে গ্রহণ করল;

- সূর্য-দেবতার প্রতীক আলোর ক্রুশকে (Cross of light) খৃষ্টবাদের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করল;
- এবং সূর্য-দেবতার জন্ম দিবসের সকল উৎসব অনুষ্ঠানকে নিজেদের উৎসব অনুষ্ঠান হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিল।

খৃষ্টান ধর্ম এবং তার সাম্রাজ্যের ধর্মের মধ্যকার বিপুল ব্যবধান অত্যন্ত উল্লেখ যোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ার এ ঘটনা সম্রাট কনস্টানটাইনের জন্য নিশ্চয় অত্যন্ত সন্তোষজনক মনে হয়েছিল। চার্চ তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে। ফলে চার্চের প্রতি তার সমর্থন আগে দুর্বল থাকলেও এখন তা অত্যন্ত জোরালো হয়ে ওঠে।

চূড়ান্তভাবে ত্রিত্ববাদ খৃষ্টানধর্মের মৌলিক মতবাদ হিসেবে গৃহীত হয়। এ পর্যায়ে সম্ভবত এই মতবাদের কিছু অনুসারীর তখনও সরাসরি একত্ববাদের অভিজ্ঞতা ও তার প্রতি সমর্থন বিদ্যমান ছিল। তাদের জন্য ত্রিত্ববাদ সেই পন্থার চেয়ে কম কিছু ছিল না যে পন্থায় তারা যা প্রত্যক্ষ করেছিল তা বর্ণনার চেষ্টা করত। যেহেতু যীশু যে এক ঈশ্বরের শিক্ষা দিয়েছিলেন তা তখন বিলুপ্ত হয়েছিল, তাই তারা শেষ পন্থা হিসেবে পটোনিক দর্শনের পরিভাষা ব্যবহার করতে শুরু করেছিল যদিও তা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। কার্যত এ-ই ছিল তাদের সব যা তারা জানত। যা হোক, এ বিষয়টি সামান্য কিছু লোকের কাছেই স্পষ্ট ছিল। এপুলিয়াস (Apuleius) লিখেছেন, “আমি নীরবে এই মহিমান্বিত ও প্লাটোনিক মতবাদ উপেক্ষা করেছিলাম। কারণ, সামান্য কিছু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিই এটা বুঝেছিলেন, অন্যদিকে প্রতিটি সাধারণ মানুষের কাছেই তা অজ্ঞাত ছিল।”[২৪] প্লাটো বলেন, “স্রষ্টাকে

খোঁজা কঠিন, কিন্তু নিম্নশ্রেণির লোকদের কাছে তা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।”[২৫] পিথাগোরাস বলেন, “কু-সংস্কারাচ্ছন্ন মতের মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কথা বলা নিরাপদ নয়। তাদের কাছে সত্য বা মিথ্যা বলা সমান বিপজ্জনক।”[২৬]

যারা এক ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন তাদের কারো কারো কাছে যদিও এ পরিভাষার ব্যবহার যৌক্তিক বলেই গণ্য ছিল, কিন্তু কার্যত এ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এমন কোনো পন্থা ছিল না যাতে ‘দেবতাগণ’ এর গ্রীক ধারণা যীশুর কাছে প্রত্যাদেশকৃত ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে সফলভাবে খর্ব করতে পারে। এ ধরনের কোনো ঘটনা শুধুমাত্র পল ও তার অনুসারীদের পক্ষেই কল্পনা করা সম্ভব ছিল। যারা গ্রীক দর্শনের আদর্শ হৃদয়ংগম করতে পারে নি তাদের মধ্যে শুধু বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি হয়েছিল। আসলে ত্রিত্ববাদের সংস্পর্শে যারা এসেছিল, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অবস্থাই ছিল এ রকম। তারা যে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিল তা নানা জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি করেছিল। সভা নিজে থেকেই তাদের সুস্পষ্টভাবে এ পথে ঠেলে দিয়েছিল। এ মতবাদ কীভাবে উদ্ভূত এবং কেন তা গৃহীত হলো, কি করে অনানুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হলো, তা বোধগম্য। এটাও পরিষ্কার যে, এ মতবাদের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির প্রেক্ষিতে আরিয়াস কেন পথ নির্দেশনার জন্য গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তাধারার আশ্রয় নেয়ার বদলে খৃষ্টান ধর্মের উৎসের কাছে ফিরে যাবার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। কারণ, গ্রীক দর্শন নবী যীশুর ওপর প্রত্যাদেশ থেকে উদ্ভূত ছিল না।

নিসিয়ার সভায় এ সব পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল যীশুর শিক্ষা থেকে সরে আসা। সেটাও সম্ভব হয়েছিল। আজ যা নিসীয় ধর্মমত (Nicene Creed) নামে পরিচিত তা সম্রাট কনস্টানটাইনের সমর্থনে সভায় উপস্থিতদের দ্বারা প্রণীত ও সত্যায়িত। এতে ত্রিত্ববাদীদের মতই স্থান পেয়েছিল এবং আরিয়াসের শিক্ষার সরাসরি প্রত্যাখ্যান হিসেবে নিম্নোক্ত দৈব অভিশাপ সংযুক্ত করা হয়েছিল।

যারা বলে, "এক সময় তিনি ছিলেন না এবং জন্মের পূর্বে তিনি অস্তিত্বশীল ছিলেন না এবং তিনি কোনো কিছু থেকে অস্তিত্বশীল হন নি" অথবা যারা বলে যে, ঈশ্বরের পুত্র ভিন্ন সত্ত্বা বা উপাদান অথবা তিনি সৃষ্ট হয়েছেন অথবা পরিবর্তনের উপযোগী- তাদের জন্য ক্যাথলিক চার্চের অভিশাপ।

যারা এ ধর্মমতে স্বাক্ষর করেছিলেন, তাদের কেউ কেউ এতে বিশ্বাসী ছিলেন, কেউ কেউ জানতেন না যে, কি সে তারা তাদের নাম স্বাক্ষর করেছেন এবং কিছু ব্যক্তি, যারা সভার প্রতিনিধিদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন, তারা ত্রিত্ববাদের সাথে একমত হতে পারেন নি, কিন্তু তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্রাটকে খুশি করার জন্য এতে স্বাক্ষর করেন। তাদের একজন বলেন, "একটু কালির বিনিময়ে প্রাণ রক্ষা মোটেই খারাপ নয়।" এ বক্তব্য প্রসঙ্গে প্রফেসর গোয়াটকিন (Gwatkin) দুঃখ করে বলেছেন যে, একজন ঐতিহাসিকের জন্য এটি কোনো আনন্দদায়ক দৃশ্য ছিল না। হয়তো ঘটনা এ রকমই ছিল বলে প্রফেসর গোয়াটকিন

একজন ঐতিহাসিক হিসেবে তা লেখেননি, তিনি পালন করেছেন একজন আইনজীবীর ভূমিকা যিনি একটি দুর্বল মামলা পরিচালনার জন্য গ্রহণ করেছেন।

এরাই ছিল সে সব লোক যারা একজন পৌত্তলিক সম্রাটের অধীনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, একজন গোঁড়া খৃষ্টানের পরীক্ষা কী হবে? এর ফল ত্রিত্ববাদীদের জন্য যেমন তেমনি আরিয়াসপন্থীদের জন্যও অত্যন্ত বিস্ময়কর হয়েছিল। ঘটনা কোনো দিকে মোড় নেবে তা কারোরই জানা ছিল না। সার্বজনীন পরীক্ষা গ্রহণের ধারণাটি ছিল এক বিপ্লবিক পরিবর্তন। কেউই তা পছন্দ করে নি। তদুপরি আরিয়াসবাদের সরাসরি নিন্দা ছিল এক মারাত্মক পদক্ষেপ। এমনকি যারা ধর্মমতের সত্যায়নে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিল তারাও সন্দেহের সাথেই তা করেছিল। পবিত্র গ্রন্থে ছিল না এবং যীশু বা তার শিষ্যদের দ্বারা ব্যক্ত বা উল্লেখিত নয়, এমন একটি শব্দের সমর্থনে স্বাক্ষর করতে হয়েছে। বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে তোড়জোড় করে যে সভার আয়োজন করা হয়েছিল বাস্তবে তা কিছু অর্জন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

একজন মাত্র ব্যক্তি জানতেন যে, তিনি কী করছেন। তিনি হলেন সম্রাট কনস্টানটাইন। তিনি জানতেন যে দৃঢ় বিশ্বাস নয়, ভোটের ওপর ভিত্তি করে দাঁড় করানো একটি ধর্মমতকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হবে না। কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু তাকে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত নাও করতে পারে। তিনি জানতেন কীভাবে ও কেন বিশপগণ ধর্মমতের ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছেন। তিনি বিশপদের

তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করেছেন এমন ধারণা সৃষ্টি না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সভার সিদ্ধান্তের প্রতি ঈশ্বরের সমর্থন ও অনুমোদন প্রমাণের জন্য ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতার আশ্রয় নেওয়া হবে। সভার শুরুতে এনে জড়ো করা যীশুর শিক্ষার লিখিত বিবরণ গসপেলের বিশাল স্তূপ তখনও সভাকক্ষের মধ্যখানে রাখা ছিল। একটি সূত্র মতে, সেখানে সে সময়ে ২৭০টি গসপেল রাখা ছিল। অন্য একটি সূত্র মতে বিভিন্ন ধরনের গসপেলের সংখ্যা ছিল ৪০০০ এর মতো। যদি সেগুলোর সংখ্যা একেবারেই কমিয়ে ধরা হয় তাহলেও কোনো শিক্ষিত খৃষ্টানের জন্য সে সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। গসপেলে খুঁজে পাওয়া যায় না এমন সব ধারণা সম্বলিত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে গসপেলের সাথে সরাসরি বিরোধমূলক একটি ধর্মীয় মতবাদ প্রণয়ন ও প্রচলন কিছু লোককে যেমন বিভ্রান্ত করেছিল অন্যদিকে গসপেলসমূহের বিদ্যমানতা অন্যদের জন্য খুবই অসুবিধাজনক ছিল।

এ প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সকল গসপেল সভাকক্ষে একটি টেবিলের নীচে রাখা হবে। তার পর সকলেই কক্ষ ত্যাগ করে এবং তা তালাবদ্ধ করা হয়। এখন যে গসপেলটি সঠিক সেটা যাতে টেবিলের ওপর চলে আসে তার জন্য সারারাত ধরে প্রার্থনা করার জন্য বিশপদের নির্দেশ দেওয়া হয়। সকাল বেলা দেখা গেল, আলেকজান্ডারের প্রতিনিধি এথানাসিয়াসের কাছে গ্রহণযোগ্য গসপেলটি টেবিলের ওপর স্থাপিত রয়েছে। এ ঘটনায় টেবিলের নীচে থাকা অন্যান্য সকল গসপেল পুড়িয়ে

ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে সেই রাতে সভাকক্ষের তালার চাবি কার কাছে ছিল সে ব্যাপারে কিছু জানা যায় না।

এরপর অননুমোদিত গসপেল কাছে রাখা গুরুতর অপরাধে পরিণত হয়। এর পরিণতিতে পরবর্তী বছরগুলোতে ১০ লাখেরও বেশি খৃষ্টান নিহত হয়। এথানাসিয়াস যে কীভাবে খৃষ্টানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন, এ থেকেই তা বুঝা যায়।

নিসিয়ির সভা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বিশপগণ তাদের পুরোনো বিরোধকে জাগিয়ে তুললেন যা তারা সম্রাট কর্তৃক আহূত হয়ে পরিত্যাগ করেছিলেন। লড়াই শুরু হয়, পুরোনো বিরোধ চলতেই থাকে। তারা যে নিসিয়ার সভায় ধর্মমতে স্বাক্ষর করেছেন, সে কথা বিস্মিত হলেন। আরিয়াসের সমর্থকরা নিসিয়ার ধর্মমতকে প্রকৃত খৃষ্টান ধর্মের সমর্থক বলে বিবেচনা করেন না, সে কথা গোপন করলেন না। একমাত্র এথানাসিয়াসই (Athanasius) সম্ভবত এ নয়া ধর্মমতের প্রতি অনুগত ছিলেন। কিন্তু তার সমর্থকদের মধ্যে এ নিয়ে সন্দেহ বিরাজ করছিল। অন্যদিকে পাশ্চাত্যে তা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

নিসিয়ার সভার ৩০ বছর পরও সাধু হিলারি (Saint Hillary) নিসীয় ধর্মমত সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন:

আমরা যাদের বিরোধী তাদের আমরা অভিশাপ দিচ্ছি। আমাদের মধ্যে অন্য কারো মতবাদ হোক অথবা অন্য কারো মধ্যে আমাদের মতবাদ হোক, আমরা তার নিন্দা করছি। এভাবে আমরা একে অপরকে ছিন্নভিন্ন করছি, আমরা অন্যের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি। নয়া বাইবেলের

গ্রীক থেকে ল্যাটিনে অনুবাদ বিশেষ করে পটোনিক দর্শনের গ্রীক শব্দগুলোর ক্ষেত্রে, যা চার্চ কর্তৃক পবিত্র উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, খৃষ্টান ধর্মের রহস্যগুলোকে প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। পবিত্র গ্রন্থে মৌখিক ভুলগুলো ল্যাটিন ধর্মতত্বে মারাত্মক রকম ভ্রান্তি বা জটিলতার সৃষ্টি করবে।[২৮]

থ্রেসের (Thrace) একজন বিশপ সাবিনাস (Sabinus) নিসিয়ায় সমবেত হওয়া সকল বিশপকে অজ্ঞ, স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন বলে আখ্যায়িত করেন। সেখানে যে ধর্ম বিশ্বাসের ঘোষণা দেওয়া হয় তাকে তিনি মূর্খ ব্যক্তিদের কাজ বলে উল্লেখ করে বলেন যে, এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। ঐতিহাসিক সক্রিটাস (Socritus) উভয় পক্ষকে রাতের অন্ধকারে একে অন্যের কথা বুঝতে না পেরে লড়াইরত সেনা দলের সাথে তুলনা করেছেন। ড. স্ট্যানলি লিখেছেন যে, এথানাসিয়াস বৃদ্ধ বয়সে ধর্মের আধুনিকায়নে যে আগ্রহ দেখিয়েছেন তা তিনি যদি তরুণ বয়সে প্রদর্শন করতেন তাহলে হয়তো ক্যাথলিক চার্চ বিভক্ত হত না, বহু রক্ত ক্ষয়ও হয়তো বা এড়ানো যেত। এভাবে নিসিয়ার সভা খৃষ্টান সম্প্রদায়গুলোর মধ্যকার বিরাট ব্যবধান কমিয়ে আনার পরিবর্তে তা আরো বাড়িয়ে তোলে। তাদের মধ্যে তিক্ততার অবসান তো ঘটলই না, বরং তা বৃদ্ধি পেল। চার্চের ক্রোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সকল যুক্তি ও কারণ বাদ দিয়ে তা শক্তি প্রয়োগের পথ গ্রহণ করে। এর পরিণতিতে আরিয়াসদের প্রথম বড় ধরনের রক্তপাত শুরু হয়। এ পন্থায় গথ (Goths) ও লমবার্ডরা (Lombards) ‘ধর্মান্তরিত’ হয়। ক্রুসেড যুদ্ধের ফল হিসাবে আশঙ্কাজনকভাবে প্রাণহানি ঘটতে থাকে।

ইউরোপে ত্রিশ বছর ধরে চলতে থাকা যুদ্ধে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, শুধু ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট নয়, চার্চকেও মান্য করতে হবে। এই সংস্কার চলাকালে পরিস্থিতি ছিল এমনই যে লুথারের (Luther) কর্মকাণ্ড মোটেই যীশুর প্রকৃত শিক্ষার দিকে ফিরে যাওয়ার লক্ষ্যে নয়, বরং তা নিছক এক ক্ষমতার লড়াই বলেই প্রমাণিত হয়।

৩২৫ খৃস্টাব্দে অব্যবহিত পরই যেসব ঘটনা ঘটেছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল বিশপ আলেকজান্ডারের পরলোকগমন। তিনি ৩২৮ খৃস্টাব্দে মারা যান। আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ নির্বাচন নিয়ে গোলযোগ দেখা দেয়। আরিয়াসপন্থী ও মেলেটিয়ান পন্থীরা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু এথানাসিয়াস বিশপ পড়ে প্রার্থী হিসেবে ঘোষিত, নির্বাচিত ও অভিষিক্ত হন। তার নির্বাচন ছিল বিতর্কিত। যারা তার নির্বাচিত হওয়ার বিরোধিতা করেছিল তারা তার বিরুদ্ধে নিপীড়ন, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এমনকি ভোজবাজি প্রদর্শনেরও অভিযোগ আনে।

এদিকে সম্রাট কনস্টানটাইনের দরবারে তার ঈশ্বরপ্রেমী বোন কনষ্টানটিনা খৃষ্টানদের হত্যাকান্ডের বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি যে আরিয়াসকেই সত্য খৃষ্টান ধর্মের প্রতিনিধি মনে করেন সে কথা কখনোই গোপন করার চেষ্টা করেন নি। তিনি নিকোমেডিয়ার ইউসেবিয়াসের প্রতি সম্রাটের আচরণেরও বিরোধিতা করেন। কনস্টানটাইন তাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পর কনস্টানটিনা সফল হন এবং ইউসেবিয়াসকে দেশে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়। এথানিয়াসের জন্য এটি ছিল এক মারাত্মক আঘাত। সম্রাট ধীরে ধীরে

আরিয়াসের প্রতি ঝুঁকে পড়তে শুরু করেন। যখন তিনি শুনলেন যে, আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ পদে এথানাসিয়াসের নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তখনি তিনি নয়া বিশপকে রাজধানীতে তলব করেন। কিন্তু এথানাসিয়াস ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে গেলেন না। ৩৩৫ খৃস্টাব্দে কনস্টানটাইনের রাজত্বের ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে টায়ার (Tyre) নগরীতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এথানাসিয়াস তাতে যোগ দিতে বাধ্য হন। তার বিরুদ্ধে রাজকীয় স্বৈরাচারের অভিযোগ আনা হয়। পরিস্থিতি তার এমনই প্রতিকূল ছিল যে, তিনি সভার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করেই সভাস্থল ত্যাগ করেন। তার নিন্দা করা হয়। বিশপগণ জেরুজালেমে সমবেত হন এবং তার নিন্দার বিষয়ে নিশ্চিত হন। আরিয়াসকে চার্চে ফিরিয়ে আনা হয় এবং তিনি ধর্মীয় প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠানের অনুমতি লাভ করেন।

আরিয়াস ও তার বন্ধু ইউজোয়াসকে সম্রাট কনস্টান্টিনোপলে আমন্ত্রণ জানান। আরিয়াস ও সম্রাটের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হলো। এরপর বিশপগণ পুনরায় আনুষ্ঠানিকভাবে এথানাসিয়াসের নিন্দা করেন। বেপরোয়া এথানাসিয়াস সিংহের গুহার মধ্যেই তার সম্মুখীন হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি কনস্টান্টিনোপলে চলে আসেন। সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাকে অনুমতি দেওয়া হলো। এ সময় নিকোমেডিয়ার ইউসেবিয়াস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে, নিসিয়ার সভার সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক কারণে আরিয়াসের বিপক্ষে গেছে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, ধর্মীয় বিতর্ক সম্রাট কোনোভাবেই বুঝতে পারবেন না। সুতরাং সে পথে না গিয়ে

তিনি রাজধানীতে শস্য সরবরাহে বাধা সৃষ্টির জন্য এথানাসিয়াসকে অভিযুক্ত করলেন। এই অভিনব অভিযোগে এথানাসিয়াস বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়েন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তিনি যে খেলায় দক্ষ সে খেলা দক্ষতার সাথে খেলতে পারার মতো অন্য লোকও আছে। অভিযোগ সহজেই প্রমাণিত হয় এবং এথানাসিয়াসকে গল (Gaul) প্রদেশের ট্রায়ারে (Trier) প্রেরণ করা হয়। আরিয়াস কনস্টান্টিনোপলের বিশপ নিযুক্ত হন। কিন্তু এর কিছুদিন পরই ৩৩৬ খৃস্টাব্দে বিষ প্রয়োগের ফলে তিনি মারা যান। চার্চ একে অলৌকিক ঘটনা বলে আখ্যায়িত করলেও সম্রাট তা হত্যাকান্ড বলে সন্দেহ করলেন। তিনি এ মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে একটি কমিশন গঠন করেন। রহস্যজনক পন্থায় তদন্ত কাজ চলে। এথানাসিয়াস এ হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী বলে প্রমাণিত হয়। ফলে আরিয়াসকে হত্যার জন্য এথানাসিয়াসকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

আরিয়াসের মৃত্যুর ঘটনায় সম্রাট প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন। উপরন্তু বোনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করেন। নিকোমেডিয়ার ইউসেবিয়াস তাকে দীক্ষিত করেন। এর মাত্র এক বছর পর ৩৩৭ খৃস্টাব্দে সম্রাট মারা যান। এভাবে যিনি তার রাজত্বের অধিকাংশ সময় একত্ববাদের সমর্থকদের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছিলেন, তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তার হাতে যারা নিহত হয়েছিল তাদেরই ধর্ম গ্রহণ করে মারা যান।

খৃষ্টধর্মের ইতিহাসে আরিয়াস এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কনস্টানটাইনের খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণের পিছনে তিনি যে বড় ভূমিকা পালন

করেন শুধু তাই নয়, যারা যীশুর প্রদর্শিত সত্য পথ খোলাখুলি অনুসরণে সচেষ্ট ছিল তিনি তাদেরও প্রতিনিধি ছিলেন। যখন যীশুর শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছিল, যখন প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত মানুষ হিসেবে যীশুর স্মৃতি ঝাপসা হয়ে উঠছিল, আরিয়াস তখন অটল পাহাড়ের দৃঢ়তা নিয়ে তার মোকাবেলা করেন এবং কোনো ঘটনাই তাকে তার ভূমিকা থেকে এক চুলও টলাতে পারে নি।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর মাত্র একজনই এবং এ বিশ্বাস ছিল খুবই সহজ-সরল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর কারো সৃষ্ট নন, তিনি চিরন্তন, তার কোনো শুরু নেই, তিনি সর্বোত্তম, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি অপরিবর্তনীয়, তার কোনো বিকৃতি নেই এবং তার সত্ত্বা প্রতিটি সৃষ্ট প্রাণীর বর্হিমুখী দৃষ্টি থেকে এক চিরন্তন রহস্যের মধ্যে ঢাকা। তিনি ঈশ্বরের প্রতি মানবিকত্ব আরোপের যে কোনো ধারণার বিরোধী ছিলেন।

আরিয়াস সুস্পষ্টভাবে যীশুর শিক্ষা অনুসরণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ঈশ্বরের পৃথক সত্ত্বা ও তার একত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ প্রতিটি গুণের প্রকাশ তার মধ্যে ঘটুক, এটাই তিনি কায়মনোবাক্যে চাইতেন। কিন্তু বহু- ঈশ্বরের কোনো প্রকার ধারণার সাথে তিনি আপোশ করেন নি। আর এ কারণেই তিনি যীশুকে ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণকারী যে কোনো মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য ছিলেন। যেহেতু ঈশ্বরের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, তিনি কারো দ্বারা কখনোই সৃষ্ট নন। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই কোনো ধারণায়ই ঈশ্বরের কোনো সন্তান থাকতে পারে না।

তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন, ঈশ্বরের ওপর যদি সন্তান জন্মদানের কার্য আরোপ করা হয় তাহলে তা তার একত্বকে ধ্বংস করে। এ ছাড়া তা ঈশ্বরের ওপর শারীরিক অস্তিত্ব ও আবেগও আরোপ করে যা শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই আরোপযোগ্য। উপরন্তু তা ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তার কথাও বুঝায় যা তার নেই। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই ঈশ্বরের ওপর জন্মদানের কার্য আরোপ করা সম্ভব নয়।

আরিয়াস আরো বলেন যে যেহেতু যীশু ছিলেন সীমাবদ্ধ সে কারণে তিনি ঈশ্বর নন, অন্যকিছু, কারণ ঈশ্বর চিরন্তন। এমন একটি সময় ছিল যখন যীশুর অস্তিত্ব ছিল না, যা থেকে পুনরায় প্রতীয়মান হয় যে, যীশু ঈশ্বর ছাড়া অন্যকিছু। যীশু ঈশ্বরের সত্ত্বা নন, তিনি ঈশ্বরের এক সৃষ্টি, অবশ্যই অন্যান্য সৃষ্ট মানুষের মতই, তবে নবী হওয়ার কারণে মানুষদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে অনন্য। ঐশ্বরিক সত্ত্বার অংশীদার তিনি নন, তিনি পরিচালিত হতেন ঐশী নির্দেশে। তিনি অবশ্যই অন্যান্য সৃষ্টির মত ঈশ্বরের করুণা ও সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, পক্ষান্তরে ঈশ্বর কোনো কিছুর ওপরই নির্ভরশীল নন। সকল মানুষের মত তারও ছিল স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বভাব যা তাকে ঈশ্বরের কাছে সন্তোষজনক বা অসন্তোষজনক কর্ম সম্পাদনে ক্ষমতা দিয়েছিল। যদিও ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন এমন কাজ করার ক্ষমতা যীশুর ছিল, কিন্তু তার নৈতিক শুদ্ধতাই তাকে সেরকম কিছু করা থেকে বিরত রেখেছিল।

আরিয়াসের ধর্ম বিশ্বাসের এই মৌলিক মতবাদগুলো এখন পর্যন্ত টিকে আছে এবং বহু একত্ববাদী খৃষ্টানের ধর্ম বিশ্বাসের তা মূল ভিত্তি।

৩৩৭ খৃস্টাব্দে সম্রাট কনস্টানটাইনের মৃত্যুর পর পর পরবর্তী সম্রাট কনষ্টানটিয়াসও আরিয়াসের ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন এবং একত্ববাদে বিশ্বাসই গোঁড়া খৃষ্টান ধর্ম হিসেবে সরকারীভাবে গৃহীত হওয়া অব্যাহত ছিল। ৩৪১ খৃস্টাব্দে এন্টিওকে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে একত্ববাদই খৃষ্টান ধর্মের প্রকৃত ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয়। ৩৫১ খৃস্টাব্দে সিরমিয়ামে অনুষ্ঠিত আরেকটি সম্মেলনে তৎকালীন সম্রাটের উপস্থিতিতে পুনরায় পূর্বের সিদ্ধান্তকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়। এভাবে আরিয়াস যে শিক্ষা ধারণ করেছিলেন তাই খৃষ্টান সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগ্রহণ করে। সাধু জেরোম ৩৫৯ খৃস্টাব্দে লিখেছিলেন যে, "সারা বিশ্বই নিজেকে আরিয়াসের ধর্মমতের অনুসারী হিসেবে দেখতে পেয়ে বেদনার্ত ও বিস্মিত হয়েছিল।[২৯] এর পরবর্তী বছরগুলোতে ত্রিত্ববাদীদের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ৩৮১ খৃস্টাব্দে কনস্টানটিনোপলে সম্রাটের সরকারী ধর্ম হিসেবে আরিয়াসের ধর্মমতের কথাই ঘোষণা করা হয়। যা হোক, পাশ্চাত্যে খৃষ্টধর্মের ভিত্তি হিসেবে ত্রিত্ববাদ ধীরে ধীরে গৃহীত হতে থাকে। বিভিন্ন 'সভার' বৈঠকের বিষয় ও গৃহীত 'সরকারী' প্রস্তাবমালা থেকে দেখা যায় যে পাশ্চাত্যের গোঁড়া খৃষ্টান সমাজ যীশুর শিক্ষা থেকে কতখানি দূরে সরে গিয়েছিল। যীশু নিজে কখনোই এ ধরনের সংস্থা গঠন করেন নি যা শাসকদের রাজ-দরবারগুলোতে সাধারণত দেখা যেত।

৩৮৭ খৃস্টাব্দে জেরোম তার বিখ্যাত ল্যাটিন বাইবেল (Vulgate Bible) অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেন। মূল হিব্রু থেকে গ্রীক ভাষায় যেসব ধর্মগ্রন্থ অনুদিত হয়েছিল, তারই কয়েকটির প্রথম ল্যাটিন অনুবাদ ছিল

জেরোমের বাইবেল। এখন যা ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে পরিচিত, সেটিও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যান্য ভাষায় যেসব বাইবেল অনুবাদ করা হয়, জেরোমের বাইবেল সেগুলোর ভিত্তি হিসেবে পরিণত হয়। এই বাইবেলেই রোমান ক্যাথলিক এবং পরে প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ কর্তৃক সরকারী ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গৃহীত হয়। আর যখন তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তখন জেরোমের সংকলনে ছিল না এমন সকল গসপেল ও পবিত্র গ্রন্থ এ দু'টি চার্চ কর্তৃক আগে বা পরে প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা হয়। এভাবে প্রকৃত যীশুর সাথে সকল সংযোগ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হওয়া অব্যাহত থাকে।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন পোপ অনারিয়াস (Honorius) মহানবী মুহাম্মাদ স. এর সমসাময়িক এ ব্যক্তিটি ইসলামের উত্থানের জোয়ার প্রত্যক্ষ করেন যার সাথে আরিয়াসের ধর্মমতের বিপুল সাদৃশ্য ছিল। খৃষ্টানদের পারস্পরিক হানাহানি তার মনে তখনও তরতাজা স্মৃতি হিসেবে জাগরূক চিল। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে, ইসলাম সম্পর্কে তিনি যা শুনেছেন তা খৃষ্টানদের মধ্যকার বিভেদ দূর করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। তিনি তার পত্রগুলোতে ত্রিত্ববাদের মধ্যে 'এক মন' (One mind)- এর মতবাদ সমর্থন করতে শুরু করেন। তিনি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। যুক্তির উপসংহারে তিনি এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেন।

৪৫১ খৃস্টাব্দে চ্যালসিডনের সভা ঘোষণা করেছিল যে, খৃষ্টের স্বভাব অবিভাজ্য। এ সিদ্ধান্ত অনারিয়াসকে খৃষ্টের 'এক মন' সংক্রান্ত তার

মতের ব্যাপারে উৎসাহিত করে তোলে। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, খৃষ্ট আদি পাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত একজন মানুষের রূপ ধারণ করেছিলেন। এই মত অনুযায়ী খৃষ্টের একটি মানবিক ইচ্ছা ছিল। এভাবে পলীয় খৃষ্টানধর্মের মধ্যেই পরোক্ষভাবে এক ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে সমর্থন করা হয়। পলের উদ্ভাবিত ধর্মমত কতটা জেঁকে বসেছিল ও জন-মানসকে বিভ্রান্ত করেছিল, এ ধরনের বৈপরীত্য থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। পোপ অনারিয়াস ৬৩৮ সনে পরলোকগমন করেন। একই বছর সম্রাট হেরাক্লিয়াস অনারিয়াসের ধর্মমতকে সরকারীভাবে গ্রহণ করেন এবং তিনি এক ফরমান জারি করেন এই বলে যে, "সম্রাটের সকল প্রজাকেই যীশুর এক মনের কথা স্বীকার করতে হবে।"[৩০] ৬৩৮ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কনস্টান্টিনোপলের যাজকসভায় অনারিয়াসের ধর্মমতকে "যীশুর শিষ্যদের প্রচারিত শিক্ষার সাথে প্রকৃত সংগতিপূর্ণ" আখ্যায়িত করে সমর্থন জানানো হয়।[৩১] আরিয়াসের মতবাদ প্রায় অর্ধ শতক পর্যন্ত কোনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় নি। ৬৮০ খৃস্টাব্দে তার মৃত্যুর ৪২ বছর পর কনস্টান্টিনোপলে এক যাজক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে পোপ অনারিয়াসকে অভিশাপ দেওয়া হয় এ কারণে যে, তিনি "ধর্ম বিরোধী শিক্ষার আগুনকে শুরুতেই নির্বাপিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাকে আরো বিস্তার লাভ করতে দিয়েছেন" এবং তারপর "পবিত্র ধর্মকে কলঙ্কিত হতে দিয়েছেন।"[৩২] চার্চের সমর্থনে একজন পোপকে তার উত্তরসূরি কর্তৃক নিন্দা করা পোপীয় ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা।

এরপর পলীয় চার্চ অথবা রোমান ক্যাথলিক চার্চ অনুসারীদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। এর বড় কারণ ছিল রোমান সম্রাটদের সাথে চার্চের সম্পৃক্ততা। পোপ ও যাজকেরা শাসকদের সাথে যত বেশি হাত মেলালেন ততই চার্চ ও শাসকেরা অভিন্ন হয়ে উঠতে থাকল। অষ্টম শতাব্দীতে রোমন ক্যাথলিক চার্চ জেরুজালেম নয়, রোমকে সদর দফতর করে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রোম নগরীর ভিতরে ও বাইরে বিপুল পরিমাণ ভূমি ও সম্পদ চার্চের হস্তগত হয়। এ সম্পদ সম্রাট "কনস্টানটাইনের দান" হিসেবে পরিচিত ছিল।

রোমান ক্যাথলিক চার্চের মতের বিরোধিতা করা বিপজ্জনক ছিল। কারণ চার্চের নিজস্ব ক্ষমতার পাশাপাশি ছিল সেনা বাহিনীর সমর্থন। ৩২৫ সনের পর ক্যাথলিক চার্চের ধর্মমত গ্রহণ না করা ১০ লাখেরও বেশি খৃষ্টানকে হত্যা করা হয়। কার্যত এই ছিল এক অন্ধকার যুগ বা কালো অধ্যায়। এ সময় প্রকাশ্যে একত্ববাদের প্রতি সমর্থন প্রকাশের সাহস ইউরোপে খুব কম লোকেরই ছিল।

ক্যাথলিক চার্চ যখন ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণকারীদের "ধর্ম বিরোধী" আখ্যা দিয়ে তাদের নির্মূল করতে ব্যস্ত ছিল, ততদিনে মুসলিমরা খৃষ্টান জগতে তাদের পরিচিতি বিস্তার করতে শুরু করেছিল। উত্তর আফ্রিকার প্রায় সকল যীশু অনুসারীই ইসলামকে তাদের প্রভূর তরফ থেকে পুনঃবার্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল যা সরাসরি তাদের

ধর্মকে অনুসরণ ও অতিক্রম করে গিয়েছিল। তারা ইসলাম গ্রহণ করল। ফলে শুধু ইউরোপেই খৃষ্টান ধর্ম বহাল রইল।

ভ্যাটিকানের নেতৃবৃন্দ অবশ্যই ইসলাম এবং আরিয়াসের প্রচারিত একত্ববাদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। উভয়েই বিশ্বাসী ছিল এক স্রষ্টায়- ইসলামের ভাষায় এক আল্লাহ এবং আরিয়াসের ভাষায় এক ঈশ্বরে। উভয়ের কাছেই যীশু ছিলেন একজন নবী। আরিয়াসের ভাষায় যিনি যীশু ইসলামের ভাষায় তিনি ঈসা আলাইহিস সালাম উভয়ের কাছেই তিনি ছিলেন একজন মানুষ। ইসলাম ও আরিয়াস উভয়েই মেরীকে কুমারী বলেছে এবং যীশুর পবিত্রতায় উভয়েই বিশ্বাসী। উভয় ধর্মেই পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করা হয়েছে। উভয়েই যীশুর ওপর ঈশ্বরত্ব আরোপকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং আরিয়াসের প্রতি যে ঘৃণা পলীয় চার্চ পোষণ করছিল এখন তার লক্ষ্য হলো মুসলিমরা। এদিক থেকে দেখলে চার্চের ইতিহাসে ক্রুসেডগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় ছিল না, বরং পলীয় চার্চ ক্রুসেডকে আরিয়াসপন্থীদের গণহত্যার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে।

এ সময়কালে চার্চ তার অভ্যন্তরে যে কোনো বিরোধিতাই হোক না কেন, উপেক্ষা করত না। চার্চের প্রতিষ্ঠিত মতবাদ থেকে যে কোনো ধরনের বিচ্যুতি বা ভিন্নমত তদন্ত করে দেখা ও তা নির্মূলের জন্য ‘তদন্ত ও জেরা’ নামে একটি সংস্থা (Inquisition) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সংস্থা কর্তৃক কত লোককে যে হত্যা করা হয়েছিল তার প্রকৃত সংখ্যা

জানা যায় না। তবে নিশ্চিতভাবে বিপুল সংখ্যক লোক তাদের শিকার হয়ে নির্মূল হয়েছিল।

সংস্কারের (Reformation) ঘটনাবলি এবং পাশাপাশি প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের প্রতিষ্ঠার কারণে ত্রিত্ববাদ আরো দৃঢ় হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় যদিও "কনস্টানটাইনের দান" শীর্ষক দলিলের বৈধতা নিয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে তীব্র বিরোধিতা ছিল। কিছু পণ্ডিত এ দলীলটি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করেন এবং এটি জাল ছিল বলে দেখতে পান। তখন থেকে ভ্যাটিকান এ দলিল সম্পর্কে দম্ভোক্তি বন্ধ করে। প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে বিখ্যাত ৩০ বছরের যুদ্ধ (Thirty Year War) থেকে প্রমাণিত হয় যে, যীশুর প্রকৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠা করা এ যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল না। আরিয়াসের অনুসারীগণ ও পরে মুসলিমদের প্রতি পলীয় চার্চের আগ্রাসী নীতি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, চার্চ যা চেয়েছিল তা হলো ক্ষমতা। এই তিনটি ঘটনার সবকটিতেই চার্চ প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার নিজের অস্তিত্ব ও ক্ষমতা রাখার জন্যই লড়াই করেছে, যীশুর শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে নয়।

ইসলামের বিস্তার অব্যাহত থাকার প্রেক্ষিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে মুসলিমদেরকে আক্রমণের এক মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ পরিকল্পনায় তারা ভারতের একজন কিংবদন্তির খৃষ্টান রাজার বাহিনীর সাথে যোগ দেওয়ার এবং তার সাহায্যে সারা বিশ্ব জয় করার আশা করেছিল। ভারতে পৌঁছার প্রচেষ্টায় কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন এবং ভাস্কোডাগামা ভারতে যাওয়ার নতুন পথ খুঁজে পান। এ দু'টি

আবিষ্কারই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়। খৃষ্টানরা ভারতের কিংবদন্তির রাজাকে আবিষ্কার করে নি বা তারা ইসলামকেও নির্মূল করতে পারে নি। কিন্তু তারা বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল এবং ফলশ্রুতিতে তাদের নেতৃবৃন্দ ও বণিকরা অত্যন্ত সম্পদশালী হয়ে ওঠে।

রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট চার্চের প্রচণ্ড ক্ষমতা সত্ত্বেও তারা একত্ববাদে বিশ্বাসকে নির্মূল করতে ব্যর্থ হয়েছে। একে আরিয়াসবাদ অথবা সোকিয়ানবাদ (Sociamsim) অথবা একত্ববাদ (Unitariansim) যাই বলা হোকনা কেন, খৃষ্টানদের সকল দমন-নিপীড়নের মধ্যেও আজ পর্যন্ত টিকে আছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত স্পষ্টভাষী একত্ববাদীদের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি থেকে তার প্রমাণ মিলবে।

## সপ্তম অধ্যায়

## খৃষ্টধর্মের পরবর্তী একত্ববাদীগণ

### মাইকেল সারভেটাস (Michael Servetus) ১৫১১-১৫৫৩ খৃস্টাব্দ

১৫১১ সালে স্পেনের ভিলাবুয়েভায় মাইকেল সারভেটাস জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন স্থানীয় একজন বিচারক। তিনি এমন এক সময়ে বাস করতেন যখন প্রতিষ্ঠিত গির্জায় অসন্তোষ বিরাজ করছিল এবং প্রত্যেকেই খৃষ্টান ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করছিল। ১৫১৭ সালে সারভেটাস যখন ৬ বছরের বালক, তখন মার্টিন লুথার রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এর ফল হলো এই যে, তিনি বহিষ্কৃত হলেন এবং নয়া সংস্কারকৃত প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের একজন নেতায় পরিণত হলেন। এ আন্দোলন, যা আজ সংস্কার সাধন (Reformation) নামে পরিচিতি, তা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। যারা মার্টিন লুথারের (Martin Luther) সাথে একমত ছিল না তারাও এ আন্দোলনে যোগ দিতে বাধ্য হয়। এ সংঘাতের পাশাপাশি স্পেনে আরেকটি ঘটনা ঘটে। অতীতে স্পেনের মুসলিম ও খৃষ্টানদের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক থাকলেও প্রাচ্যে ক্রুসেডের কারণে খৃষ্টানদের ক্রোধের শিকারে পরিণত হয় স্পেনের মুসলিমরা। স্পেনীয় ধর্মবিচার সভা (Spanish Inquisition) নির্দেশ জারি করে যে যারা খৃষ্টান নয় তাদের রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে। চার্চের রীতি-নীতি অনুসরণে শিথিলতার পরিণতি দাঁড়াল হয় মৃত্যু না হয় কঠোর শাস্তি।

আরো বড় হয়ে এবং অধিক জানার পর তরুণ সারভেটাস এত রক্তপাতে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। দেশে বিপুল সংখ্যক মুসলিম ও ইয়াহূদী ছিল। প্রকাশ্যে রোমন ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ এবং ত্রিত্ববাদের ফরমুলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশই ছিল তরবারির আঘাত থেকে তাদের জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। আরো গভীরভাবে বাইবেল অধ্যয়ন ও পরীক্ষার পর সবিস্ময়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, বাইবেলের শিক্ষার অংশ হিসেবে কোথাও ত্রিত্ববাদ নেই। তিনি আরো আবিষ্কার করলেন যে, চার্চ যা শিক্ষা দিচ্ছে বাইবেল সব ক্ষেত্রে তা সমর্থন করে না। তার বয়স যখন ২০ বছর তখন সারভেটাস সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি যা খুঁজে পেয়েছেন বিশ্বকে সে সত্য জানাবেন। তিনি পরে আরো আবিষ্কার করেন যে, খৃষ্টানরা যদি মেনে নেয় যে, ঈশ্বর মাত্র একজনই, তাহলে খৃষ্টান ও মুসলিমদের মধ্যে বিরোধের অবসান হবে এবং উভয় সম্প্রদায় একত্রে শান্তিতে বাস করতে পারবে। এই সংবেদনশীল অনভিজ্ঞ তরুণ তার অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে উপলব্ধি করলেন যে, খৃষ্টান-মুসলিম সংঘাতের অবসানের লক্ষ্য সহজেই অর্জিত হওয়া সম্ভব যদি সংস্কারে নেতাদের সাহায্য পাওয়া যায়। কারণ তারা ইতিমধ্যেই ক্যাথলিক চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তার বিশ্বাস জন্মেছিল যে, নয়া প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চগুলো একত্ববাদী হবে এবং তাদের সাহায্যে খৃষ্টান, ইয়াহূদী ও মুসলিমরা একত্রে শান্তিতে বাস করতে সক্ষম হবে। মানব পরিবারের “পিতা” এক ঈশ্বরের ভিত্তিতে একটি সহনশীল বিশ্ব একটি সম্ভাব্য বিষয় হয়ে উঠবে।

সংস্কার নেতাদের মন ও মানস তখনও যে সেই একই মিথ্যা অধিবিদ্যার ফাঁদে আটকা পড়ে আছে, তা উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সারভেটাস খুব বেশি তরুন ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, ঈশ্বরের একত্বে তার বিশ্বাসের ব্যাপারে লুথার ও ক্যালভিনের কোনোই সম্পর্ক নেই। সংস্কার আন্দোলন সুদূর প্রসারী হওয়ার ব্যাপারে তারা শঙ্কিত ছিলেন। ক্যাথলিক চার্চের বেশ কিছু অনুষ্ঠান বিলুপ্ত করা হয়, কিন্তু তারা যীশুর আসল শিক্ষার পুনরাবিষ্কারে ভীত ছিলেন। কারণ তা করলে তাদের জন্য আরো সমস্যা দেখা দিতে পারত এবং তাদের নিজস্ব ক্ষমতা ও খ্যাতি বিলুপ্ত হতে পারত। সম্ভবত তারা উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, রোমান-ক্যাথলিকদের আচার-আচরণ যিশুখ্রিস্টের জীবনাচারণ থেকে কত দূরে সরে গিয়েছিল। তারা সংস্কারকৃত ধর্মকে সনাতন ক্যাথলিক ধর্মের কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাদের বিবাদ ছিল রোমের ধর্মতত্ত্বের সাথে নয়, তার সংস্থাগুলোর সাথে এবং নির্দিষ্টভাবে কে চার্চকে শাসন করবে, সে ব্যাপারে। সারভেটাসের বিশ্বাস এ দু'টি সংস্থার প্রতি হুমকি হয়ে উঠেছিল। আর সে কারণেই সংস্কারবাদীদের প্রতি তার আবেদন তাদের নিজস্ব অভিন্ন স্বার্থরক্ষার স্বার্থে ক্যাথলিক চার্চের সাথে তাদের যোগদানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর কিছুই তরুণ সারভেটাসের পূর্ণ গোচরে আসে নি।

সংস্কার নেতাদের ব্যাপারে তিনি খুবই আশাবাদী ছিলেন। তার বিশ্বাস ছিল যে, রোমান ক্যাথলিকবাদ যিশুখ্রিষ্টের ধর্ম নয়। তার অধ্যয়ন ত্রিত্ববাদে তার বিশ্বাস চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। এর ফল হয়েছিল এই যে, তিনি ঈশ্বর এক এবং যীশু তার একজন নবী, এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী

হয়ে উঠেছিলেন। পোপ কর্তৃক স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লসের অভিষেক উৎসবে যোগদান করার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। ১৫২৭ খৃস্টাব্দে চার্লস রোম আক্রমণ ও অধিকার করেন। প্রথমে তিনি পোপকে বন্দী করেন। কিন্তু তারপরই তিনি পোপকে একজন মিত্র করে তোলার দ্রুত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন, বন্দী অবস্থায় পোপের পক্ষে জনগণকে নিজের অনুকূলে প্রভাবিত করা সম্ভব ছিল না। সে কারণে তিনি পোপকে কিছুটা স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিলেন। তিনি পোপের দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সত্য বলতে কি, এর প্রয়োজন ছিল না। এটা ছিল সামাজিক বিবাহ অনুষ্ঠানের পর আবার গির্জায় গিয়ে বিবাহ করার মত। রাজার পূর্বসূরিরা এ প্রথা কেউ পালন করেছেন, কেউ করেন নি। কিন্তু পঞ্চাশ চার্লসের মনে হলো যে, তিনি এখন যথেষ্ট সক্তিশালী এবং পোপ যথেষ্ট দুর্বল। সুতরাং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। কিন্তু তা রোমে অনুষ্ঠিত হলো না। সাধারণের বিশ্বাস ছিল পোপ যেখানে রোমও সেখানে। রাজা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন বোলোনা (Bologna)-তে। সারভেটাস সেই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করলেন। ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে তার মন ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। এ ঘটনা বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন:

“নিজের চোখে আমি দেখলাম রাজপুত্রদের কাঁধে পোপের জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা। ক্রুশ চিহ্নের মতো তার হাত দু’টি আড়াআড়ি স্থাপিত। উন্মুক্ত রাস্তায় রাস্তায় ভক্তবৃন্দ এমনভাবে নতজানু হয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছিল যে, যারা তার পায়ের জুতা চুম্বন করতে

সক্ষম হচ্ছে তারা অবশিষ্টদের চেয়ে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছে এবং ঘোষণা করছে যে, তাদের বহু মনস্কামই পূর্ণ রয়েছে এবং এবার বহু বছরের জন্য তাদের নারকীয় যন্ত্রণার উপশম ঘটবে। হায়, ইতরতম প্রাণী, বারাঙ্গণার চেয়েও নির্লজ্জ!"[১]

এমতাবস্থায় সংস্কারের নেতারা সারভেটাসের আশাস্থল হয়ে উঠেন। সারভেটাস নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি যদি ত্রিত্ববাদের ভ্রান্তি সম্পর্কে তাদের বুঝাতে পারেন তাহলে তারা ঐ মতবাদে বিশ্বাস হারাবেন এবং তা ত্যাগ করবেন। এ ভুল ধারণার মাশুল তাকে দিতে হয় জীবন দিয়ে। তিনি স্পেন ত্যাগ করেন এবং তুলুজে (Toulouse) বসবাস করতে শুরু করেন। এখানেই তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ১৫৩৪ খৃস্টাব্দে ডাক্তারী ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি একজন কর্মজীবী চিকিৎসকে পরিণত হন। কিন্তু এ সম্পূর্ণ সময় প্রকৃত খৃষ্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠার দিকেই তার আগ্রহ নিবদ্ধ ছিল। কোনো স্থানে দীর্ঘদিন থাকা তার স্বাভাব্যে ছিল না। তিনি দূর- দূরান্ত ঘুরে সেসব মুক্তমনা লোকদের খুঁজে ফিরতেন যারা যীশু প্রচারিত প্রকৃত খৃষ্ট ধর্মের কথা শুনবে।

তিনি সংস্কারবাদীদের বিখ্যাত নেতা ওয়েকলোমপাডিয়াসের (Oeclompadius) সাথে সাক্ষাতের জন্য বাসল (Basle) গমন করেন। তার সাথে সারভেটাসের বেশ কয়েকবার বৈঠক হয়। তাদের আলোচনা প্রধানত খৃষ্ট ধর্মের দু'টি রূপের ব্যাপারেই কেন্দ্রীভূত ছিল। বিশ্ব সৃষ্টির আগেই যিশুখ্রিস্টের অস্তিত্ব ছিল, সারভেটাস এ বিশ্বাস বা ধারণা

প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, ইয়াহূদী নবীরা সর্বদাই "ঈশ্বরের পুত্র" সম্পর্কে কথা বলার সময় ভবিষ্যৎকাল ব্যবহার করেছেন। যা হোক, তিনি দেখতে পেলেন যে, তার মত সুইজারল্যান্ডের প্রোটেস্টান্টদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি ১৫৩০ খৃস্টাব্দে বাসল ত্যাগ করেন। এটা ছিল তার জন্য এক বিরাট আঘাত। করণ তার আশা ছিল ফ্রান্সের ক্যাথলিকরা তার কথা না শুনলেও প্রোটেস্টান্টরা যীশু ও তার শিক্ষা সম্পর্কে তার বক্তব্য সহানুভূতির সাথে শুনবে। তিনি ষ্ট্রাসবুর্গ (Strassbourg) গমন করলেন। দেখলেন, সেখানে জীবিকা অর্জনের কোনো পথ নেই। জার্মান ভাষা না জানার কারণে তিনি তার চিকিৎসাবিদ্যা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। বাধ্য হয়ে তাঁকে লিয়ঁ (Lyons) চলে যেতে হয়। সারভেটাস স্পেন থেকে ফেরার পর সম্পূর্ণ সময়কাল ধরে ক্যালভিনের (Calvin) সাথে দীর্ঘ যোগাযোগ বজায় রাখেন। কিন্তু তার কাছ থেকে তিনি অনুকূল সাড়া পাননি। ক্যালভিন নিজে যীশু খৃষ্টের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে মেনে চলার চেষ্টা করতে আগ্রহী ছিলেন না, বরং তিনি সংস্কার আন্দোলনের নেতা হিসেবে থাকতে আগ্রহী ছিলেন।

ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে জনসাধারণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, তখন সারভেটাস "দি এররস অব ট্রিনিটি" (The Errors of Trinity) গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণ করে তার মত প্রকাশ করলেন। ১৫৩১ খৃস্টাব্দে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ বছরই "টু ডায়ালগস অন ট্রিনিটি" (Two Dialogues on Trinity) নামে তিনি আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ দু'টি গ্রন্থ সারা ইউরোপে ঝড় তোলে। স্মরণকালের মধ্যে এরকম গ্রন্থ রচনার দুঃসাহস আর কেউ করে নি।

ফল হলো এই যে, চার্চ হন্য হয়ে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে সারভেটাসকে খুঁজে বেড়াতে শুরু করল। সারভেটাস বাধ্য হয়ে তার নিজের নাম পরিবর্তন করলেন, তবে মত-কে নয়। ১৫৩২ খৃস্টাব্দ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছদ্মনামে বেঁচে ছিলেন। তখনও ক্যালভিনের প্রতি সারভেটাসের একটি শিশুসুলভ বিশ্বাস বজায় ছিল। অথচ ক্যালভিন সারভেটাসের গ্রন্থ পাঠের পর তার প্রতি গভীরভাবে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেন। তার কাছে সারভেটাস ছিলেন এক কল্পনাপ্রবণ তরুণ যুবক যে কিনা তার মতো লোককেও ধর্মতত্ত্ব শেখানোর দুঃসাহস দেখিয়েছিল।

কিন্তু সারভেটাস তার কাছে চিঠিপত্র লেখা অব্যাহত রাখেন। সারভেটাস তার মত মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন এটা দেখার পর এ নেতার ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে প্রোটেস্টাণ্ট আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে আশঙ্কা দেখা দিল যে, এই তরুণ যুবকের মতের কথা যদি জনসাধারণের মধ্যে জানাজানি হয়ে যায় তাহলে তাদের ধর্মীয় আন্দোলন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। তাদের আরো ভয় ছিল যে, ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্ম থেকে প্রটেস্টান্ট ধর্ম যদি খুব বেশি দূরে সরে যায় তাহলে চার্চের নির্যাতন আরো বৃদ্ধি পাবে। এভাবে সারভেটাস, প্রটেস্টান্টদের তার মতে দীক্ষিত করার বদলে অধিকতার উৎসাহের সাথেই তাদের ত্রিত্ববাদী ধর্মকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য করলেন। সে জন্য মার্টিন লুথার ১৫৩৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশ্যে তার নিন্দা করেন।

এ সময়টাতে সারভেটাস চিকিৎসক হিসেবে প্র্যাকটিস অব্যাহত রাখেন এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় চিকিৎসকে পরিণত হন। একজন পেশাদার চিকিৎসকের বিকাশ খুব কম, এ বাস্তবতা সত্ত্বেও সারভেটাস একটি বাইবেলের মুদ্রণ তদারকির জন্য সময় বের করে নিতেন। বাইবেলটি ১৫৪০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সরভেটাস এতে একটি ভূমিকা লেখেন। তাতে তিনি প্রশ্ন করেন যে, বাইবেলের একের অধিক অর্থ থাকতে পারে কি না। ক্যালভিন এর হ্যাঁ সূচক জবাব দেন। কিন্তু সারভেটাস তার সাথে একমত হতে পারেন নি। আজ ক্যালভিনপন্থী চার্চ সে ব্যাখ্যার নীতি গ্রহণ করেছে যাকে ক্যালভিন ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে সারভেটাসের সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। সারভেটাস বলেছিলেন যে, তিনি খৃষ্টবাদের অ্যানটিওচেন (Antiochene) ধারাভুক্ত প্রথমদিকের নবীদের মতেরই অনুসরণ করছেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, তিক্ত বিরোধিতা যখন তুঙ্গে তখন সারভেটাস তার পুরোনো বন্ধু পিটার পালমিয়ের (Peter Palmier)-এর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ও শান্তি পেয়েছিলেন। পালমিয়ের তখন ছিলেন ভিয়েনার রোমান ক্যাথলিক আর্চবিশপ। সারভেটাস সেখানে ১৩ বছর বাস করেন। এ সময় তিনি চিকিৎসার পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছিলেন এবং অত্যন্ত খ্যাতিমান একজন চিকিৎসক হয়ে ওঠেন। ইউরোপে যারা প্রথম রক্ত সঞ্চালনের নীতি সম্পর্কে লেখেন, তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। তিনি ভূগোল বিষয়েও একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এসব সাহিত্যিক সাফল্য সত্ত্বেও তার মনোযোগের কেন্দ্র ছিল খৃষ্টান ধর্মের

সমস্যা। তিনি ক্যালভিনের কাছে চিঠি লেখা অব্যাহত রেখেছিলেন। এ আশায় যে, তিনি হয়তো শেষ পর্যন্ত তাকে নিজের মতে আনতে পারবেন। কিন্তু ক্যালভিন সারভেটাসের চিঠিতে ব্যক্ত বিশ্বাস বা ধারণা দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। সারভেটাসও ক্যালভিনের নীতিবাক্য মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। সে সময়কার প্রটেস্টান্ট খৃষ্টানদের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ হিসেবে স্বীকৃত ক্যালভিন মনে করতেন যে, ধর্মীয় ব্যাপারে তার নির্দেশনাকে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহসের জন্য সারভেটাসের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ যথাযথ ছিল। সারভেটাস ক্যালভিনকে অবিতর্কিত ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। ক্যালভিন সক্রোধে তার পত্রের জবাব দেন এবং সারভেটাস তীব্র ব্যঙ্গপূর্ণ ভাষায় তার প্রত্যুত্তর প্রেরণ করেন। এরপর সারভেটাস “দি রেস্টারেশন অব ক্রিশ্চিয়ানিটি” (The Restoration of Christianity) নামক আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং সে পাণ্ডুলিপির একটি অগ্রিম কপি ক্যালভিনের কাছে পাঠান। বইটি যখন প্রকাশিত হলো, দেখা গেল তাতে রয়েছে মোট ৭টি অধ্যায়। এর মধ্যে প্রথম ও শেষ অধ্যায়টি সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টধর্ম নিয়ে লেখা। পঞ্চম অধ্যায়ে ছিল ৩০টি চিঠি যেগুলো সারভেটাস ও ক্যালভিনের মধ্যে বিনিময় হয়েছিল। এ থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, ক্যালভিন যত প্রতিভাধরই হন না কেন, তার মধ্যে খৃষ্ট ধর্মের নম্রতার অভাব রয়েছে। এ গ্রন্থের জন্য সারভেটাস পুনরায় ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট খৃষ্টান উভয়েরই নিন্দার সম্মুখীন হন। উভয় পক্ষ গ্রন্থটি ধ্বংসের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তা এমনভাবে করা হয় যে, আজ তার দু’টি মাত্র কপি ছাড়া আর কোনো কপির কথা জানা

যায় না। এ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ হয় ১৭৯১ খৃস্টাব্দে। কিন্তু এ মুদ্রণের সকল কপিও ধ্বংস করা হয়।

১৫৪৬ খৃস্টাব্দে সারভেটাসকে লেখা এক চিঠিতে ক্যালভিন তাকে হুমকি দেন যে, সারভেটাস যদি কখনো জেনেভায় আসেন তাহলে তাকে জীবন নিয়ে ফিরতে দেওয়া হবে না। সারভেটাস তাকে বিশ্বাস করতেন বলেন মনে হয় না। পরে সারভেটাস জেনেভা এসে এ বিশ্বাস নিয়ে ক্যালভিনের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান যে, তাদের মধ্যে হয়তো মতের মিল তখনও সম্ভব। কিন্তু ক্যালভিন রোমান ক্যাথলিকদের দিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করান এবং ধর্মদ্রোহিতার দায়ে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

সারভেটাস চিকিৎসক হিসেবে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে, তার কিছু প্রাক্তন রোগীর সাহায্যে তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি নেপলস (Naples) যাবার সিদ্ধান্ত নেন। জেনেভার মধ্য দিয়ে নেপলস যেতে হত। তিনি ছদ্মবেশ নিলেন। মনে করলেন, এ ছদ্মবেশ অন্যের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু সেটা ছিল ভুল। শহরের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তিনি ধরা পড়লেন এবং আরেকবার কারারুদ্ধ হলেন। এবার তিনি পালাতে পারেন নি। বিচার তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলে সাব্যস্ত করা হয়। তার বিচারের রায়ের কিছু অংশ নিম্নরূপ:

সারভেটাস স্বীকার করেন যে, তার বইতে তিনি ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসীদের ত্রিত্ববাদী ও নাস্তিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ত্রিত্ববাদকে তিন

মাথাওয়ালা এক শয়তান সদৃশ দৈত্য বলে আখ্যায়িত করেছেন... তিনি শিশুদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করাকে শয়তান ও জাদুকরদের আবিষ্কার বলে আখ্যায়িত করেছেন.... তার মতে, এটা বহু আত্মাকে হত্যা ও ধ্বংস করে। সর্বোপরি তিনি একজন মন্ত্রীর কাছে লেখা পত্রে অন্য বহু প্রকার ধর্ম অবমাননার সাথে আমাদের ঐশ্বরিক ধর্মকে বিশ্বাসহীন এবং ঈশ্বরহীন বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, ঈশ্বরের স্থানে আমরা তিন মাথাওয়ালা নরকের কুকুরকে স্থাপন করেছি। সারভেটাসকে উদ্দেশ্য করে আদালত বলে যে, পবিত্র ত্রিত্ববাদের মহামহিম ঈশ্বরের বিরোধিতা করায় তুমি লজ্জা বা ভীতিবোধ কর না এবং হেতে তুমি একগুঁয়েভাবে বিশ্বে তোমার দূর্গন্ধযুক্ত ধর্মদ্রোহিতার বিষ চাড়ানোর চেষ্টা করছ সেহেতু এসব এবং অন্যান্য কারণে ঈশ্বরের চার্চকে এ ধরনের সংক্রমণ থেকে পবিত্র রাখতে এবং নষ্ট সদস্য থেকে মুক্ত করতে... আমরা তোমাকে মাইকেল সারভেটাসকে বন্ধন করে এবং গির্জায় নিতে এবং সেখানে খুঁটির সাথে বেঁধে এবং তোমার বইয়ের সাথে তোমাকে পুড়িয়ে মারার চরম শাস্তি প্রদান করছি এবং তোমার মতো আর কেউ করতে চাইলে তার জন্যও উদাহরণ হয়ে থাকবে।[২]

১৫৫৩ খৃস্টাব্দে ২৬ অক্টোবর সারভেটাসকে মাটিতে প্রোথিত একটি গাছের সাথে বাঁধা হয়। তার পা শুধুমাত্র মাটি স্পর্শ করছিল। গন্ধক মাখানো খড় ও পাতার তৈরি একটি মুকুট তার মাথায় পরিয়ে দেওয়া হলো। পাতাসহ কাঁচা ওক ও অন্যান্য জ্বালানি কাঠ এনে তার পায়ের চারপাশে জড়ো করা হলো। এরপর খুঁটির সাথে তার শরীর লোহার শিকল দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হলো। দড়ি দিয়ে গলা ও ঘাড় পেঁচিয়ে

বাঁধা হলো, এরপর কাঠে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। আগুন তাঁকে যন্ত্রণা দিল, কিন্তু মারাত্মকভাবে পোড়াতে পারল না। এ দৃশ্য দেখে কিছু দর্শক তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল এবং তার যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে আরো জ্বালানি যোগ করল। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে সারভেটাস মৃত্যুর পূর্বে দু'ঘণ্টা ধরে যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছিলেন। "দি এররস অব ট্রিনিটি"র (The Errors of Trinity) একটি কপি কাঠে আগুন জ্বালানোর আগে তার কোমরে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছে যে, কেউ একজন বইটি উদ্ধার করেছিল। সেই আধ- পোড়া বইটি এখনও আছে। সেলসাস (Celsus) বলেছেন যে, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে সারভেটাসের অবিচলতা বহু লোককে তার বিশ্বাসের অনুসারী হতে প্রেরণা জুগিয়েছিল। ক্যালভিন তার অভিযোগের মধ্য দিয়ে সে কথাই স্বীকার করে বলেছেন যে, বহু লোক রয়েছে যারা তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। সারভেটাসের এক অনুসারী কাসটিলো (Castillos) বলেন, "কোনো মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করে কোনো মতকে প্রমাণ করা যায় না।"[৩] পরবর্তী বছরগুলোতে জেনেভার মানুষেরা সারভেটাসের একটি মূর্তি তৈরি ও স্থাপন করে তাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। কিন্তু ক্যালভিনের মৃত্যুর পর তারা তার কোনো মূর্তি তৈরি বা স্থাপন করে নি। কারণ, তিনিই সারভেটাসকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করার জন্য দায়ী ছিলেন।

কবি কাউপার (Cowper) এ ঘটনা স্মরণে লিখেছিলেন:

তারা ছিলেন অপরিচিত

নির্যাতন তাদের টেনে আনল খ্যাতির শিখরে

এবং স্বর্গ পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করল।

তাদের ছাই উড়ে গেল হাওয়ায়

কেউ জানে না- কোথায় গন্তব্যে!

তাদের নামে কোনো চারণ কবি

রচনা করে না অমর ও পবিত্র সংগীত।

আর ইতিহাস কত ক্ষুদ্র বিষয়েও মুখর

অথচ এ ব্যাপারে আশ্চর্য নীরব।[৪]

সারভেটাসের মৃত্যু কোনোক্রমেই কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। সে সময় সমগ্র ইউরোপেই এ ধরনের ঘটনা ঘটছিল। মোটলির (Motley) "রাইজ অব দি ডাচ রিপাবলিক" (Rise of the Dutch Republic) গ্রন্থের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

১৫৬৮ খৃস্টাব্দে ১৫ ফেব্রুয়ারি যাজক সভা নেদারল্যান্ডের সকল অধিবাসীকে ধর্মদ্রোহী বলে দোষী সাব্যস্ত করে। এ ভীষণ প্রলয়কান্ড থেকে মুষ্টিমেয় বিশেষ কিছু ব্যক্তিমাত্র প্রাণে রক্ষা পান। ১০ দিন পরের তারিখে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের এক ঘোষণায় যাজক সভার দণ্ডাদেশ নিশ্চিত করা হয় এবং তাৎক্ষণিক মৃত্যুদন্ডের মাধ্যমে তা কার্যকর করার ফরমান জারি করা হয়... বধ্যভূমিতে ৩টি সারিতে দাঁড় করিয়ে ৩০ লাখ নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করা হয়। নয়া ফরমানে

মৃত্যুদণ্ড শিথিল করা হয় নি। প্রতিদিন এবং প্রতি ঘন্টায় উচ্চপদস্থ ও মহৎ ব্যক্তিদের ধরে এনে শূলে চড়ানো হচ্ছিল। আলভা দ্বিতীয় ফিলিপের কাছে লেখা একটি পত্রে পবিত্র সপ্তাহ বা হলি উইকের পর পরপরই যাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় তাদের সংখ্যা ৮০০ বলে অনুমান করেন।[৫]

যে গ্রন্থ সারভেটাসের বিরুদ্ধে সহিংসতার কারণ হয়ে উঠেছিল, সেই "দি এররস অব ট্রিনিটি"র কিছু অংশ নিম্নরূপ:

দার্শনিকগণ তৃতীয় একটি পৃথক সত্ত্বার আবিষ্কার করেছেন। এটি প্রকৃতই অন্য দু'টি থেকে আলাদা। একে তারা বলেন তৃতীয় ঈশ্বর বা পবিত্র আত্মা, এভাবে তারা এক কল্পিত ত্রিত্ববাদের কৌশল উদ্ভাবন করেছেন, একের মধ্যে তিনের অস্তিত্ব। কিন্তু বাস্তবে তিন ঈশ্বর অথবা এক ত্রিসত্ত্বময় ঈশ্বরকে মিথ্যা বর্ণনার মাধ্যমে এবং একত্ববাদের নামে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।... তাদের জন্য এসব কথাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা, ৩টি অস্তিত্ব বর্তমান বলে মেনে নেওয়া খুবই সহজ। কিন্তু অন্য যারা এটা বিশ্বাস করে না, তাদের সাথে এক্ষেত্রে সেই বিশ্বাস না করা ব্যক্তিদের পার্থক্য ও দূরত্ব রয়েছে এবং তারা এগুলো একই পাত্রে মুখ আটকে রেখেছে। যেহেতু আমি 'ব্যক্তিগণ' শব্দটির অপব্যবহার করতে অনিচ্ছুক সে কারণে আমি তাদের প্রথম সত্ত্বা, দ্বিতীয় সত্ত্বা ও তৃতীয় সত্ত্বা নামে আখ্যায়িত করব, কারণ বাইবেলে আমি তাদের জন্য অন্য নাম খুঁজে পাই নি... তারা তাদের রীতি অনুযায়ী এদের ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে, তারা মুক্তকণ্ঠে এ সব অস্তিত্বের বহুত্বকে, সত্ত্বার বহুত্বকে, মূলের বহুত্বকে, মর্মের বহুত্বকে

স্বীকার করে। ঈশ্বর শব্দটিকে কঠোরভাবে গ্রহণ করার অর্থ তাদের ঈশ্বরের সংখ্যা একাধিক।

সারভেটাস আরো লিখেছেন:

যদি তাই হয় তাহলে ৩জন ঈশ্বর রয়েছে একথা যারা বলে সেই ট্রিওটোরাইটসদের (Triotorites) কেন দায়ী করা হবে? তাদের এত ঈশ্বরের মর্মার্থও তো একই এবং যদিও কিছু ব্যক্তি ৩ জন ঈশ্বরকে এক করা হয়েছে কথাটি বোঝাতে চাইবেন না, যদিও তারা এ শব্দটি ব্যবহার করেন যে, তারা একত্রে গঠিত এবং একথা যে- এ ৩টি সত্ত্বা থেকেই ঈশ্বর গঠিত। এরপর এটা সুস্পষ্ট যে, তারা ট্রিওটোরাইটস এবং আমাদের তিনজন ঈশ্বর গঠিত। এরপর এটা সুস্পষ্ট যে, তারা টিওটোরাইটস এবং আমাদের তিনজন ঈশ্বর রয়েছেন। আমরা নাস্তিক হয়ে পড়েছি অর্থাৎ আমাদের কোনো ঈশ্বর নেই। যেই মাত্র আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে ভাবার চেষ্টা করি, আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায় তিনটি অলীক মূর্তি যাতে আমাদের ধারণায় কোনো ধরনের একত্ববাদ অবশিষ্ট না থাকে। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তায় অক্ষম হলে, যখন আমাদের উপলব্ধিতে ত্রি-সত্ত্বার সার্বক্ষণিক সংশয় বিরক্ত করতে থাকবে, আমরা চিরকালের জন্য একটি ঘোরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হব এবং মনে করব যে, আমরা ঈশ্বরের চিন্তাই করছি। তারা যখন স্বর্গ লাভের জন্য এ ধরনের স্বপ্ন দেখে, মনে হয় তারা আরেক জগতে বাস করছে। স্বর্গের রাজ্য এসব নির্বোধ কথাবার্তার ব্যাপারে

কিছুই জ্ঞাত নন এবং ধর্মগ্রন্থ যে পবিত্র আত্মার কথা বলে তার অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন, যা তাদের অজানা।

তিনি আরো বলেন,

ত্রিত্ববাদের এই বিষয়টি মুসলিমদের কাছে যে কতটা হাস্যকর তা শুধু ঈশ্বরই জানেন। ইয়াহূদীরাও আমাদের এই কল্পিত ধারণার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে নি, তারা এই বোকামির জন্য আমাদের উপহাস করে। তারা বিশ্বাস করে না যে, তারা যে যীশুখ্রিষ্টের কথা শুনেছে ইনিই তিনি। শুধু মুসলিম বা ইয়াহূদীরাই নয়, এমনকি মাঠের পশুরাও আমাদের নিয়ে উপহাস করত, যদি তারা আমাদের এই উদ্ভট ধারণা বুঝতে পারত, কেননা ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিই এক ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করে।... তাই এই জ্বলন্ত মহামারি যেন যোগ করা হয়েছে এবং অতি কৌশলে সম্প্রতি আসা নয়া ঈশ্বরের বিষয় আরোপ করা হয়েছে যে ধর্ম আমাদের পূর্বপুরুষরা পালন করেন নি। আমাদের ওপর দর্শনের এ মহামারী এনেছে গ্রীকরা, আর আমরা তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে দার্শনিক হয়ে পড়েছি। তারা ধর্মগ্রন্থের বানীর মর্মার্থ কখনোই বুঝতে পারে নি যা তারা এ প্রসঙ্গে উপস্থাপন করেছে। সারভেটাস যীশুর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বলে যা বিশ্বাস করতেন তার ওপর জোর দিয়েছেন:

যীশুখৃষ্টকে আমি নবী বলে আখ্যায়িত করায় কিছু লোক তা নিয়ে কুৎসা রটনা করছে, কারণ তার যেসব গুণাবলি সেগুলো তারা বলে না, তাদের বিশ্বাস যে যারা এ কাজ করে তাদের সবাই ইয়াহূদী ও মুসলিম।

ধর্মীয় গ্রন্থ ও প্রাচীন লেখকগণ তাকে নবী বললেও তাদের কিছু আসে যায় না।[৬]

মাইকেল সারভেটাস ছিলেন তার সময়কার প্রতিষ্ঠিত চার্চের সবচেয়ে স্পষ্টভাষী সমালোচক। এটাই প্রটেনটান্টদের সাহায্য নিয়ে ক্যাথলিকগণ কর্তৃক তাকে আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নবজাগরণ (Renaissance) ও সংস্কারের (Reformation) যা কিছু ভালো,তার মধ্যে তারই সমন্বয় ঘটেছিল এবং যে আদর্শ একজন মানুষকে গভীর বৈশিক জ্ঞানসহ 'বিশ্বজনীন মানুষ' করে তোলে, তিনি জীবনের সে পর্যায়ের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র, ভূগোল ও বাইবেলে আর পাণ্ডিত্য ছিল এবং ধর্মশাস্ত্রে তিনি ছিলেন দক্ষ। বহুমুখী শিক্ষা তাকে দিয়েছিল দৃষ্টির প্রসারতা। কিন্তু তার চেয়ে অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ক্যালভিনের সাথে বিরোধ ছিল সম্ভবত তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নিশ্চিতভাবেই এটা ছিল ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, কিন্তু কার্যত তার চেয়েও বেশি কিছু এটা ছিল কঠোর বদলে দেয়ার জন্য সূচিত সংস্কারের প্রত্যাখ্যান, অধঃপতিত চার্চের বিষয় নয়। এর মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছে নিজের জীবন দিয়ে। সারভেটাস যদিও পরলোকগত, কিন্তু একত্ববাদী ধর্মে তার বিশ্বাসের মৃত্যু হয় নি। এখনও তিনি আধুনিক একত্ববাদের প্রতিষ্ঠাতা (The Fonder of modern unitarianism) হিসেবেই মর্যাদা মণ্ডিত।

সারভেটাসের বিশ্বাসে যারা বিশ্বাসী ছিলেন তাদের সবাই তার পরিণতি মেনে নিতে পারেন নি। তার সমসাময়িক অ্যাডাম নিউসার (Adam Neuser)- এর চিঠিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ চিঠিটি লেখা হয়েছিল কনস্টান্টিনোপলের মুসলিম শাসক সম্রাট দ্বিতীয় সেলিমের কাছে। এ চিঠিটি রাজকীয় প্রাচীন নিদর্শনের অংশ হিসেবে এখন হাইডেলবার্গের (Heidelburg) আর্কাইভে সংরক্ষিত রয়েছে:

“আমি, অ্যাডাম নিউসার, জার্মানিতে জন্মগ্রহণকারী একজন খৃষ্টান এবং হাইডেলবার্গের লোকদের কাছে ধর্ম প্রচারকারীর মর্যাদা লাভকারী, যে শহরে এ সময়কার সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত লোক দেখা যায়, আমি আপনার প্রিয় আল্লাহ ও আপনার নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) উসিলা দিয়ে একান্ত বিনয়ের সাথে মহামান্য সুলতানের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমাকে আপনার একজন অনুগতদের মধ্যে এবং আপনার সেই জনগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায়, আমি দেখি, আমি জানি ও আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, আপনার ধর্ম পবিত্র, সুস্পষ্ট ও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার প্রতিমা পূজক খৃষ্টান সমাজ ত্যাগের ঘটনা বহু বিবেচনাশীল ব্যক্তিকেই আপনার বিশ্বাস ও ধর্ম গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করবে, বিশেষ করে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও সর্বাপেক্ষা বিবেচনাশীল বহু ব্যক্তি যেহেতু আমারই মত মনোভাব পোষণ করেন যা আমি মহামান্য সুলতানকে মৌখিকভাবে অবহিত করব। আমার সম্পর্কে বলতে গেলে আমি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে আল কুরআনের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা

হয়েছে: খৃষ্টানরা আমাদের প্রতি ইয়াহূদীদের চেয়ে বেশি সদিচ্ছা প্রদর্শন করে; এবং যখন তাদের প্রাদ্রী ও বিশপগণের মত তারা হঠকারী ও একগুঁয়ে নয়, তারা আল্লাহর নবীর নির্দেশগুলো বুঝতে পারে এবং সত্যকে স্বীকার করে, তারা অশ্রু সজল চোখে বলে, হে প্রভূ! আমরা অন্তর থেকে আশা করি যে, যেহেতু ভালো লোকরা যা বিশ্বাস করত এবং আমরাও তাই করি এবং তা আমাদের ধর্মবিশ্বাসীদের দলে স্থাপিত করবে: তাহলে আমরা কেন আল্লাহ ও তার সত্য প্রচারকারী নবীকে বিশ্বাস করব না?[2]

হে সম্রাট! আমি তাদেরই একজন যারা আনন্দের সাথে আল কুরআন পাঠ করে। আমি তাদেরই একজন যে আপনার জনগণের একজন হতে চাই এবং আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার নবীর মতবাদ সন্দেহাতীতভাবে সত্য। আমি মহামান্য সুলতানের কাছে আমার কথা শোনার জন্য এবং পরম করুণাময় আল্লাহ এ সত্য আমার কাছে কীভাবে প্রকাশ করেছেন তা জানার জন্য করজোড়ে আবেদন জানাচ্ছি।

তবে মহামান্য সম্রাট, আমি প্রথমেই বলে নিচ্ছি যে, অপরাধ, হত্যা, দস্যুতা অথবা যৌন অপরাধের কারণে যেসব খৃষ্টান তাদের নিজেদের মধ্যে বসবাস করতে না পেরে আপনার আশ্রয় নিয়েছে, আমি সে কারণে আপনার আশ্রয় চাইছি না। আমি এক বছর পূর্বেই আপনার আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেই এবং কনস্টান্টিনোপলের পথে আমি প্রেসবার্গ (Presburg) পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলাম। কিন্তু হাঙ্গেরীয় ভাষা না বুঝার

---

[2] তু. ১৩ : ৩৬ এবং ৫ : ৮২-৮৩।

কারণে আমি আর অগ্রসর হতে পারি নি এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি দেশে ফিরে আসি। যদি আমি কোনো অপরাধের কারণে পালিয়ে যেতাম তাহলে আমি দেশে ফিরতাম না। তাছাড়া কোনো ব্যক্তি আপনার ধর্ম গ্রহণ করতে আমাকে বাধ্য করে নি। আর কেই বা তা করবে? কারণ আপনার লোকদের কাছে অপরিচিত এবং তাদের কাছ থেকে বহু দূরে রয়েছি।

সুতরাং আমার বিনীত প্রার্থনা যে, মহামান্য সুলতান যেন অনুগ্রহ করে আমাকে তাদের একজন বলে না ভাবেন যারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দী হয়েছে এবং আপনার ধর্ম গ্রহণ করেছে অনিচ্ছায় যারা সুযোগ পেলেই পালিয়ে যাবে এবং সত্য ধর্মের নিন্দা করবে। আমি মহামান্য সুলতানের কাছে আমার বিনীত আবেদন জানাচ্ছি যে, আমি যা বলতে যাচ্ছি তাতে যেন তিনি অনুগ্রহ করে মনোযোগ দেন এবং আপনার সাম্রাজ্যে আমার প্রত্যাবর্তনের সত্য ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন। বিখ্যাত হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম প্রচারকের পদে উন্নীত হওয়ার পর আমি নিজে নিজেই আমাদের খৃষ্টধর্মের বহু প্রকার মতবিরোধ ও বিভক্তি সম্পর্কে বিচার বিশেষণ শুরু করি। কারণ আমাদের মধ্যে যত মানুষ ছিল তত ছিল মত ও মনোভাব। আমি নবী যীশু খৃষ্টের সময় থেকে যত পণ্ডিত ও ব্যাখ্যাকার ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে যা লিখেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন, তার সংক্ষিপ্তসার তৈরির কাজে হাত দিই। আমি শুধু দু'টি স্থানেই নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলাম। এক. মূসার আলাইহিস সালাম নির্দেশ এবং গসপেল। এরপর আমি অত্যন্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঈশ্বরকে একান্তভাবে ডাকতে থাকি, প্রার্থনা করতে থাকি যাতে তিনি

আমাকে সঠিক পথ দেখান যাতে আমি বিভ্রান্ত না হই। এরপর ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়ে আমার কাছে প্রকাশ করলেন ‘একজন মাত্র ঈশ্বরের দলীল’, সেই দলীলের ওপর ভিত্তি করে আমি একটি গ্রন্থ রচনা করি যাতে আমি প্রমাণ করি যে, খৃষ্টানরা যে মিথ্যা কথা বলে থাকে যীশুর মতাদর্শে সে কথা কোথাও বলা নেই যে, তিনি একজন ঈশ্বর; বরং ঈশ্বর একজনই যার কোনো পুত্র নেই। আমি এ গ্রন্থটি আপনাকে উৎসর্গ করছি এবং আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, খৃষ্টানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিও এটা খণ্ডন করতে সক্ষম নয়। সুতরাং আমার পক্ষে কি ঈশ্বরের সাথে আরেকজন ঈশ্বরকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব? মূসা আলাইহিস সালাম এটা নিষেধ করেছেন এবং যীশুও কখনো এ শিক্ষা দেন নি। আল্লাহর অনুগ্রহে দিন দিন আমি নিজেকে শক্তিশালী করে তুলেছি এবং বুঝেছি যে, খৃষ্টানরা যিশুখ্রিস্টের সকল সুবিধার অপব্যবহার করেছে যেমনটি করেছিল ইয়াহূদীরা পিতলের সর্পকে.... আমার সিদ্ধান্ত যে, খৃষ্টানদের মধ্যে পবিত্র কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং তারা এখন সকলেই মিথ্যাচারী। তারা মূসা আলাইহিস সালামের কিতাব ও গসপেলের সব কিছুই মিথ্যা ব্যাখ্যা করে বিকৃতির শিকার হয়েছে যা আমি আমার নিজের হাতে লেখা একটি বইতে দেখিয়েছি এবং সেটা আমি আপনাকে উপহার প্রদান করব। আমি যখন বলি যে, খৃষ্টানরা মিথ্যাচার করেছে ও মূসা আলাইহিস সালামের নির্দেশ ও গসপেল বিকৃত করেছে আমি তা মনে প্রাণেই বলি। মূসা আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে সুবিধাজনক সাক্ষ্য দিয়েছে। কিন্তু কুরআন প্রধানত তাদের মিথ্যা ব্যাখ্যার মাধ্যমে মূসা আলাইহিস সালামের কিতাব ও ঈসা

আলাইহিস সালামের গসপেল বিকৃত করার বিষয়টি জোর দিয়ে বলেছে। কার্যত আল্লাহর বাণী যদি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হত তাহলে ইয়াহূদী, খৃষ্টান ও তুর্কিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকত না। তাই কুরআন যা বলেছে তা সত্য। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্ম সকল মিথ্যা ব্যাখ্যাকে ধ্বংস করেছে এবং আমাদের আল্লাহ এর সঠিক অর্থ শিক্ষা দিয়েছে....

এরপর আল্লাহর অনুগ্রহে আমি বুঝতে পারি যে, আল্লাহ এক, ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত ধর্মমতের শিক্ষা আমরা লাভ করি নি। তাই খৃষ্টানদের সকল অনুষ্ঠানের সাথেই মূলের অত্যন্ত বেশি পার্থক্য রয়েছে। আমি ভাবতে শুরু করি যে, এ বিশ্বে আমার মতে লোক শুধু আমি একা। আমি আল কুরআন দেখি নি। আমাদের খৃষ্টানরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্ম সংশ্লিষ্ট কোনো কিছু যাতে কোথাও বিস্তার লাভ করতে না পারে সে জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং দারিদ্র্যরা যাতে এসব সত্য জেনে তাতে বিশ্বাস স্থাপন না করে সে জন্য তারা সত্যকে গোপন করে আল-কুরআনের মতবাদ সম্পর্কে এমন কুৎসা রটনা করে যে, তারা আল-কুরআনের নাম শুনেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও অলৌকিকভাবে সেই মহা গ্রন্থটি আমার হাতে এসে পড়েছে এবং এ জন্য আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আল্লাহ জানেন, আমি তার কাছে মহামান্য সুলতান ও তার সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি। আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি তা সকলের কাছে ব্যক্ত করার সকল পন্থা অবলম্বন করতে মনস্থ করেছি এবং যদি তারা তা গ্রহণ না করে তাহলে আমি আমার পদ ত্যাগ করব এবং

আপনার শ্মরণ নিব। আমি খৃষ্ট ধর্মের কিছু বিষয়ে চার্চ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যে বিরোধ চলছে তার সমালোচনা শুরু করেছি এবং তাতে প্রত্যাশিত ফল পাচ্ছি। আমি বিষয়টাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছি যে, সাম্রাজ্যের সকল লোকই এখন তা জেনে গেছে এবং আমি কিছু জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমার পাশে পেয়েছি। আমার নিয়োগ কর্তা যিনি একজন রাজপুত্র এবং ক্ষমতার দিক দিয়ে জার্মানিতে সম্রাটের পরেই তার স্থান) সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের হামলার ভয়ে আমাকে পদচ্যুত করেছেন...।[৭]

এ চিঠিটি সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের (Maximilliaহ) হাতে পড়ে। নিউসার তার দু'বন্ধু সিলভান (Sylvan) ও ম্যাথিয়াস ভিহি (Mathias Vehe)- সহ গ্রেফতার হন। তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ১৫৭০ সালের ১৫ জুলাই নিউসার কারাগার থেকে পালিয়ে যান ও আবার গ্রেফতার হন। তিনি দ্বিতীয় বার পলায়ন করেন ও আবারও গ্রেফতার হন। দু'বছর ধরে তাদের বিচার চলে। সিলভানের মাথা কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ পর্যায়ে নিউসার আবার পলায়ন করেন। এবার তিনি কনষ্টান্টিনোপলে পৌঁছতে সক্ষম হন ও ইসলাম গ্রহণ করেন।

**ফ্রান্সিস ডেভিড (Francis David) ১৫১০-১৫৭৯ খৃ.**

ফ্রান্সি ডেভিড ১৫১০ খৃস্টাব্দে ট্রানসিলভানিয়ার কালোজার (Kolozsar) এ জন্মগ্রহণ করেন। মেধাবী ছাত্র ফ্রান্সিস উটেনবার্গে অধ্যয়নের বৃত্তি লাভ করেন। সেখানে তাকে ৪ বছর ধরে ক্যাথলিক পাদ্রির প্রশিক্ষণ

দেওয়া হয়। কালোজার- এ ফিরে আসার পর তিনি ক্যাথলিক স্কুলের রেকর্ডার নিযুক্ত হন। এরপর তিনি প্রোটেষ্টাণ্টবাদ গ্রহণ করে ক্যাথলিক স্কুল ত্যাগ করেন। ১৫৫৫ খৃস্টাব্দে একটি লুথারপন্থী স্কুলের রেকর্ডার হন। লুথার ও ক্যালভিনের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন নিয়ে ভাঙন দেখা দিলে ডেভিড ক্যালভিনের দলে যোগ দেন। সংস্কার তখনও ব্যাপক রূপ লাভ করে নি। এ পরিবেশে অনুসন্ধানী চিন্তাকে তখনও নিষিদ্ধ করা হয় নি। খৃষ্টানধর্মের সকল পর্যায়ে আলোচনা অনুমোদিত ছিল। সংস্কারপন্থী চার্চ তখন পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করে নি এবং সে কারণে মুক্ত চিন্তার অবকাশ ছিল। এ পরিবেশে প্রতিটি মানুষ শুধু ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করবে, এ মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা ছিল।

যে দু'টি মত বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল এবং যা ছিল যৌক্তিক ব্যাখ্যার বাইরে সে দু'টি হলো যীশুর ঈশ্বরত্ব ও ত্রিত্ববাদ। যুক্তি বহির্ভূত এ মত বিশ্বাসের ব্যাপারে ডেভিডের মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না যে, এ ব্যাপারগুলো বুঝার চেষ্টা না করেই যারা এ রহস্যে বিশ্বাসী তারাই ভালো খৃষ্টান হিসেবে গণ্য হয় কি করে। তিনি কোনো বিশ্বাসকেই অন্ধভাবে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে এ সিদ্ধান্ত পৌঁছেন যে, যীশু ঈশ্বর নন। তিনি এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন।

পোলান্ডে এ বিশ্বাসের প্রতি জোর সমর্থন ছিল। এ দলের নেতা ছিলেন দু'জন: রাজ দরবারের চিকিৎসক বন্ড্রাটা (Blandrata) এবং

সোকিয়ানাস (Socianus) নামক এক ব্যক্তি। ডেভিড যখন ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে তার একটি ধারণা সূত্রবদ্ধ করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, এ সময় ট্রানসিলভানিয়ার রাজা জন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসার জন্য বন্ড্রাটাকে তলব করেন। ডেভিড সেখানে অবস্থানকালে বন্ড্রাটার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ থেকে খৃষ্টান ধর্মের মূল ভিত্তিরূপে এক ঈশ্বরে তার বিশ্বাসের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। ১৫৬৬ খৃস্টাব্দে ডেভিড এক ধর্মীয় স্বীকারোক্তি রচনা করেন। এতে বাইবেলে প্রকৃত কি বলা হয়েছে তারই আলোকে ত্রিত্ববাদের অবস্থান ব্যক্ত করা হয়। এতে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার পাণ্ডিতিক ধারণা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। বন্ড্রাটাও তার পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় এসব মত বিশ্বাস ইতিবাচক নেতিবাচক উভয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে ৭টি প্রস্তাব পেশ করেন। একই বছরে বন্ড্রাটার সুপারিশে রাজা জন ডেভিডকে রাজদরবারে ধর্ম প্রচারক নিয়োগ করেন। এভাবে ডেভিড তৎকালে ধর্মীয় সমস্যাদি ব্যাখ্যা করার জন্য রাজা কর্তৃক আহুত জাতীয় বিতর্কে একত্ববাদী দলের মুখপাত্রে পরিণত হন। তিনি ছিলেন একজন অতুলনীয় বাগ্মী। তার সম্পর্কে সমকালীন এক ব্যক্তি বলেন, মনে হত ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট ডেভিডের ঠোঁটস্থ।

রাজা জনের আমলে ১৫৬৬ ও ১৫৬৮ খৃস্টাব্দে জিউয়ালফিহেরভাট (Gyualafeharvat) এবং ১৫৬৯ খৃস্টাব্দে নাগিভারাদ (Nagyvarad) এ সবচেয়ে বড় বিতর্ক সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বিতর্ক ছিল অমীমাংসিত। তবে রাজা বন্ড্রাটা ও ডেভিডের যুক্তি- প্রমাণ প্রদর্শনে

মুগ্ধ হয়েছিলেন। সে কারণে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে পরমত সহিষ্ণুতা সংক্রান্ত এক রাজকীয় ফরমান জারি করা হয়। এতে ঘোষণা করা হয়:

“প্রতিটি স্থানে ধর্ম প্রচারকরা ধর্মপ্রচার করতে এবং তাদের উপলব্ধি অনুযায়ী গসপেলের ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং সমবেত ব্যক্তিরা যদি তা ভালো মনে করে তাহলে কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। এবং যাদের মতবাদ তাদের ভালো মনে হয় তারা সেই ধর্ম প্রচারককে রাখবে। কেউ ধর্ম প্রচারককে ঘৃণা করতে বা তার সাথে দুর্ব্যবহার করতে পারবে না... বিশেষ করে তার ধর্মমত প্রচারের জন্য, কারণ ধর্ম বিশ্বাস ঈশ্বরের উপহার।”[৯]

১৫৬৮ সালে ধর্ম সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিতর্ক সভাটি ডাকা হয়েছিল এ মত বিশ্বাস প্রমাণের জন্য যে বাইবেলে ত্রিত্ববাদ ও যীশুর ঈশ্বরত্বের কথা বলা হয়েছে কিনা। অত্যন্ত শক্তিশালী ও পরাঙ্গুম বক্তা ডেভিডের যুক্তিতর্ক অসার প্রমাণ করতে বিরোধীরা ব্যর্থ হয়। বিতর্ক সভায় আসন্ন পরাজয় উপলব্ধি করে বিরোধীরা গালাগালি শুরু করে। এ ঘটনা রাজা জনকে ডেভিডের যুক্তি প্রমাণকেই খাঁটি বলে গণ্য করতে সাহায্য করে। দশ দিন ধরে বিতর্ক সভা চলে এবং তা একত্ববাদকে জনপ্রিয় ধর্ম বিশ্বাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ডেভিড হয়ে উঠেন এর অগ্রদূত।

এ সময় মাইকেল সারভেটাসের লেখা-লেখির প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিছু অংশ গোপনে ট্রানসিলভানিয়াতে নিয়ে এসে তা স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। সেগুলো ব্যাপকভাবে পঠিত হতে থাকে এবং

তা পূর্ব ইউরোপে একত্ববাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করায় অবদান রাখে।

১৫৬৯ খৃস্টাব্দে হাঙ্গেরীতে তৃতীয় বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষায় এটা ছিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক বিতর্ক সভা যা একত্ববাদের চূড়ান্ত বিজয় সূচিত করে।[১০] রাজা স্বয়ং এ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং এতে রাজ্যের সকল উচ্চ পদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ডেভিডের যুক্তি ছিল এরকম: রোমে পোপের ত্রিত্ববাদে আসলে ৪ অথবা ৫ জন ঈশ্বরের বিশ্বাস করা হয়। একজন মূল ঈশ্বর, ৩ জন পৃথক ব্যক্তি যাদের প্রত্যেককে ঈশ্বর বলা হয়ে থাকে এবং আরো একজন ব্যক্তি যীশু যাকেও কিনা ঈশ্বর বলা হয়ে থাকে। ফ্রান্সিস ডেভিডের মতে, ঈশ্বর শুধু একজন তিনি হচ্ছেন পিতা, যার থেকে এবং যার দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং যিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রজ্ঞার শব্দ ও মুখ নিঃসৃত নিশ্বাসের মাধ্যমে। এই ঈশ্বরের বাইরে আর কোনো ঈশ্বর নেই, তিনও নয়, চারও নয়, না ভাবার্থে না ব্যক্তিরূপে, কারণ কোনো ধর্মগ্রন্থে ত্রয়ী ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি।

চার্চের কথিত ঈশ্বর পুত্র যিনি কিনা ঈশ্বরের সত্ত্বা থেকে সৃষ্টির শুরুতেই জন্মগ্রহণ করেছেন, তার কথা বাইবেলের কোথাও উল্লেখ নেই, কিংবা নেই ত্রিত্ববাদের দ্বিতীয় ঈশ্বরের কথা যিনি উদ্ভূত ঈশ্বর থেকে এবং রক্তমাংসের মানুষ। এটা একান্তই মানুষেরই আবিষ্কার ও কুসংস্কার। আর সে কারণে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

যীশু নিজেকে সৃষ্টি করেন নি, পিতা তাকে জন্ম দিয়েছেন। পিতা তাকে ঐশ্বরিক পন্থার মাধ্যমে জন্মদান করেছিলেন।

পিতা তাকে পবিত্র করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

যীশুর সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক শুধু তাই যা ঈশ্বর তাকে প্রদান করেছেন। ঈশ্বর ঐশী সত্ত্বার সব কিছুর ঊর্ধ্বে বিরাজমান।

ঈশ্বরের কাছে সময়ের পার্থক্য বলে কিছু নেই- তার কাছে সমস্ত কিছুই বর্তমানকাল। কিন্তু ধর্মগ্রন্থে কোথাও এ শিক্ষা দেওয়া হয় নি যে, যীশু সৃষ্টির শুরুতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এ বিতর্ক পাঁচ দিন ধরে চলেছিল। আর এটিও হয় সমাপ্তিমূলক। রাজা জন তার চূড়ান্ত ভাষণে ঘোষণা করে যে একত্ববাদীদের মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। বিরোধী পক্ষ অর্থাৎ লুথারপন্থী দলের নেতা মেলিয়াসকে (Melius) হুঁশিয়ার করে দেওয়া হলো যে, তিনি যেন পোপের নির্দেশে কাজ না করেন, বই-পত্র পুড়িয়ে না দেন এবং জনগণকে বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরিত না করেন।

পরে ডেভিড ধর্মীয় বিতর্কের সার সংক্ষেপ বর্ণনা করেন এভাবে:

আমি ধর্মগ্রন্থ অনুসরণ করি, কিন্তু আমার বিরোধীরা তা থলের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। তারা ত্রিত্ববাদের কথা বলে আলোর বদলে অন্ধকার ডেকে আনেন। তাদের ধর্ম এতটা স্ববিরোধী যে, তারা নিজেরা পর্যন্ত একে পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপন করতে পারেন নি। যা হোক, তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেখতে পাবেন যে, ঈশ্বর তার সত্য প্রকাশ করবেন।[১১]

এ ধর্মীয় বিতর্কের ফল হয় এই যে, কলোজার শহরের প্রায় সকল অধিবাসীই এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠে। গ্রামাঞ্চলেও এ ধর্ম বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ধর্মে পরিণত হয়। একত্ববাদ কারীভাবে স্বীকৃত ৪টি ধর্মের একটিতে পরিণত হয়, অর্থাৎ তা আইনের নিরাপত্তা লাভ করে। ১৫৭১ সাল নাগাদ ট্রানসিলভানিয়ায় একত্বাদীদের প্রায় ৫শ'টি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরই রাজা জন মারা যান। একত্ববাদের জনপ্রিয়তা যদিও বৃদ্ধি পাচ্ছিল কিন্তু নতুন রাজা স্টিফেন রাজা জনের সহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ পরিত্যাগ করেন। রাজা জনের মত প্রকাশের স্বাধীনতার নীতিও তিনি বাতিল করেন। ফলে একত্ববাদের অনুসারীদের জীবনযাত্রা বিপদসংকুল হয়ে পড়ে। এ সময় বন্দ্রাটা ও সোকিনায়াসের সাথে বিরোধ দেখা দেয়ায় ডেভিডের অবস্থাও সঙ্গিন হয়ে ওঠে। তিনি ছিলেন আপসহীন একত্ববাদী এবং এমনকি পরোক্ষভাবেও তিনি কাউকে ঈশ্বরের অংশীদার করতে রাজি ছিলেন না। সোকিয়ানাস যীশুর প্রতি শ্রদ্ধা ও উপাসনার মধ্যে একটি পার্থক্য রেখা টানেন। কেউ তার উপাসনা করতে পারবে না, কিন্তু শ্রদ্ধা জানাতে পারবে। ডেভিড এটা মানতে পারেন নি। অথচ পোলিশ একত্ববাদীদের কাছেও বিষয়টি আপত্তিকর মনে হয় নি। কারণ, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য ছিল সামান্যই। সাধারণ মানুষের চিন্তায় ও দৈনন্দিন অভ্যাসে এই পার্থক্যের বিষয়টি ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে এবং উপাসনার সময় অকপটে এটা বলা সম্ভব ছিল না যে, কেউ প্রার্থনা করছে না শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

রোমান ক্যাথলিকগণ নতুন রাজার সমর্থন লাভ করে। অন্যদিকে একত্ববাদী আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে বিভক্তি তাদের আরো শক্তি জোগায়। ১৫৭১ খৃস্টাব্দে টরডাতে এক সম্মেলনে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, কিছু যাজক নয়া ধর্মমত প্রবর্তনের জন্য দোষী। ১৫৭৩, ১৫৭৬, ১৫৭৮ খৃস্টাব্দে সম্মেলনেও এ অভিযোগ পুনরায় উত্থাপন করা হয়। এসব অভিযোগ ক্রমশ সুনির্দিষ্ট রূপ নিতে থাকে এবং চূড়ান্তভাবে ফ্রান্সিস ডেভিড তার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। ১৫৭৮ সালে বন্ড্রাটার সাথে রাজার ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্ব গড়ে উঠছিল। ১৫৭৮ সালে বন্ড্রাটা খোলাখুলিভাবে ডেভিডের বিরোধিতা করেন এবং তিনি ডেভিডকে তার ধর্ম আর প্রচার না করার জন্য বলেন। কিন্তু ডেভিড প্রাণভয়ে ভীত হয়ে নিজের বিশ্বাস ত্যাগ করার মত মানুষ ছিলেন না। যে বন্ড্রাটা সারাজীবন একত্ববাদী ধর্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছেন তিনিই শেষ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। বয়োবৃদ্ধ বন্ড্রাটা অবসর চাইলেন। তিনি আর নিজের বা বন্ধুদের ওপর সমস্যা ডেকে আনতে চাইলেন না। তারা জানতেন, ডেভিড যা করছেন তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তারা উপলব্ধি করলেন যে, ডেভিড যদি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন তাহলে সবকিছু সহজ হয়ে যাবে।

কিন্তু ডেভিড তার মতে অবিচল রইলেন। তিনি যে শুধু প্রচার অব্যাহত রাখলেন তাই নয়, উপরন্তু সকল বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে তার বিশ্বাসের কথা লিখতে ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করেন। বন্ড্রাটা ডেভিডের মত পরিবর্তন করার প্রয়াসে সোকিয়ানাসকে ট্রানসিলভানিয়ায় আমন্ত্রণ করেন। সোকিয়ানাস আগমন করেন ও

ডেভিডের আতিথ্য নেন। তার চেষ্টায় কোনো ফল হয় নি। তবে ডেভিড তার লেখালেখি সংক্ষিপ্ত করতে রাজি হন এবং সেগুলো পোলিশ একত্ববাদী চার্চের কাছে পেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ডেভিড তাই করেন এবং মোট চারটি বিষয় প্রণয়ন করেন:

> ঈশ্বরের কঠোর নির্দেশ হলো যে কেউই স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, পিতা ঈশ্বর ছাড়া আর কারো কাছে প্রার্থনা করতে পারবে না।
>
> সত্যের শিক্ষাদাতা যিশুখ্রিষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্বর্গীয় পিতা ব্যতীত আর কারো সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে না।
>
> প্রকৃত প্রার্থনার সংজ্ঞা হলো যা মনে প্রাণে পিতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়।
>
> সাধারণ প্রার্থনার লক্ষ্যবস্তু পিতা, খৃষ্ট নন।

সোকিয়ানাস এ মতের বিরুদ্ধে লেখেন এবং ডেভিড তার মতের সমর্থনে পুনরায় লিখেন। এ আলোচনা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে এবং ধীরে ধীরে তা তিক্ত ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে পৌঁছে। ফল হলো এই যে, বন্ড্রাটা ও ডেভিড খোলাখুলিভাবে পরস্পরের শত্রু হয়ে ওঠেন। একা ক্যাথলিক রাজাকে প্রয়োজনীয় সমর্থন এনে দেয়। ডেভিডকে গৃহবন্দী করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তার সাথে কারো দেখা সাক্ষাৎ ও নিষিদ্ধ করা হয়। এ নির্দেশ কার্যকর হওয়ার আগেই ডেভিড তা জানতে পারেন। তিনি তৎক্ষণাৎ যত বেশি সম্ভাব্য গ্রেফতার সম্পর্কে জনসাধারণকে জানিয়ে দেন।

তিনি ঘোষণা করেন, বিশ্ববাসী যাই করার চেষ্টা করুক না কেন, ঈশ্বর এক- এ কথা সারা বিশ্বের কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।[১২]

গ্রেফতারের পর ডেভিডকে একটি ধর্মীয় সম্মেলনে হাযির করা হয়। বন্ড্রাটা একই সাথে প্রধান কৌসুলী এবং প্রধান সাক্ষীর ভূমিকা পালন করেন। ডেভিডের জন্য এটা ছিল দুঃসহ ধকল এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে একটি চেয়ারে করে বহন করা হতো। তিনি তার হাত-পা নাড়তে পারতেন না। তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং একটি উঁচু পাহাড়ের ওপর নির্মিত ক্যাসলের বন্দীশালায় রাখা হয়। সেখানে তিনি যে ৫ মাস জীবিত ছিলেন, সে সময় তিনি কী পরিমাণ দুরবস্থার শিকার হয়েছিলেন তা কেউ জানে না। ১৫৭৯ খৃস্টাব্দে নভেম্বরে তার মৃত্যু হয় এবং একটি অজ্ঞাত কবরে অপরাধীর মত তাকে কবরস্থ করা হয়।

ডেভিডের মৃত্যুর পর তার কারা কক্ষের দেয়ালে একটি কবিতা লিখিত আছে বলে দেখা যায়। এর অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:

দু'টি দশক আমি নিষ্ঠার সাথে আমার দেশ

ও প্রিন্সের সেবা করেছি

আমার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয়েছে।

আমার কি অপরাধ যে, আমি পিতৃভূমির কাছে ঘৃণিত?

তা হলো শুধু এই: ঈশ্বর একজন, তিনজন নন

আমি এ উপাসনাই করেছি।

এ কবিতার শেষাংশ ছিল এরকম:

বজ্র নয়, ক্রুশ নয়, নয় পোপের তরবারি, নয় মৃত্যুর মুখব্যাদান

সত্যের অগ্রযাত্রা রোধ করে নেই এমন কোনো শক্তি

আমি যা অনুভব করেছি তাই লিখেছি

এক বিশ্বাস পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে আমি কথা বলেছি

আমার মৃত্যুর পর ঘটবে পতন অসত্য মতবাদের।[১৩]

ডেভিড পরলোকগমন করলেও তার আন্দোলন অব্যাহত থাকে। কার্যত বহু বছর ধরে ট্রানসিলভানিয়ার একত্ববাদীদের ফ্রান্সিস ডেভিডের ধর্মের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করা হত। আজ তার মত ও বক্তব্য সহজ, সুস্পষ্ট ও বাইবেল ভিত্তিক বলে গৃহীত হচ্ছে। সকল দায়িত্বশীল ব্যক্তির রায়ই এখন ফ্রান্সিস ডেভিডের পক্ষে যাচ্ছে।[১৪]

ডেভিডের মৃত্যুর ব্যাপারে বড় ভূমিকা পালনকারী বন্ড্রাটা ক্যাথলিকদের ও রাজার কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি এত ধনী ছিলেন যে, তার উত্তরাধিকারী তার স্বাভাবিক মৃত্যুর অপেক্ষা না করে তাকে হত্যা করে। একত্ববাদীদের ওপর নির্যাতন যদিও অব্যাহত ছিল কিন্তু নিপীড়নকারীদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে তা সহায়ক হয় নি। শিগগিরই ডেভিড একজন শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। তার দৃষ্টান্ত

একত্ববাদীদের মধ্যে এমন প্রেরণা যে সংগঠিত নিপীড়ন সত্ত্বেও তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টিকে থাকে।

ট্রানসিলভানিয়ায় একত্ববাদীদের সংখ্যা উল্লেখ যোগ্যভাবে হ্রাস পায়। তবে তুর্কী শাসনাধীন হাঙ্গেরীর দক্ষিণে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। মুসলিম শাসকরা কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী সকল ধর্মের লোকদের শান্তিতে বসবাসের অনুমতি দেন। তবে শর্ত ছিল যে, তারা মুসলিমদের ধর্মাচরণে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। এভাবে খৃষ্টানরা মুসলিম শাসনাধীন পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে যা আর কোনো খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী দেশে ছিল না। এমনকি খৃষ্টানদের তাদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী চলারও অনুমতি দেওয়া হয়। স্বাধীনতার এ সুযোগ গ্রহণ করে একজন ক্যালভিনপন্থী বিশপ ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগে একজন একত্ববাদীর ফাঁসি দেন। অন্য একজন একত্ববাদী এ বিষয়টি বুদার তুর্কি গভর্নরকে অবহিত করেন। গভর্নর ক্যালভিনপন্থী বিশপকে তার সামনে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন। বিচারের পর বিশপ ও তার দু’জন সহকারীকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। একত্ববাদী যাজক দণ্ডপ্রাপ্ত বিশপের পক্ষে হস্তক্ষেপ করেন এই বলে যে, তিনি এ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চান না, তবে তিনি চান যেন এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। এর ফলে অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড রহিত করে তার পরিবর্তে তাদের বিপুল অংকের জরিমানা করা হয়।

তুর্কি সরকারের অধীনে একত্ববাদীগণ প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ শান্তিতে বসবাস করে। তুর্কি শাসনাধীন দেশে তাদের প্রায় ৬০ টি চার্চ ছিল।

তুর্কি সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে তাদের ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতাও খর্ব হয় এবং লোকজনকে আবার বলপূর্বক ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিতকরণ শুরু হয়। যারা ধর্মান্তর গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাত তারা সহিংস নিপীড়নের শিকার হত। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ জনসাধারণের ওপর প্রকাশ্যে নিপীড়ন চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে একত্ববাদীদের সংখ্যা আবার বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। পূর্ব ইউরোপে একত্ববাদী আন্দোলন আজও অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে এবং একত্ববাদের অনুসারীদের হৃদয়ে এখনও ডেভিডের বিপুল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

মুসলিমদের সাথে ফ্রান্সিস ডেভিডের কতটা যোগাযোগ ছিল, সে ব্যাপারে জল্পনা-কল্পনা রয়েছে। নিঃসন্দেহে তার ধর্ম বিশ্বাস ইসলামের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিল এবং কমপক্ষে একটি স্থানে তিনি তার বিশ্বাসের সমর্থনে খোলাখুলিভাবে কুরআনকে উদ্ধৃত করেছিলেন:

কুরআনে একথা কারণ ছাড়া বলা হয় নি যে, যারা যীশুর উপাসনা করত যীশু তাদের কোনো সাহায্য করতে পারবেন না। তারা তাকে ঈশ্বর বলে মনে করত যা ছিল তার ধর্মমতের বিরোধী... সুতরাং তাদেরকে এ জন্য দায়ী করা যায় যে, আমাদের যীশুর উপাসনা করার শিক্ষা কে দিয়েছে যেখানে যীশু নিজে বলেছেন যে, ঈশ্বরের প্রার্থনা কর.... ঈশ্বর তিনজন নন শুধু একজন।[১৫]

(তু. ৫ : ১১৬-১১৭)

ডেভিডের যত নিন্দা বা সমালোচনা করা হোক না কেন, তাকে কখনোই একজন মুসলিম বলা হয় নি। কারণ ক্যালভিনপন্থী ও ক্যাথলিক উভয়েরই আশঙ্কা ছিল যে, এটা তৎকালীন শক্তিশালী তুর্কি শাসকদের একত্ববাদীদের সাহায্যে ডেকে আনবে। একত্ববাদী আন্দোলন যা ইসলামের খুবই নিকটবর্তী ছিল, সম্পর্কে তুর্কি শাসকদের অসতর্কতার কারণ হয়তো এই ছিল যে, তাদের নিজেদের ধর্ম ইসলামের ক্ষেত্রেও অধঃপতনের সূচনা হয়েছিল। ডেভিডের একটি প্রধান সমালোচনা হলো যে, যদি তার মত গ্রহণ করা হত, তাহলে ইয়াহূদী ও খৃষ্টধর্মের মধ্যকার পার্থক্য দূর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং খৃষ্টধর্ম হয়তো ইয়াহূদী ধর্মের মধ্যে পুনরায় মিশে যেত। এমনকি বন্ড্রাটাও ডেভিডকে বিদ্রূপ করত এই বলে যে, তিনি ইয়াহূদী ধর্মে ফিরে যাচ্ছেন। তিনি কখনই ডেভিডের যুক্তি খণ্ডন করেন নি, কিন্তু ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে জনমতকে উসকে দিয়ে তিনি ডেভিডের মর্যাদা হানির চেষ্টা করেছেন। বন্ড্রাটা বোধ হয় একথা ভুলে গিয়েছিলেন যে, প্রত্যেক নবীই তার পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষা পুনর্ব্যক্ত ও কাজ সমর্থন ও সম্প্রসারণের জন্যই এসেছেন। কার্যত ফ্রান্সিত ডেভিডের গুরুত্ব এখানেই যে এক ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে তিনি প্রেরিত পুরুষদের ধারাবাহিকতায় যীশুর আগে ও পরের কোনো নবীর ঐতিহ্যকে অস্বীকার না করে যীশুর অবস্থান সমর্থন করেছেন। উপরন্তু তিনি জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, সত্য বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং যীশুর আদর্শ ও শিক্ষার অনুসরণ ও জীবন-যাপনই ইহকাল ও পরকালের জন্য যথেষ্ট।[১৬,]

## লেলিও ফ্রান্সেসকো মারিয়া সোজিনি

## (Lelio Francesco Maria Sozini) ১৫২৫-১৫৬২ খৃ.

লেলিও সোজিনি ১৫২৫ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে তিনি একজন আইনবিদ হন। এ পর্যায়ে আইন অধ্যয়ন তাকে হিব্রু ও বাইবেলের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করে। তরুণ বয়সে তিনি বোলোগনা ত্যাগ করেন ও ভেনিসের পার্শ্ববর্তী এলাকায় গমন করেন। সেখানে তখন কিছুটা ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল যা ইতালির আর কোনো অংশে ছিল না। সারভেটাসের রচনা সেখানে সমাদৃত হতো এবং অনেকেই তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ওয়ালেস তার "এন্টি ট্রিনিটারিয়অন বায়োগ্রাফি" গ্রন্থে লিখেছেন যে, সারভেটাসের অনুসারীদের মধ্যে ভেনিসের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কর্মকর্তাও ছিলেন।[১৭] কিন্তু সিনেট সারভেটাসের অনুসারীদের প্রকাশ্য কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার প্রেক্ষিতে তারা গোপনে মিলিত হতে শুরু করেন। খৃষ্টধর্মের সত্য রূপ জানা এবং যীশুর প্রকৃত শিক্ষাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। "হিষ্টরি অব দি রিফরমেশন ইন পোলান্ড" গ্রন্থে লুবিনিয়েটস্কি (Lubinietski) লিখেছেন:

তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এক ঈশ্বর ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই। যীশু প্রকৃতই একজন রক্ত- মাংসের মানুষ ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতায় কুমারী মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রি-ঈশ্বর এবং যীশুর ঈশ্বরত্ব মতবাদের উদ্যোগতা হলো পৌত্তলিক দার্শনিকগণ।[১৮]

ওয়ালেস (Wallace) লিখেছেন, লেলিও এসব লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের মতে মুগ্ধ হয়ে তারুণ্যের উৎসাহ নিয়ে ধর্মীয় সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত হন।[১৯] ক্যামিলো (Camillo) নামক একজন ধর্মজ্ঞানী ব্যক্তি তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। তার সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তখন পর্যন্ত তার মন প্রতিষ্ঠিত চার্চের কঠোর ধর্মমতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু এখন তিনি নতুন এক স্বাধীনতা অনুভব করলেন যা তিনি আগে লাভ করেন নি। তিনি জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেলেন এবং সত্যের সন্ধানে নিজেকে আজীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। জানা যায় যে, আজ যা ভিনেসেনজার গুপ্ত (Secret Society of Vincenza) সমিতি নামে পরিচিত, সেদিন এ সমিতির সদস্যদের সংখ্যা ছিল ৪০ এরও বেশি। এক সময় এ গুপ্ত সমিতির অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়লে সদস্যদের অনেককেই গ্রেফতার করা হয়। কারো কারো মৃত্যুদণ্ড হয়। অন্যদিকে ভাগ্যবান সদস্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হন ও অন্যান্য দেশে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। লেলিও সোজিনি ছাড়া এ সমিতির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ওচিনাস, ডারিয়াস সোজিনি (লেলিওর জ্ঞাতিভ্রাতা), আলসিয়াটি ও বুকালিস। একটি জোর ধারণা চালু আছে যে, শেষোক্ত দু’জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ডাঃ হোয়াইট তার ব্রম্পটন বক্তৃতায় (Brompton Lectures) সোজিনির অনুসারীদের “আরবের নবীর অনুসারী” বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২০]

একদিকে এ সমিতির অস্তিত্ব যখন গোপন ছিল, অন্যদিকে লেলিও সোজিনির দৃষ্টি এর বাইরের দু’ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এদের

একজন সারভেটাস, অন্যজন ক্যালভিন। সারভেটাসের একত্ববাদে তার বিশ্বাসের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণার সাহস ছিল, অন্যদিকে ক্যালভিন নিজেকে ইউরোপের সংস্কারবাদী গোষ্ঠীর সমতুল্য একটি শক্তি হিসেবেই নিজের পরিচয় দিতেন।

সোজিনি প্রথমে ক্যালভিনের সাথে সাক্ষাৎ করতে মনস্থ করেন। কিন্তু তার সাথে সাক্ষাতের পর সোজিনি দেখতে পান যে, একজন রোমান যাজকের মতই ক্যালভিন এক অনুদার মানসিকতার ব্যক্তি। এতে তিনি খুবই হতাশ হন। তার এ মনোভাব অবিলম্বেই বিস্ফোরণোন্মুখ রূপ পরিগ্রহ করে যখন তিনি আবিষ্কার করেন যে, সারভেটাসকে গ্রেফতারের ব্যাপারে ক্যালভিন সাহায্য করেছিলেন। তখন থেকে সোজিনি সারভেটাসের মতবাদে আস্থা স্থাপন করেন। ক্যামিলোর অনুপ্রেরণায় তিনি প্রতিষ্ঠিত চার্চের গৃহীত মতবাদ সমূহের ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণা অব্যাহত রাখেন।

১৫৫৯ সালে তিনি জুরিখ গমন করেন। সেখানেই তার জীবনের শেষ তিন বছর গভীর অধ্যয়নের মধ্যে অতিবাহিত হয়। ১৫৬২ সালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

### ফাউস্টো পাওলো সোজিনি (Fausto Paolo Sozini) ১৫৩৯-১৬০৪ খৃস্টাব্দ

লেলিও সোজিনির ভ্রাতুষ্পুত্র ফাউস্টো পাওলো সোজিনি ১৫৩৯ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতৃব্য স্বল্পকালীন অথচ ফলপ্রসূ জীবনে যা অর্জন করেছিলেন, তার সবই ভ্রাতুষ্পুত্রকে দিয়ে যান। ২৩ বছর বয়সে

জনসাধারণের কাছে সোকিয়ানাস নামে পরিচিত ফাউষ্টো সোজিনি শুধু লেলিওরই নয়, ক্যামিলো ও সারভেটাসেরও উত্তরসূরীতে পরিণত হন। পিতৃব্যের কাছ থেকে মহামূল্য উপহার হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন বিপুল সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ও ব্যাখ্যামূলক নোট।

সোকিয়ানাস তার জন্মস্থান সিয়েনায় (Sienna) প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি লিয়ঁ ও জেনেভা গমন করেন। ১৫৬৫ খৃস্টাব্দে তিনি ইতালিতে ফিরে আসেন। তিনি ফ্লোরেন্স যান এবং ইসাবেলা দ্য মেডেসির (Issabella de Medeci) অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেন। ইসাবেলার মৃত্যুর পর তিনি ইতালি ত্যাগ করেন ও বাসিলেতে বাস করতে শুরু করেন। তরুণ পণ্ডিত সেখানে খুব শিগগিরই ধর্মতত্ত্বে আগ্রহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। তিনি বেনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে গোপনে বিতরণ করেন, কারণ চার্চের অনুশাসনের সাথে প্রকাশ্যে মতপার্থক্য প্রকাশ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল।

ফাউস্টো সোজিনির গ্রন্থটি পোলান্ডের রাজ দরবারে চিকিৎসক বন্ড্রাটার (Blandrata) হাতে পৌঁছে। এ পর্যায়ে চেপে বসা শাসরোধকর পরিস্থিতি থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করার সাহস, মন, ক্ষমতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বন্ড্রাটার ছিল। শাসকদের ধর্ম সহিষ্ণুতা ধর্ম নিয়ে মুক্ত আলোচনায় আগ্রহী ও চার্চের স্থূল অনুশাসন মানতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য পোলান্ডকে আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত করেছিল। বন্ড্রাটা সোকিয়ানাসকে পোলান্ডে আসার আমন্ত্রণ জানান। সোকিয়ানাস

আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করেন। তিনি পোলান্ডে মুক্ত ও আন্তরিক পরিবেশ দেখতে পান। তিনি চার্চের নিপীড়ন, ভয় মুক্ত পরিবেশে স্বনামে লেখার স্বাধীনতা লাভ করেন। পোলান্ডে এসে যদিও তিনি প্রাণে রক্ষা পান, কিন্তু ইতালিতে তার সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। সোকিয়ানাস একজন পোলিশ মহিলাকে বিয়ে করেন এবং স্বদেশের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

পোলান্ডের শাসকরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করতেন না। তবে তারা তখনও অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন। তারা জানতেন না যে, একটি ইতিবাচক ধর্মমত প্রণয়নে কী পদক্ষেপ নিতে হবে। সোকিয়ানাসের উপস্থিতি এ অভাব পূরণ করে এবং শাসক ও জনগণও তাতে স্পষ্টতই সন্তুষ্ট হয়। পিতৃব্যের কাছ থেকে লব্ধ জ্ঞান ও নিজস্ব অধ্যয়নের সুফলের সমন্বয় ঘটেছিল সোকিয়ানাসের মেধা ও মননে এবং চার্চের ওপর তার লেখার শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল।

ক্রুদ্ধ চার্চ তাকে গ্রেফতার করে এবং তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সোকিয়ানাসের প্রতি জনসমর্থন এত বিপুল ছিল যে, আদালত তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। তবুও তাদের বিচারের ফলাফলের বিরাট গুরুত্ব প্রদর্শন করতে তাকে ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। চার্চ ধর্মীয় বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্য জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারার পাশাপাশি ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে হত্যার এ বিধানকে জুডিকাম ডেই (Judicum dei) বা ঈশ্বরের বিচার নামে আখ্যায়িত করত যদিও তা কখনোই যিশুখ্রিষ্ট বা পলের শিক্ষার অংশ

ছিল না। এ শাস্তিতে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে গভীর পানিতে নিক্ষেপ করা হতো। যদি সে ডুবে যেত তাহলে সে দোষী প্রমাণিত হতো। সোকিয়ানাস সাঁতার জানতেন না, একথা ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও যাজকরা তাকে সাগরে নিক্ষেপ করে। যেভাবেই হোক তিনি প্রাণে বেঁচে যান এবং ১৬০৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

১৬০৫ খৃস্টাব্দে সোকিয়ানাসের সব রচনা একত্র করে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। রোকোউ (Rokow) তে গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার কারণে সাধারণের কাছে একটি রাকোভিয়ান ক্যাথেসিজম (Racovian Cathechism) নামে পরিচিত হয়। পোলিশ ভাষায় প্রকাশিত এ গ্রন্থটি ইউরোপের প্রায় সকল ভাষায় অনুদিত হয়। তার মতাদর্শ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং তার ধর্মীয় চিন্তাধারা সোকিয়ানবাদ (Socianism) নামে পরিচিতি লাভ করে। হারনাক তার "আউটলাইনস অব দি হিষ্টরি অব ডগমা" গ্রন্থে সোকিয়ানবাদকে খৃষ্টীয় ধর্মমতের চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বশেষ হিসেবে রোমান ক্যাথলিকবাদ ও প্রটেস্টাণ্টবাদের সম পর্যায়ে স্থাপন করেছেন। অবশ্য এটা সোকিয়ানাসের প্রাপ্য। কারণ তার জন্যই সে সময় একত্ববাদীরা আধুনিক খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে এক পৃথক পরিচিতি লাভ করেছিল। হারনাক সোকিয়ানবাদের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেছেন:

> এতে রয়েছে ধর্মের বাস্তবতা ও বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহ সহজ করে তোলার এবং চার্চ প্রবর্তিত ধর্মের বোঝা প্রত্যাখ্যানের সাহস।

এটা ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে এবং খৃষ্টধর্ম ও প্লাটোনিজমের মধ্যে চুক্তির বন্ধন ভেঙে দিয়েছে।

এটা এ ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছে যে, ধর্মকে শক্তিশালী করতে হলে ধর্মীয় সত্যের বিবরণ সুস্পষ্ট ও উপলব্ধিযোগ্য হতে হবে।

এটা বাইবেলে যা নেই সেই প্রাচীন ধর্মমতের বন্ধন থেকে পবিত্র বাইবেলের অধ্যয়নকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছে। কেউ একজন বলেছেন যে, "সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা হলো যাজকদের রাজস্ব।" সোকিয়ানবাদ এ দু'টিকেই হ্রাস করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে।

সোকিয়ান ধর্মতত্ত্ব ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডেও তা বিস্তৃত হয়। নরউইচের বিশপ হলো (Bishop Hall) বিলাপ শুরু করেন যে, ত্রিত্ববাদ বিরোধী ও নয়া ধর্মানুসারীদের দ্বারা নারকীয় সোকিয়ান ধর্মমতের মাধ্যমে খৃষ্টানদের মন বিপথগামী হয়েছে। ফলে খৃষ্টধর্মের চূড়ান্ত ধ্বংসের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।[২১] ১৬৩৮ খৃস্টাব্দে সোকিয়ানদের ওপর নির্মম ও সংগঠিত নিপীড়ন শুরু হয়। রোকোউতে তাদের কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সোকিয়ানাসের অনুসারীরা সকল নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী বহু লোককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে ক্যাথেরিন ভোগালের (Catherine Vogal) কথা বলা যেতে পারে। পোলান্ডের এক অলংকার ব্যবসায়ীর স্ত্রী ক্যাথেরিনকে ৮০ বছর বয়সে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। তার অপরাধ ছিল এই যে, তিনি

বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর একজন, তিনিই দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য বিশ্বের স্রষ্টা এবং মানবিক বুদ্ধি তাঁর নাগাল পায় না। এটা আসলে অকৃত্রিম ইসলামি বিষয়। ফুলার লিখেছেন যে সোকিয়ানাসের অনুসারীদের এভাবে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার বীভৎস ব্যাপারটি সাধারণ মানুষকে স্তম্ভিত করে... এবং তারা ভালো চিন্তাগুলো এমনকি ধর্মবিরোধীদের মতও সাদরে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল যারা রক্ত আখরে খচিত করেছিল নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসকে।[২২] ওয়ালেস বলেন, সেজন্যই প্রথম জেমস আগুনে পুড়িয়ে হত্যার বদলে তাদের বই পুড়িয়ে দেওয়ার অধিকতর কম ক্ষতিকর নীতি গ্রহণ করেন।[২৩]

১৬৫৮ খৃস্টাব্দে জনসাধারণকে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ অথবা নির্বাসনে যাওয়ার যে কোনো একটিকে বেছে নিতে বলা হয়। ফলে একত্ববাদীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তবে তাদের ধর্ম বিশ্বাস থেকে তারা বিচ্যুত হয় নি এবং দীর্ঘদিন নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় বজায় রাখে।

রাকোভিয়ান ক্যাথেসিজমে বিধৃত লেখায় সোকিয়ানাস প্রায়শ্চিত্ত মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে গোঁড়া খৃষ্টধর্মের মর্ম মূলে আঘাত হেনেছিলেন। যীশু ক্রুশবিদ্ধ হন নি কিংবা পুনরুজ্জীবিতও হন নি, সুতরাং এ মতবাদ সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। সোকিয়ানাস যীশুর জীবনের শেষ পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকলেও তিনি অন্যান্য ভিত্তিতে এ মতবাদের অসারতা প্রমাণে সক্ষম ছিলেন। সংক্ষেপে বললে, প্রায়শ্চিত্ত মতবাদের অনুসারীরা প্রচার করতে থাকে যে আদমের প্রথম ভুল কাজের জন্য

মানুষ পাপী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। যীশু তার ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে এ পাপ এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণকারী তার অনুসারী সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। গোঁড়া খৃষ্টধর্ম অনুসারে চার্চ হলো একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও পবিত্র সমাজ যা যিশুখ্রিষ্ট মানুষের কাজের জন্য তার প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শুধুমাত্র এ সমাজের মধ্যে থেকে এবং তার সেবার মাধ্যমে পাপী মানুষ ঈশ্বর লাভের পথ খুঁজে পেতে পারে। এ কারণে চার্চ বিশ্বাসী ব্যক্তির চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। সোজিনি-এর সবকিছুই প্রত্যাখ্যান করেন তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, একজন মানুষ কোনো মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই সরাসরি ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে। আত্মার মুক্তির জন্য খৃষ্টধর্ম নয়, সঠিক বিশ্বাস প্রয়োজন, অন্ধভাবে চার্চকে অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। প্রায়শ্চিত্ত মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে সোকিয়ানাস সমগ্র চার্চের কর্তৃত্ব ও অস্তিত্ব সম্পর্কেই প্রশ্নের সৃষ্টি করেন। প্রধানত এই কারণেই ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টান্টরা কোসিয়ানাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পরস্পরের সাথে হাত মিলিয়েছিল। সোকিয়ানাস নিম্নোক্ত ভিত্তিতে প্রায়শ্চিত্ত মতবাদ খণ্ডন করেন:

যিশুখ্রিষ্ট আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন নি। গসপেলের বর্ণনা অনুযায়ী যীশু অল্প সময়ের জন্য যন্ত্রণাভোগ করেন। মানুষকে যে অনন্তকালীন যন্ত্রণাভোগ করতে হবে তার সাথে তুলনায় স্বল্প সময়ের খুব তীব্র যন্ত্রণা কিছুই নয়। যদি এ কথা বলা হয় যে, এ যন্ত্রণা ছিল অতি ভয়ানক কারণ যিনি তা ভোগ করেন তিনি ছিলেন অনিঃশেষ ব্যক্তির যন্ত্রণাও অনন্ত যন্ত্রণার কাছে কিছুই নয়।

যদি স্বীকার করে নেওয়াও হয় যে, যীশুখ্রিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন তাহলেও সৃষ্টিকর্তার ক্ষমা অথবা তার ক্ষমার জন্য তার প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কথা বলা অসম্ভব, যেহেতু যে ব্যক্তি যীশুখৃষ্টের নামে দীক্ষিত হয়ে সৃষ্টিকর্তা তার পাপ ক্ষমা করার আগেই সে স্বংয়ক্রিয়ভাবে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে যায়। এ মতবাদ অনুসরণ করার অর্থ সৃষ্টিকর্তার আইন তার বান্দাদের জন্য আর বাধ্য-বাধকতামূলক থাকে না। যেহেতু ইতোমধ্যে তার সকল পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি তার যা খুশি করার স্বাধীনতা পেয়ে যায়। যেহেতু যীশুখৃষ্টের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণাঙ্গ ও অনন্ত, সুতরাং সকলেই তার আওতাভূক্ত। তাই চিরকালীন মুক্তি অবধারিত হয়ে যায়। অন্য কথায়, মানুষকে নতুন কোনো শর্ত দেওয়ার অধিকার ঈশ্বরের নেই। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে, সে কারণে সকল ঋণ গ্রহীতাই এখন মুক্ত। ধরা যাক, একদল লোক একজন জাগতিক ঋণদাতার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়েছে এবং কোনো একজন তা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করল। এর পর ঐ ঋণদাতার কি ওইসব ঋণ গ্রহীতার কাছে আর কোনো দাবি থাকবে যারা আর তার কাছে ঋণী নয়?

যীশু ঈশ্বর নন, একজন মানুষ, একথা ব্যক্ত করে সোকিয়ানাস পরোক্ষভাবে প্রায়শ্চিত্ত মতবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কোনো ব্যক্তিই সমগ্র মানবজাতির অসৎ বা ভুল কাজের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে না। এ সত্যটি এই কাল্পনিক মতবাদ খণ্ডন করার জন্য যথেষ্ট।

সোকিয়ানাস জোর দিয়ে বলেছেন যে, যীশু একজন মরণশীল মানুষ ছিলেন। তিনি এক কুমারী মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবনের পবিত্রতার জন্য তিনি অন্য সকল মানুষ থেকে পৃথক ছিলেন। তিনি ঈশ্বর ছিলেন না, কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। তার অলৌকিক দৃষ্টি ও শক্তি ছিল। কিন্তু তিনি তার স্রষ্টা ছিলেন না। ঈশ্বর মানবজাতির কাছে এক মিশনে তাকে প্রেরণ করেছিলেন। বাইবেলের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে সোকিয়ানাস এসব বিশ্বাসকে সমর্থন করেন। তার সূক্ষ্ম ও বলিষ্ঠ যুক্তি যীশুখৃষ্ট সম্পর্কে একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করে। তিনি বলেন, যীশু তার জীবনে সকল অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছেন। বিশ্ব সৃষ্টির আগে তার সৃষ্টি হয় নি। প্রার্থনার সময় যীশুর সাহায্য কামনা করা যেতে পারে যদি না ঈশ্বর হিসেবে তার উপাসনা করা হয়।

সোকিয়ানাস দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেন যে ঈশ্বর সর্বোচ্চ প্রভু। সর্বশক্তিমান তার একমাত্র গুণ নয়, তিনি সকল গুণের অধিকারী। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় না। সীমা- অসীমের পরিমাপ হতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের সকল ধারণাই অপর্যাপ্ত এবং শুধু এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের বিচার করা যায় না। ঈশ্বর স্বাধীন, স্ব-ইচ্ছা সম্পন্ন এবং মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত কোনো আইনের তিনি আওতাধীন নন। তার উদ্দেশ্য এবং তার ইচ্ছা মানুষের অগোচর। তিনি মানুষের এবং অন্য সকল বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব সম্পন্ন এবং সব কিছুই তার ইচ্ছাধীন। তিনি অন্তরের অন্তস্থলে লুকিয়ে রাখা গোপন কথাটিও জানেন। যিনি ইচ্ছামতো বিধি-

বিধান তৈরি করেন এবং সৎকাজ ও অসৎ কাজের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করেন। ব্যক্তি হিসেবে মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কার্যত সে ক্ষমতাহীন।

সোকিয়ানাস বলেন, সকল কিছুর ওপর সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী সত্ত্বা একজনের বেশি হতে পারেন না। সুতরাং তিনজন সর্বশক্তিমানের কথা বলা অযৌক্তিক। ঈশ্বর একজনই, সংখ্যায়ও তিনি এক। ঈশ্বরের সংখ্যা কোনো ক্রমেই একাধিক নয়। প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সত্ত্বা রয়েছে। ঈশ্বর যদি সংখ্যায় তিনজনই হবেন তাহলে তিনটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা ও থাকার কথা। যদি এটাই বলা হয় যে, একটি মাত্র সত্ত্বাই বিরাজমান তাহলে এটাও সত্য যে, সংখ্যার দিক দিয়েও ঈশ্বর একজনই।

সোকিয়ানাস যে যুক্তি দিয়ে ত্রিত্ববাদের বিষয় খণ্ডন করেছেন তা হলো যীশুর একই সাথে দু'টি বৈশিষ্ট্য থাকা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, একই ব্যক্তির মধ্যে দু'টি বিপরীত গুণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সত্ত্বার সমাবেশ ঘটতে পারে না। আর এ ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো মরণশীলতা ও অ-মরণশীলতা, আদি ও অনাদি, পরিবর্তন ও পরিবর্তনহীনতা। আবার দু'টি বৈশিষ্ট্য যার প্রতিটি একটি পৃথক ব্যক্তিসত্তা গঠনে সক্ষম, এক ব্যক্তির মধ্যে তাদের সমন্বয় করা যেতে পারে না। তাই একজনের পরিবর্তে প্রয়োজনের তাগিদেই এক্ষেত্রে দু'ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে এবং পরিণতিতে দু'জনই যীশু খৃষ্টে পরিণত হন। একজন ঈশ্বর, অন্যজন মানুষ। চার্চ বলে যে, যীশুখ্রিস্টের ঐশ্বরিক ও মানবিক সত্ত্বা রয়েছে

যেমনটি মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। সোকিয়ানাস জবাব দেন যে, উভয়ের মধ্যে তুলনা চলে না। কেননা একজন মানুষের ক্ষেত্রে দেহ ও আত্মা এমনভাবে সংযুক্ত যে, একজন মানুষ শুধু না আত্মা না শরীর। শুধু আত্মা বা শুধু দেহ দিয়ে কোনো মানুষ সৃষ্টি হয় না। পক্ষান্তরে ঐশীশক্তি নিজেই প্রয়োজনে একটি মানুষ সৃষ্টি করে। একইভাবে মানুষ নিজেও এক পৃথক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করে।

সোকিয়ানাস বলেন, শুধু তাই নয়, এটা বাইবেলের কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে না যে, যীশুখৃষ্টের ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। প্রথমত, ঈশ্বর যীশুকে সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত, বাইবেলের মতে তার সবই ঈশ্বরের দান। চতুর্থত, বাইবেলে সুস্পষ্টভাবে আভাস দেওয়া হয়েছে যে, যীশু সকল অলৌকিক ঘটনার উৎস হিসেবে তার নিজের বা কোনো ঐশ্বরিক গুনের কথা উল্লেখ করেন নি, বরং ঈশ্বরকেই এসবের উৎস বলে ব্যক্ত করেছেন। যীশু নিজেও ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

রেলান্ড (Reland)- এর ‘হিষ্টারিকাল অ্যান্ড ক্রিটিকাল রিফ্লেকশনস আপন মোহামেডানিজম এন্ড সোকিয়ানিজম’ (Historical and Critical Reflections upon Mohammedanism and Socianism) গ্রন্থে রাকাভিয়ান ক্যাতেসিজম সম্পর্কিত বক্তব্যের কিছু অংশ নিচে দেওয়া হলো:

> যিশুখ্রিস্টকে ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করার কথা যারা বলেন তা শুধু সঠিক যুক্তির বিপরীতই নয়, এমনকি তা পবিত্র বাইবেলেও পরিপন্থী এবং যারা বিশ্বাস করে যে, শুধু পিতাই নন, তার পুত্র

এবং পবিত্র আত্মাও একই ঈশ্বরের মধ্যে ত্রয়ী সত্ত্বা, তারাও মারাত্মক ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে... ঈশ্বরের সত্ত্বা অত্যন্ত সহজ এবং সম্পূর্ণ একক। সুতরাং তারা যদি তিন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে আরেকজন ঈশ্বরের কথা বলা একেবারেই পরস্পর বিরোধী এবং পিতা তার নিজস্ব সত্ত্বায় একটি সন্তানের জন্মদান করেছেন বলে আমাদের প্রতিপক্ষের দুর্বল ক্ষুদ্র যুক্তি উদ্ভট ও অপ্রাসঙ্গিক... নিসিয়ার কাউন্সিলের সময় পর্যন্ত সকল সময় এবং কিছু সময় পরও সমসাময়িকদের লেখায় পিতা ঈশ্বরকেই প্রকৃত ঈশ্বর বলে স্বীকার করা হত বলে দেখা যায়। যারা বিপরীত মতের অধিকারী ছিলেন, যেমন সাবেলিয়ান (Sabellian) এবং তার সমমনাদের প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী বলে গণ্য করা হতো... যিশুখ্রিস্ট বিরোধী চেতনা খৃষ্টীয় চার্চের মধ্যে সবচাইতে বেশি মারাত্মক ভুলের প্রচলন করেছে এই মতবাদে যে ঈশ্বরের অত্যন্ত সহজ সত্ত্বায় রয়েছে তিন জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি যাদের প্রত্যেকেই এক একজন ঈশ্বর এবং পিতাই শুধু একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বর নন, পুত এবং পবিত্র আত্মাও অবশ্যই একই রকম ঈশ্বর। সত্যের এর চেয়ে অধিক অবাস্তব, অধিক অসম্ভব এবং অপলাপ আর হতে পারে না... খৃষ্টানরাও বিশ্বাস করে যে, যীশুখৃষ্ট আমদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং আমাদের পাপের স্খালন করেছেন। কিন্তু এই মত মিথ্যা, ভ্রান্তিপূর্ণ ও ক্ষতিকারক।[২৪]

সোকিয়ানাস বলেছেন যে, ত্রিত্ববাদ গ্রহণের অন্যতম একটি কারণ হলো পৌত্তলিক দর্শন। টোল্যান্ডের "দি নাজারেনিস" (Nazarenes) গ্রন্থে সে আভাস দেওয়া হয়েছে:

সোকিয়ানাসের মতানুসারী এবং অন্যান্য একত্বাবাদীরা অত্যন্ত আস্থার সাথে বলেন যে, যারা ইয়াহূদী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল না তারাই খৃষ্টধর্মে তাদের সাবেক একাধিক ঈশ্বরবাদ ও মৃত মানুষকে ঈশ্বরত্ব আরোপের মতবাদ প্রচলন করেছে: এগুলোতে খৃষ্টধর্মের নাম বহাল রয়েছে কিন্তু বিষয়ের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং সকল মত ও প্রথার সাথে সংগতি রেখে নিজেদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে এরা তা কাজে লাগাচ্ছে।[২৫]

এটা সুস্পষ্ট যে, সোকিয়ানাসের রচনা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল। তিনি জনসাধারণের কাছে যীশু কে ছিলেন এবং কী জন্য তিনি এসেছিলেন সে ব্যাপারে সঠিক চিত্রই শুধু তুলে ধরেননি, উপরন্তু মানুষের ওপর চার্চ যে বিপুল ক্ষমতা প্রয়োগ করত, তার অধিকাংশই ধ্বংস করেছিলেন। সোকিয়ানাসের শ্রেষ্ঠত্ব এখানে যে তিনি এমন এক ধর্মমতের ধারক ছিলেন যা ছিল যৌক্তিক এবং বাইবেলভিত্তিক। তার বিরোধীদের পক্ষে তার মতামত বাতিল করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনার কথা বলা যায়। ১৬৮০ খৃস্টাব্দে রেভারেন্ড জর্জ অ্যাশওয়েল (Ashwell) যখন দেখলেন যে, সোকিয়ানাসের গ্রন্থগুলো তার ছাত্রদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তখন তিনি নিজে সোকিয়ান ধর্মের ওপর একটি গ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত নেন। সোকিয়ানাস সম্পর্কে তার মূল্যায়ন অত্যন্ত

কৌতুহলোদ্দীপক যেহেতু তিনি এ মূল্যায়ন করেছেন একজন শত্রু হিসেবে:

এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক এক অত্যন্ত মহৎ ব্যক্তি যার মধ্যে সকল গুণের সমাবেশ ঘটেছিল এবং তিনি মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। যাদের সাথে তিনি কথা বলতেন তাদের সকলকেই তিনি মুগ্ধ করতেন। তিনি সকলের মনে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ছাপ রেখেছিলেন। তিনি তার প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তার যুক্তি বিন্যাস ছিল অত্যন্ত জোরালো, তিনি ছিলেন বিরাট বাগ্মী। তার সদ্গুণ সকলের কাছেই ছিল অসাধারণ। তার মহৎ চরিত্র ও জীবন ছিল উদাহরণযোগ্য এবং সে কারণেই তিনি মানুষের শ্রদ্ধা লাভ করেছেন।

এসব কথা বলার পর অ্যাশওয়েল বলেছেন যে, কোসিয়ানাস ছিলেন "শয়তানের বড় ফাঁস বা ফাঁদ।"[২৬]

তবে আজকের দিনে বহু খৃষ্টানই সোকিয়ানাস সম্পর্কে রেভারেন্ড অ্যাশওয়েলের স্ববিরোধী মন্তব্যের সাথে একমত নন। কার্যত সোকিয়ানাসের প্রতি সহানুভূতি ব্যাপকভাবে বাড়ছে। যে নির্মমভাবে এই মতবাদ দমন করা হয়েছিল তাতে অনেকের সহানুভূতিরই উদ্রেক করে। উপরন্তু ত্রিত্ববাদের প্রতি সুনির্দিষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। বহু চিন্তাশীল খৃষ্টান সোকিয়ানাসের বিশ্বাসকে সমর্থন এবং যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বর ঘোষণার ধর্মমতকে প্রত্যাখ্যান করছেন।

**জন বিডল (John Biddle) ১৬১৫-১৬৬২ খৃ.**

ইংল্যান্ডে একত্ববাদের জনক জন বিডল ১৬১৫ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি বিদ্যাবুদ্ধিতে তার শিক্ষকদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজেই নিজের শিক্ষকে পরিণতি হয়েছিলেন বলে বর্ণিত আছে।[২২] তিনি ১৬৩৪ খৃস্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৬৩৮ খৃস্টাব্দে তিনি বি.এস. এবং ১৬৪১ খৃস্টাব্দে এম.এস. ডিগ্রি লাভ করেন। অক্সফোর্ড ত্যাগের পর তিনি গ্লুচেষ্টারে সেণ্ট মেরি দ্যা ক্রিপস ফ্রি স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি তার ধর্ম বিশ্বাস পুনর্বিবেচনা করতে শুরু করেন এবং এ পর্যায়ে ত্রিত্ববাদী ধর্মমতের বৈধতার ব্যাপারে তার মনে সন্দেহ জাগতে শুরু করে। সে সময় সোকিয়ানাসের মত ও রচনা ইংল্যান্ডে পৌঁছতে শুরু করেছিল। তিনিও ইউরোপীয় একত্ববাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হন। রাজা জেমসকে উৎসর্গ করা রাকোভিয়ান ক্যাথেসিজম এর ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত একটি গ্রন্থ ইংল্যান্ডে প্রেরণ করা হয়। ১৬১৪ খৃস্টাব্দে জল্লাদ প্রকাশ্যে তা পুড়িয়ে দেয়। যদিও গ্রন্থটি পুড়িয়ে ফেলা হয় কিন্তু তার বিষয়বস্তু জনমনে আগ্রহের সৃষ্টি করে। এ ঘটনার নিন্দা জানানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ক্রমওয়েলের অধীনে কাউন্সিল অব ষ্টেট কর্তৃক জন ওয়েনকে সোকিয়ানাসের ধর্মমত খণ্ডনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, ভেবো না যে, এসব জিনিসের সাথে তোমাদের সম্পর্ক অতি সামান্য। শয়তান এখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখন ইংল্যান্ডের একটি নগর, শহর বা গ্রামও নেই যেখানে এ বিষয়ে কিছু না কিছু অংশ ছড়িয়ে পড়ে নি।[২৮]

চার্চের গৃহীত ধর্মমত সমুন্নত রাখার এ চেষ্টা বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। ইউলিয়াম লিলিংওয়ার্থ (১৬০২-১৬৪৪খৃ.) মানুষের নির্যাতন, পুড়িয়ে মারা, অভিশাপ প্রদান ও ক্ষতি করার মত অপকর্মগুলোকে ঈশ্বর কর্তৃক মানুষের জন্য নির্ধারিত নয় বলে নিন্দা করেন। [২৯] জেরেমি টেলর ও মিলটন উভয়েই বলেন যে, ধর্ম বিশ্বাসের অনুসরণ ধর্মদ্রোহিতা নয়। কেউ যদি অসৎ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে সেটাই ক্ষতিকর।[৩০] এ বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং ত্রিত্ববাদের অনুসারীরা আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৬৪০ খৃস্টাব্দে জুন মাসে ক্যান্টারবেরি ও ইয়র্কের সম্মেলনে সোকিয়ানাসের গ্রন্থসমূহের আমদানি, মুদ্রণ ও বিতরণ নিষিদ্ধ দেওয়া হয় এবং হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয় যে, এ ধর্মমতে কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে গির্জা হতে বহিষ্কার করা হবে। একদল লেখক ও বুদ্ধিজীবী এ সিদ্ধান্তের নিন্দা করলেও ফলপ্রসূ হয় নি।

পুনর্মূল্যায়ন ও নতুন পরীক্ষার এ পরিবেশে বিশেষ করে ত্রিত্ববাদসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিডলের নিজের মতেও পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি তার উপলব্ধ বিশ্বাস সম্পর্কে খোলাখুলি কথাবার্তা বলতে থাকেন। এর ফল হিসেবে ম্যাজিস্ট্রেটগণ ১৬৪৪ খৃস্টাব্দে তাকে লিখিতভাবে ধর্মীয় স্বীকারোক্তির নির্দেশ প্রদান করেন। খুব সহজ ভাষায় তিনি সেটা করেন। আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর নামে একজনই সর্বশক্তিমান সত্ত্বা রয়েছেন। সুতরাং ঈশ্বর একজনই।[৩১]

বিডল এ সময় একটি প্রচারপত্রও প্রকাশ করেন। এর শিরোনাম ছিল, “পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব খণ্ডন করে ১২ টি যুক্তি” (Twelve

Arguments Refuting the Deity of the Holy Spirit) “খৃষ্টান পাঠক সমাজকে সম্বোধন করে এটি প্রকাশ করা হয়। ১৬৪৫ খৃস্টাব্দে এ গ্রন্থটি আটক এবং বিডলকে কারাগারে অন্তরিন করা হয়। তাকে পার্লামেন্টের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য তলব করা হয়, কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মাকে ঈশ্বর হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ১৬৪৭ খৃস্টাব্দে তিনি আবার প্রচারপত্র পুনর্মুদ্রণ করেন। এ বছরই ৬ সেপ্টেম্বর পার্লামেন্ট প্রচারপত্রগুলো পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য জল্লাদকে নির্দেশ দেয় এবং তা পালিত হয়। ১৬৪৮ সালের ২ মে এক কঠোর অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এতে বলা হয় যে, কেউ যদি ত্রিত্ববাদে, অথবা যীশু অথবা পবিত্র আত্মাকে অস্বীকার করে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

যে গ্রন্থের কারণে এই কঠোর শাস্তির বিধান জারি করা হয়, সেই “টুয়েলভ আর্গুমেন্টস” এর সারাংশ নিম্নরূপ:

1) যে ঈশ্বর থেকে পৃথক সে ঈশ্বর নয়
   পবিত্র আত্মা ঈশ্বর থেকে পৃথক

   অতএব, পবিত্র আত্মা ঈশ্বর নয়।

বিডল নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে এ যুক্তির ব্যাখ্যা প্রদান করেন:

> প্রধান সূত্রটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, যদি আমরা বলি পবিত্র আত্মাই ঈশ্বর এবং তারপর যদি তাকে ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র, সমগ্র বাইবেল তা দ্বারা সমর্থিত। পবিত্র আত্মা ব্যক্তি হিসেবে ঈশ্বর থেকে ভিন্ন কিন্তু সত্ত্বা হিসেবে নয়, এরূপ যুক্তিই যুক্তি বিরুদ্ধ।

প্রথমত, কোনো মানুষের পক্ষে ঈশ্বর সত্ত্বা থেকে ব্যক্তিকে পৃথক করা এবং তার মনে দু'টি বা তিনটি সত্ত্বাকে ঠাঁই দেওয়া অসম্ভব। এর ফল হিসেবে সে দু'জন ঈশ্বর রয়েছে বলে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিকে যদি ঈশ্বরের সত্ত্বা থেকে পৃথক করা হয় তখন ব্যক্তি এক ধরনের স্বাধীন বস্তু হয়ে উঠবে এবং তা হয় সীমাবদ্ধ নয় অ-সীমাবদ্ধ হবে। যদি সীমাবদ্ধ হয় তাহলে ঈশ্বরও একজন সীমাবদ্ধ সত্ত্বা যেহেতু চার্চ অনুসারে ঈশ্বরের মধ্যকার সবকিছুই স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হবে অবাস্তব। যদি অ-সীমাবদ্ধ হয় তাহলে ঈশ্বরের মধ্যেও দু'জন অ-সীমাবদ্ধ ব্যক্তি থাকবেন অর্থাৎ দু'জন ঈশ্বর যা আগের যুক্তির চেয়ে আরো অবাস্তব।

তৃতীয়ত, ঈশ্বর সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক কিছু বলা হাস্যকর যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি কর্তৃক একথা স্বীকৃত যে, ঈশ্বর একজন ব্যক্তির নাম যিনি সর্বশক্তিমান শাসনকারী... একজন ব্যক্তি ছাড়া কেউ অন্যদের ওপর শাসন বিস্তার করতে পারে না। সুতরাং তাকে ব্যক্তির বদলে অন্য কিছু হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ তিনি যা নন তাকে সে হিসেবে গণ্য করা।

2) যিনি ইসরাইলদের পবিত্র আত্মা দিয়েছিলেন তিনি যিহোভা সুতরাং পবিত্র আত্মা যিহোভা বা ঈশ্বর নন।

3) যিনি নিজের কথা বলেন না তিনি ঈশ্বর নন।

পবিত্র আত্মা নিজের কথা বলেন না।

সুতরাং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর নন।

4) যিনি শিক্ষা লাভ করেন তিনি ঈশ্বর নন
যিনি কি বলবেন তা অন্যের

কাছ থেকে শোনেন সেটাই হলো শিক্ষা

যীশুখৃষ্ট তাই বলতেন যা তাকে বলা হত।

সুতরাং যীশু ঈশ্বর নন।

এখানে বিডল জনের গসপেল (৮: ২৬) উদ্ধৃত করেছেন যেখানে যীশু বলেছেন: "আমি তার (ঈশ্বর) কাছ থেকে যা শুনেছি সে সব কথাই বলি।"

5) জনের গসপেল-এ (১৬: ১৪) যীশু বলেন,
ঈশ্বর তিনি যিনি সকলকে সব কিছু দিয়েছেন।

যিনি অন্যের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ

করেন তিনি ঈশ্বর নন।

6) যিনি অন্য কর্তৃক প্রেরিত তিনি ঈশ্বর নন।
পবিত্র আত্মা ঈশ্বর প্রেরিত।

সুতরাং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর নন।

7) যিনি সবকিছু দিতে পারেন না তিনি ঈশ্বর নন।

যিনি ঈশ্বরের দান, তিনি সর্বদাতা নন

তিনি নিজেই ঈশ্বরের প্রদত্ত দান

কিছু দান করা দাতার শক্তি ও নিজস্ব ইচ্ছাধীন

সুতরাং এটা কল্পনা করাই অবাস্তব

যে ঈশ্বর কারো শক্তি ও ইচ্ছাধীন।

এখানে বিডল প্রেরিতদের কার্যাবলী ১৭: ২৫ উদ্ধৃত করেছেন: ঈশ্বর সকলকে দিয়েছেন প্রাণ, শ্বাস- প্রশ্বাস এবং সবকিছু।

8) যিনি স্থান পরিবর্তন করেন তিনি ঈশ্বর নন
পবিত্র আত্মা স্থান পরিবর্তন করেন

সুতরাং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর নন।

বিডল এই যুক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে: “যদি ঈশ্বর স্থান পরিবর্তন করেন তাহলে যেখানে তিনি আগে ছিলেন সেখানে তিনি থাকবেন না এবং যেখানে তিনি আগে ছিলেন না সেখানে যাত্রা শুরু করবেন। এটা তার সর্বত্র বিরাজমান থাকা ও ঈশ্বরত্বের বিরোধী। সুতরাং যীশুর কাছে যিনি এসেছিলেন তিনি ঈশ্বর নন বরং ঈশ্বরের নামে একজন স্বর্গীয় দূত।

9) যিনি সিদ্ধান্তের জন্য যীশুর কাছে প্রার্থনা
করেন তিনি ঈশ্বর নন

পবিত্র আত্মা ঈশ্বর নন।

10) রোমীয় ১০: ১৪ এ বলা হয়েছে:

“যার কথা তারা শোনেনি তাকে তারা কীভাবে বিশ্বাস করবে? মানুষ

যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নি, তবুও ছিল তারা অনুসারী।”

যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত হয় নি তিনি ঈশ্বর নন।

মানুষ পবিত্র আত্মার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নি

তবুও তারা তার অনুসারী

সুতরাং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর নন।

11) যিনি অন্যের মারফত ঈশ্বরের কথা জানতে পারেন, যেমন যীশু, তিনি যা বলবেন তা ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র।

যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করেন

ও বলেন তা ঈশ্বরের শিক্ষা

পবিত্র আত্মা সেটাই করেন

অতএব পবিত্র আত্মা ঈশ্বর নন।

12) ঈশ্বর থেকে যিনি স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখেন তিনি ঈশ্বর নন

পবিত্র আত্মা ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখেন

সুতরাং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর নন।

এখানে বিডল রোমীয় ৮: ২৬-২৭ উদ্ধৃতি করেছেন যাতে বলা হয়েছে: "অনুরূপভাবে পবিত্র আত্মা আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, কারণ আমরা তা জানতাম না। পবিত্র আত্মা আমাদের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করেছেন... ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী সাধু- সন্তদের জন্যও তিনি সুপারিশ করেছেন।"

বিডল নিউ টেস্টামেন্টের একটি শ্লোকও আলোচনা করেছেন যা প্রতিষ্ঠিত চার্চ ত্রিত্ববাদের ব্যাপারে তাদের সমর্থনে উদ্ধৃত করে থাকে। তা হলো জনের গসপেলে (৫ : ৭) বলা হয়েছে: "৩টি বিষয় রয়েছে যা ঐশী। সেগুলো হলো পিতা ঈশ্বর, বাণী ও পবিত্র আত্মা। আর এই তিনে মিলে এক।" বিডল বলেন, এ শ্লোক সাধারণ জ্ঞানে পরস্পর বিরোধী। উপরন্তু তা ধর্মগ্রন্থগুলোর অন্যান্য শ্লোকেরও বিরোধী। তাছাড়া এটা তাদের ঐকমত্যকেই তুলে ধরে, কখনোই সত্ত্বার নয়। তদুপরি, এমনকি প্রাচীন গ্রীক গসপেলেও এ শ্লোকটি দেখা যায় না যেমন তা নেই সিরীয় অনুবাদে এবং অতি প্রাচীন ল্যাটিন সংস্করণে। তাই মনে হয় যে, এ শ্লেোকটি সংযোজন করা হয়েছে এবং সে কারণে প্রাচীন ও আধুনিক কালের ব্যাখ্যাকার গণ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। [৩২]

১৬৪৮ সালের আইন সত্ত্বেও বিডল এরা দু'টি গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং এ কারণে হয়তো তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হত যদি না পার্লামেন্টের কয়েকজন নিরপেক্ষ সদস্য তাকে সাহায্য করতেন। একটি পুস্তিকার নাম ছিল "এ কনফেশন অব ফেইথ টাচিং দি হলি ট্রিনিটি অ্যাকর্ডিং টু দি স্ক্রিপচার" (A confession of Faith Touching the Holy

Trinity According to the Scirpture)। ৬টি প্রবন্ধ নিয়ে এ গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছিল। প্রতিটি প্রবন্ধই রচিত হয়েছিল বাইবেলের উদ্ধৃতি ও তার যুক্তি-তর্ক দিয়ে। ভূমিকায় তিনি ত্রিত্ববাদী ধর্মমতের কারণে সৃষ্ট ক্ষতির কথা বলিষ্ঠতার সাথে ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, ত্রিত্ববাদীদের ব্যবহৃত যুক্তিসমূহ খৃষ্টানদের চেয়ে জাদুকরদের জন্য বেশি উপযুক্ত। [৩৩] বিডল এর এই "কনফেশন অব হেইথ" গ্রন্থের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো:

আমি বিশ্বাস করি যে, একজন সর্বোচ্চ ঈশ্বর রয়েছেন যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং সকল বস্তুর মূল উৎস এবং তিনিই আমদের চূড়ান্ত বিশ্বাস ও প্রার্থনার লক্ষ্য। আমি যীশুতে বিশ্বাস করি এ পর্যন্ত যে, তিনি আমাদের ভাই হতে পারেন এবং আমাদের দুর্বলতার প্রতি তার রয়েছে সহানুভূতি যে কারণে আমাদের সাহায্যের জন্য তিনি অধিক প্রস্তুত। তিনি একজন মানুষ মাত্র। তিনি স্রষ্টার অধীন। তিনি অন্য একজন ঈশ্বর নন। ঈশ্বর দু'জন নয়।

পবিত্র আত্মা একজন স্বর্গীয় দূত যিনি তার মহত্ত্ব ও ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে ঈশ্বরের বাণী বহনের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।[৩৪]

এ সময় বিডল অন্য যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন সেটির নাম 'দি টেস্টিমনিজ অব ইরানিয়াস, জাস্টিন মার্টিয়ার কনসার্নিং ওয়ান গড অ্যান্ড দি পারসনস অবদি হলি ট্রিনিটি (Testimonies of Iraneus,

Justin Martyr Etc. Conerning one God and the Persons of the Holy Trinity)।

কারাগারে দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর একজন ম্যাজিস্ট্রেট বিডলের জামিন মঞ্জুর করেন এবং তিনি কারামুক্ত হন। নিরাপত্তার কারণে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নাম গোপন রাখা হয়। কিন্তু বিডল বেশিদিন মুক্ত জীবন কাটাতে পারেন নি। তাকে আবার কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এর পরপরই ম্যাজিস্ট্রেট পরলোকগমন করেন। তিনি বিডলের জন্য সামান্য সম্পদ রেখে যান। কারা জীবনের ব্যায় মেটাতে খুব শিগগিরই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। কিছুকালের বিডলের আহার সকাল ও সন্ধ্যায় সামান্য পরিমাণ দুধে মাত্র এসে ঠেকে। তবে এ সময় কারাগারে থাকা অবস্থায় বাইবেলের গ্রীক অনুবাদের একটি নতুন সংস্করণের প্রুফ দেখে দেওয়ার জন্য লন্ডনের একজন প্রকাশক তাকে প্রুফরিডার নিযুক্ত করায় বিডলের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটে। ১৬৫২ খৃস্টাব্দে ক্ষমা প্রদর্শন আইন পাস হলে বিডল মুক্তি লাভ করেন। এ বছরই আমষ্টার্ডামে রাকোভিয়ান ক্যাথেসিজম এর একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অবিলম্বেই তা ইংল্যান্ডে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বিডল ১৬৫৪ খৃস্টাব্দে আমষ্টার্ডামে একত্ববাদ বিষয়ে পুনরায় একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইংল্যান্ডে এ গ্রন্থটিও ব্যাপকভাবে পঠিত হয়। স্বাধীন জীবনের এ সময়কালটিতে বিডল প্রতি রবিবার তাদের নিজস্ব রীতিতে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য অন্যান্য একত্ববাদীর সাথে মিলিত হতেন। এতে যারা যোগদান করতেন তারা আদি পাপের ধারণা ও প্রায়শ্চিত্ত

মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। ১৬৫৪ খৃস্টাব্দে ১৩ ডিসেম্বর বিডলকে পুনরায় গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। তাকে কলম, কালি ও কাগজ প্রদান নিষিদ্ধ করা হয় এবং কোনো দর্শনার্থীকেও তার সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেওয়া হয় নি। তার সব গ্রন্থ জ্বালিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি আপিল করেন এবং ১৬৫৫ খৃস্টাব্দে ২৮ মে মুক্তি পান।

অল্পদিনের মধ্যেই বিডল পুনরায় কর্তৃপক্ষের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। একটি প্রকাশ্য বিতর্ক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। বক্তা বিতর্কের শুরুতেই জিজ্ঞাসা করেন যে, যীশুকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর বলে অবিশ্বাস করেন এমন কোনো ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত আছেন কিনা। বিডল সাথে সাথে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন: আমি অবিশ্বাস করি। তিনি তার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দিতে শুরু করেন। তার প্রতিপক্ষ সেসব যুক্তি খণ্ডন করতে পারলেন না। তখন বিতর্ক বন্ধ এবং অন্য দিন তা পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিডলকে কর্তৃপক্ষের কাছে নেওয়া হয়। বিতর্কের নির্ধারিত দিনের একদিন আগে আবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। সম্ভবত সে সময় এমন কোনো আইন সেখানে বলবৎ ছিল না যার বলে তাকে শাস্তি দেওয়া যেত। তার বন্ধুরা একথা জানতেন বলে সরাসরি ক্রমওয়েলের কাছে আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তারা একটি আবেদন পত্র প্রস্তুত করে ক্রমওয়েলের কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু তার কাছে পৌঁছানোর আগে সে আবেদন পত্রটি এমনভাবে পরিবর্তিত ও বিকৃত করা হয় যে আবেদনকারীরা সেটাকে জাল বলে প্রকাশ্যে দায়িত্ব অস্বীকার করেন।

ক্রমওয়েল এই জটিল অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার পন্থা হিসেবে ১৬৫৫ খৃস্টাব্দে ৫ অক্টোবর বিডলকে সিসিলিতে নির্বাসিত করেন। তাকে বাকি জীবন সেন্ট মেরি ক্যাসলের কারাগারে থাকতে হবে এবং বার্ষিক ১০০ ক্রাউন ভাতা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। সেখানে কারাবন্দি থাকা কালে বিডল একটি কবিতা লিখেছিলেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ:

গুপ্ত সভার বৈঠক বসল, বিচারক নির্ধারিত হলো,

মানুষ আরোহণ করল ঈশ্বরের সিংহাসনে

এবং তারা একটি বিষয়ের বিচার করল

যা শুধু একা তারই (ঈশ্বরের) শোভা পায়;

একজন ভাইয়ের বিশ্বাসকে তারা বলল অপরাধ

এবং তারা ধ্বংস করল চিন্তার মহৎ স্বাধীনতা।[৩৬]

বিডল যত বেশি অত্যাচারিত হলেন, চার্চ সমর্থিত ধর্মের ভ্রান্তিসমূহের ব্যাপারে তার মনোভাব তত বেশি দৃঢ় হলো। টমান ফারমিন অতীতেও বিডলকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি বিডলকে সাহায্য করা অব্যাহত রেখে তাকে অর্থ সাহায্য দিতে থাকেন। এর ফলে কারাগারে তার জীবনযাত্রা যতটা সম্ভব আরামদায়ক হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে বিডলের প্রতি সহানুভূতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। কারাগারে যতই দিন অতিবাহিত হতে থাকল তার জনপ্রিয়তা তত বেশি বাড়তে থাকল। সরকার ডা. জন ওয়েনকে বিডলের শিক্ষার প্রভাবের বিরুদ্ধে পালটা

ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি এক জরিপ পরিচালনা করেন। এতে দেখা যায় যে, বিপুল সংখ্যক ইংরেজই একত্ববাদী। এরপর তিনি ১৬৫৫ খৃস্টাব্দে বিডলের ধর্মমতের জবাব প্রকাশ করেন। ক্রমওয়েলের পদক্ষেপ এক দিক দিয়ে বিডলকে সাহায্য করে। সরকার প্রদত্ত ভাতায় বিডল ছিলেন তার শত্রুদের নাগালের বাইরে। গভীর চিন্তা ও প্রার্থনার মধ্যে তার দিন অতিবাহিত হতো। ১৬৫৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেন্ট মেরির দুর্গে (Castle of St. Mary) বন্দী জীবন কাটান। এ বছর তার মুক্তির ব্যাপারে চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি মুক্তি লাভ করেন।

কারাগার থেকে বাইরে আসার পর পরই বিডল জনসভা করতে শুরু করেন। এসব সভায় তিনি ঈশ্বরের একত্ব সম্পর্কে এবং ত্রিত্ববাদের অসারতা বিষয়ে বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে যুক্তি- ব্যাখ্যা দিতেন। এসব জনসভা এক পর্যায়ে প্রার্থনা সভায় পরিণত হয়। ইংল্যান্ডে আগে কখনো এমনটি দেখা যায় নি।

১৬৬২ খৃস্টাব্দে এক সভা চলার মাঝপথে বিডল ও তার কয়েকজন সঙ্গীকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের সবাইকে কারাগারে নিক্ষেপ এবং জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করা হয়। তখন এমন কোনো আইন ছিল না যাতে তাদের শাস্তি দেওয়া যায়। তাই সাধারণ আইনেই তাদের বিচার করা হয়। বিডলকে একশত পাউন্ড জরিমানা করে উক্ত অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কারাগারে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তার সহযোগী বন্ধুদের প্রত্যেককে ২০ পাউন্ড করে জরিমানা করা হয়। কারাগারে বিডলের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয় এবং তাকে বন্দী রাখা হয়

এক নির্জন প্রকোষ্ঠে। কারাগারের দূষিত বাতাস এবং নিঃসঙ্গতা মিলে তাকে রোগগ্রস্ত করে তোলে। মাত্র পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে। ১৬৬২ খৃস্টাব্দে ২২ সেপ্টেম্বর তাকে সমাহিত করা হয়।

যে বছর বিডলের মৃত্যু হয়, সে বছরই কার্যকর হয় সমরূপ বিধান আইন (Act of Uniformity)। এর অর্থ হলো বিডল যে প্রকাশ্য উপাসনা সভার পদ্ধতি প্রচলন করেছিলেন তা বন্ধ করে দেওয়া। এ আইনে ২,২৫৭ জন যাজককে তাদের জীবিকা চ্যুত করা হয়। তাদের পরিণতি অজ্ঞাত। তবে এটা জানা যায় যে, ত্রিত্ববাদকে মেনে নিতে অস্বীকার করায় ইংল্যান্ডে এসময় ৮ হাজার মানুষ কারাগারের অন্তরালে প্রাণ হারায়। বিডলের এক স্মৃতি কথার এক লেখক নিরাপত্তার কারণে তার নাম অজ্ঞাত রাখেন যদিও তিনি তা লিখেছিলেন বিডলের মৃত্যুর বিশ বছর পর। যাহোক, এতকিছুর পরও একত্ববাদ একটি ধর্মমত হিসেবে টিকে থাকে এবং অনুসারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। চার্চের ধর্মে মানুষকে ফিরিয়ে আনার জন্য বল প্রয়োগ করা হয়। পরিণতিতে তা সোকিয়ানাস ও বিডলের প্রচারিত মতের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সে যুগের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদগণ যেমন মিলটন, স্যার আইজাক নিউটন ও লক এর মত ব্যক্তিরা এক ঈশ্বরে আস্থা ব্যক্ত করেন।

একত্ববাদ নির্মূলের জন্য কর্তৃপক্ষ যে কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল, সংশ্লিষ্ট আইন জারি থেকে তার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। ১৬৬৪ খৃস্টাব্দে এক আইনে চার্চে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী সকল লোককে

নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। কেউ ফিরে এলে তার জন্য ছিল ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড। চার্চের অনুমতি ছাড়া পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির উপস্থিতি সম্পন্ন চার্চের অননুমোদিত কোনো ধর্মীয় সভায় যোগদান করলে তাকে জরিমানা করা হত। কেউ যদি এ অপরাধ দ্বিতীয়বার করত তাকে আমেরিকায় নির্বাসনে পাঠানো হত। কেউ ফিরে এলে বা পলায়ন করলে তার শাস্তি ছিল যাজক- সুবিধাহীন মৃত্যুদণ্ড। ১৬৭৩ খৃস্টাব্দে জারিকৃত টেস্ট অ্যাক্টে (Test Act) বলা হয়, ১৬৬৪ খৃস্টাব্দে আইনে উল্লিখিত শাস্তি ছাড়াও যারা চার্চ অব ইংল্যান্ডের প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান পালন করবে না তারা আদালতে কারো বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে না অথবা কোনো বিচার পাবে না। সে এরপর থেকে কোনো শিশুর অভিভাবক হতে পারবে না, কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে না, কোনো সম্পদের বা কোনো কর্মের বা কোনো দানকৃত সম্পদের অধিকারী হতে পারবে না। কেউ যদি এই আইনের অধীনে উল্লিখিত কোনো কাজ করার চেষ্টা করে তাহলে তাকে ৫শ' পাউন্ড জরিমানা করা হবে। ১৬৮৯ খৃস্টাব্দে সহিষ্ণুতা আইন (Toleration Act) জারি হয়। কিন্তু ত্রিত্ববাদ মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদেরকে এই আইনের সুবিধা দেওয়া হয় নি। একত্ববাদীরা সহিষ্ণুতা আইনের অসহিষ্ণুতার নিন্দা করেন। পার্লামেন্ট একত্ববাদকে এক ঘৃণ্য ধর্মবিরুদ্ধতা (Obnoxious heresy) আখ্যায়িত করে এর জবাব দেয়। এ অপরাধের শাস্তি ছিল সকল নাগরিক অধিকার বিলোপসহ ৩ বছরের কারাদণ্ড। কিন্তু এত কিছু করেও মানুষের মন থেকে বিডলের প্রচারিত ধর্মমত অপসারণ করা যায় নি

যদিও এসব আইনের ফলে বহু লোকের প্রকাশ্য ধর্ম বিশ্বাস ব্যক্ত করা বাধাগ্রস্ত হয়। যাদের পক্ষে আইন অমান্য ও প্রকাশ্যে ত্রিত্ববাদের নিন্দা করা সম্ভব ছিল না তারা তাদের ধর্মমতের প্রতি বিরোধিতা শান্ত করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকার পন্থা গ্রহণ করে। কেউ কেউ এথানাসিয়ান ধর্মমতের যে অংশ তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য, সে অংশটুকু বাদ দেয়। কেউ কেউ তা 'প্যারিস ক্লার্ক' (Parish Clerk) কে (জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতির তারিখ ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত গির্জার কেরানি) দিয়ে তা পাঠ করাত। জানা যায় যে, এক ব্যক্তি একটি জনপ্রিয় শিকার সংগীতের সুরে এটি গাওয়ার মাধ্যমে তার অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। অন্য এক যাজক আইন অনুমোদিত ত্রিত্ববাদ ধর্মমত পাঠের পূর্বে বলেন, ভাইসব! এটা সেন্ট এথানাসিয়াসের ধর্মমত, কিন্তু ঈশ্বর না করুক, এটা যেন অন্যান্য মানুষের ধর্মমত না হয়।[৩৭] তবে সাধারণত: একত্ববাদীরা প্রকাশ্যে তাদের ধর্মমত ঘোষণা করার সাহস করতেন না।

বিডল ছিলেন একজন পরিশ্রমী পণ্ডিত এবং তার বক্তব্য ছিল তার গভীর অধ্যয়নের ফল। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অকুতোভয়ে সত্যের বাণী প্রকাশ ও প্রচারের ভিতর দিয়ে তিনি মানুষের সেবা করতে পারবেন। যদি তার পরিণতি হয় নিন্দা ও নির্যাতন, তবে তাই হোক। তিনি দরিদ্র, কারাদণ্ড বা নির্বাসনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন জনসাধারণ দুর্নীতিগ্রস্থ চার্চ ত্যাগ এবং যে কোনো ভ্রান্তিকে প্রত্যাখ্যান করুক। তার ছিল আত্মত্যাগের সাহস।

**মিলটন (Milton) ১৬০৮-৭৪ খৃ.**

মিলটন ছিলেন বিডলের সমসাময়িক। বিডলের মতের সাথে তার বহু মিল ছিল, কিন্তু তিনি বিডলের মত স্পষ্টভাষী ছিলেন না। করাগারে তিনি নিক্ষিপ্ত হতে চাননি। "ট্রিটিজঅব ট্রু রিলিজিয়ান" (Treatise of True Religion) নামক দু'খণ্ডের এক গ্রন্থে তিনি বলেন, আরিয়ান ও সোকিয়ানরা ত্রিত্ববাদের বিরোধী বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তারা বাইবেল এবং প্রেরিতদের ধর্মমত অনুযায়ী পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করতে হবে। ত্রিত্ববাদে ব্যক্ত ত্রি-ঈশ্বর সহ-সত্তা, ত্রি-ব্যক্তিত্বকে তারা ধর্মযাজকদের আবিষ্কার হিসেবে গণ্য করে এবং বলে যে, ধর্মগ্রন্থে এসব নেই। তাদের এ বিশ্বাস সাধারণ প্রটেস্টাণ্ট মতের মতই স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল। সঠিক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তারা এ উচ্চমার্গের বিষয়টি প্রকাশ করে যা জানা অত্যাবশ্যক। তারা মনে করে, ত্রিত্ববাদীদের তত্ত্বজ্ঞান সম্বলিত বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে রহস্যময় সূক্ষ্ম কৌশল, কিন্তু বাইবেলে তা সহজ এক মত মাত্র।[৩৮]

অন্য একটি গ্রন্থে তিনি আরো স্পষ্টভাবে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন যে, পোপ, কাউন্সিল, বিশপ ও যাজকদের অতি জঘন্য দুষ্কর্মকারী ও স্বৈরাচারীদের সারিতে শ্রেণিকরণ করা উচিৎ। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন আইন, অনুষ্ঠান ও মতবাদ হলো স্বাধীনতার ওপর অবাঞ্ছিত আগ্রাসন।[৩৯]

এ প্রখ্যাত কবি প্রকাশ্যে দেশের শাসন কর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করেন নি, কিন্তু তিনি নিজেকে চার্চের গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে একটি

প্রতিবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বেশ কিছু শীর্ষ বুদ্ধিজীবীর মত তিনিও চার্চে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মিলটন সম্পর্কে ডা. জনসন বলেছেন: তিনি প্রোটেষ্টাণ্টদের কোনো শাখার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। তিনি কী ছিলেন তা জানার চাইতে তিনি কী ছিলেন না, আমরা সেটাই জানি। তিনি চার্চ অব রোমের কিংবা চার্চ অব ইংল্যান্ডের অনুসারী ছিলেন না। প্রকাশ্যে তাকে উপাসনা করতে দেখা যায় নি। তার দৈনন্দিন সময়সূচিতে প্রতিটি ঘণ্টা ভাগ করা ছিল। সেখানে উপাসনার জন্য কোনো সময় রাখা ছিল না। তার কাজ এবং তার ধ্যানই ছিল তার উপাসনা।[৪০]

এটা স্পষ্ট যে, ডা. জনসন (Dr. Johnson) মিলটনের লেখা একটি গ্রন্থ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। কারণ, মিলটনের মৃত্যুর প্রায় দেড়শ' বছর পর ১৮২৩ খৃস্টাব্দে এ গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হয়। হোয়াইট হলে ওল্ড স্টেট পেপার অফিসে (Old state paper office in whitehall) পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কৃত হয়। এতে নাম ছিল: "এ ট্রিটিজ রিলেটিং টু গড" (A Treatise relating to God)। তিনি যখন ক্রমওয়েলের সেক্রেটারি ছিলেন তখনই এ গ্রন্থটি লেখা হয়। নিঃসন্দেহে, মিলটন তার জীবদ্দশায় এ গ্রন্থটি প্রকাশ হোক তা চাননি।

এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মিলটন ঈশ্বরের গুণাবলি এবং নির্দিষ্টভাবে একত্ববাদ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"ঈশ্বরকে অস্বীকার করে এমন লোকের সংখ্যা একেবারে কম নয়। এসব নির্বোধেরা অন্তর থেকে বিশ্বাস করে যে, কোনো ঈশ্বর নেই"

স্তোত্র ১৪ : ১, অথচ ঈশ্বর মানুষের অন্তরে তার নিজের এমন বহু প্রশ্নাতীত নিদর্শনের ছাপ এঁকে দিয়েছেন এবং প্রকৃতির সর্বত্র তার পরিচয় এমনভাবে ছড়ানো রয়েছে যে বোধসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিই সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে না। এতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না যে, বিশ্বের সব কিছুই সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত এবং তাতে রয়েছে এক চূড়ান্ত ও কল্যাণকর উদ্দেশ্য যা সাক্ষ্য দেয় যে, এক সর্বোচ্চ সুযোগ্য শক্তি অবশ্যই পূর্ব থেকে বিরাজমান যার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিই এক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য নির্ধারিত। ঈশ্বরের বাণী বাদ দিয়ে শুধু প্রকৃতি বা বুদ্ধিকে পথ নির্দেশক করে ঈশ্বর সম্পর্কে সঠিক চিন্তা করা যায় না। আমাদের মন যতটা ধারণ করতে পারে অথবা আমদের প্রকৃতির পক্ষে যতটা বহন করা সম্ভব, ঈশ্বর তার সম্পর্কে ততটাই প্রকাশ করেছেন.... ঈশ্বর সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান মানুষের পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন, তিনি তা পর্যাপ্ত পরিমাণে নিজ করুণায় প্রকাশ করেছেন... ঈশ্বরের নাম ও গুণাবলি হয় তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশক, নয় তার ঐশী শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

মিলটন এরপর ঈশ্বরের কতিপয় গুণের বিবরণ দিয়েছেন: সত্য, সত্ত্বা, বিশালত্ব ও অসীমত্ব, চির স্থায়িত্ব, অপরিবর্তনীয়তা, ন্যায়পরায়ণতা, অমরত্ব, সর্বত্র বিদ্যমানতা সর্বশক্তিমত্তা এবং চূড়ান্তরূপে একত্ব। তিনি বলেন, উল্লিখিত সকল গুণের সারবস্তু হলো তার একত্ব। এরপর মিলটন বাইবেল থেকে নিম্নোক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন:

যিহোভা, তিনিই ঈশ্বর, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই (দ্বিতীয় বিবরণ ৪: ৩৫)

যিহোভা, তিনিই স্বর্গ মর্তের ঈশ্বর, অন্য আর কেউ নেই।

(দ্বিতীয় বিবরণ ৫: ৩৯)

আমি, শুধু আমি, আমিই ঈশ্বর এবং আমার সাথে আর কোনো ঈশ্বর নেই। (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২ : ৩৯)

পৃথিবীর সকল মানুষের জানা প্রয়োজন যে, যিহোভাই ঈশ্বর এবং আর কোনো ঈশ্বর নেই। (১ রাজাবলি ৮ : ৬০)

তিনি ঈশ্বর, তিনি এক, তিনি বিশ্বের সকল সাম্রাজ্যের ঈশ্বর।

(২ রাজাবলি ১৯ : ১৫)

আমি ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর আছে? না, ঈশ্বর একজনই।

(যিশাইয় ৪৪ : ৮)

আমি যিহোভা এবং আমি ছাড়া কোনো ঈশ্বর নেই।

(যিশাইয় ৪৫ : ৫)

আমি ছাড়া কোনো ঈশ্বর নেই .... আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

(যিশাইয় ৪৫ : ২১)

আমি ঈশ্বর এবং আর কেউ নেই। (যিশাইয় ৪৫: ২২)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ প্রসঙ্গে মিলটন বলেন, অর্থাৎ ঈশ্বর ছাড়া আর কোনো সত্ত্বা, ব্যক্তি বা কোনো অস্তিত্ব নেই।

আমি ঈশ্বর, আর কেউ নয়। আমিই ঈশ্বর এবং আমার মত আর কেউ নেই। (যিশাইয় ৪৬: ৯)

মিলটন বলেন, "সংখ্যাতাত্ত্বিক একত্বের অভিন্ন ধারণায় সংখ্যাগত দিক দিয়ে একজন ঈশ্বর এবং একজন আত্মা রয়েছেন বলে ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টির লক্ষ্যে এর চাইতে সহজ, সুনির্দিষ্ট, গ্রহণযোগ্য আর কী পন্থা হতে পারে? এখানে প্রথমত এবং চূড়ান্তভাবে এটাই ছিল যথার্থ ও যুক্তিসংগত যে, জনসাধারণের মধ্যে নিম্নহার ব্যক্তিটির মস্তকও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে অবনত করার জন্য ধর্মীয় বাণী এরূপ সহজ পন্থায় প্রচার করা হয় যে, তার মধ্যে কোনো অনিশ্চয়তা বা অস্পষ্টতা নেই। অন্যথায় উপাসনাকারীরা ভ্রান্তিতে কিংবা সন্দেহের মধ্যে নিপতিত হতে পারত। ইসরাঈলিরা তাদের বিধান ও নবীদের মারফত সর্বদাই একথা উপলব্ধি করেছে যে, সংখ্যাগত দিক দিয়ে ঈশ্বর একজনই এবং তার সম পর্যায়ের বা তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের আর কোনো ঈশ্বর নেই। তখন পর্যন্ত ধর্মগুরুদের আবির্ভাব হয় নি যারা তাদের নিজস্ব জ্ঞানবুদ্ধি ও সম্পূর্ণ স্ববিরোধী যুক্তির মাধ্যমে একত্ববাদী মতবাদকে বিকৃত করেছে যদিও ভান করে যে, তারা তা বজায় রাখতে চাইছে। কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্পর্কে যে কথাটা সর্বজন গৃহীত তা হলো এই যে স্ববিরোধী হতে পারে এমন কিছু তিনি করতে পারেন না। সুতরাং এখানে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বরের একত্বের সাথে

সংগতিপূর্ণ নয় এবং যা একই সাথে তার একত্ব ও একাধিকত্ব সম্পর্কিত, ঈশ্বর সম্পর্কে এমন কিছু বলা যায় না। (মার্ক ১৩ : ২৯-৩২) "হে ইসরাইলিরা শোন! আমাদের যিনি প্রভূ তিনিই ঈশ্বর একজনই এবং তিনি ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই।"

এরপর মিলটন পবিত্র আত্মার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে বাইবেলে কী তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে বাইবেলে কি তার বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি, কীভাবে তা অস্তিত্বশীল কিংবা কখন তার উদ্ভব- তার কিছুই বলা হয় নি। তিনি বলেন,

ধর্মের মত একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়ে বিশ্বাসীদের সামনে ধর্ম প্রবক্তাদের উচিৎ তার প্রাথমিক গুরুত্ব ও সন্দেহাতীত নিশ্চয়তা অথবা ধর্মগ্রন্থের সুস্পষ্ট সাক্ষ্যের চাইতে ভিন্ন কিছু উপস্থাপন না করা এবং বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে মানবিক বিবেচনায় তার প্রমাণ সম্পর্কে কোনো প্রকার সন্দেহের কোনো অবকাশ না থাকে বা কোনো সংশয় বা বিতর্কের বিষয়বস্তু যেন না হয়।

এরপর মিল্টন বাইবেলের আলোকে তার বক্তব্যের উপসংহার টেনেছেন: পবিত্র আত্মা সর্বজ্ঞ নয় এবং তা সর্বত্র বিরাজমানও নয়। একথা বলা যায় না যে, যেহেতু পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের বাণী ও নির্দেশ বহন করে আনেন সে করণে তিনি ঈশ্বরের অংশ। যদি তিনি ঈশ্বরই হতেন তাহলে কেন পবিত্র আত্মাকে সান্ত্বনা দানকারী (Comforter) বলা হয় যিনি যীশুর পরে আসবেন, যিনি নিজের সম্পর্কে কিছু বলেন

না কিংবা তার নিজের নামে কিছু বলেন না এবং যার শক্তি অর্জিত (জন ১৬ : ৭- ১৪)? সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, 'সান্ত্বনা দানকারী' আসলে যীশুর পরে আগমনকারী একজন নবী, এ অর্থে তাঁকে গ্রহণ না করে এক সীমাহীন বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যেই তাকে পবিত্র আত্মা এমনকি ঈশ্বর বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। [১৪]

আরিয়াসের সাথে মিলটনও একমত যে, যীশু চিরন্তন নন। তিনি বলেন, যীশুকে সৃষ্টি করা বা না করা তা সম্পূর্ণই ছিল ঈশ্বরের ব্যাপারে। তিনি বলেন, যীশু "সময়ের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই" জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যীশুর ঐশ্বরিক জন্ম সম্পর্কিত মতবাদের সমর্থনে বাইবেলের একটি পঙক্তিও তিনি খুঁজে পান নি। যীশুকে ব্যক্তি হিসেবে ভিন্ন এবং সত্ত্বা হিসেবে ঈশ্বরের একজন হিসেবে গণ্য করা অদ্ভুত ও যুক্তি বিরোধী। এ মতবাদ শুধু যুক্তি বিরোধীই নয়, বাইবেলের সাক্ষ্য প্রমাণেরও বিরোধী। মিলটন ইসরাইলি জনগণের সাথে একমত পোষণ করেছেন যে, ঈশ্বর একজন ও অদ্বিতীয়। আর তা এতটাই সুস্পষ্ট যে, এর জন্য আলাদা কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। যে এক ঈশ্বর একজন স্ব-অস্তিত্ববান ঈশ্বর এবং যে সত্ত্বা স্ব-অস্তিত্ববান নয় সে ঈশ্বর হতে পারে না। তিনি উপসংহারে বলেন,

"বাইবেলের সহজ অর্থকে পরিহার অথবা আড়াল করার জন্য কতিপয় ব্যক্তি কি কৌশলপূর্ণ ধূর্ততা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে তা দেখে বিস্মিত হতে হয়।"[৪২]

মিলটন বলেন যে, পবিত্র আত্মা ঈশ্বর ও যীশুর চেয়েও ন্যূন স্থানীয় যেহেতু তার দায়িত্ব হলো একজনের বার্তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তিনি নিজে কিছুই করতে পারেন না। তিনি সকল বিষয়ে ঈশ্বরের বান্দা ও অনুগত। ঈশ্বর কর্তৃক তিনি প্রেরিত হন এবং তাকে তার নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে দেওয়া হয় নি।

মিলটন উপলব্ধি করেছিলেন যে, তিনি এ মত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতে পারবেন না। কারণ তাতে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারত এবং তার অবস্থাও বিডল ও সমগোত্রীয় অন্যদের মত দুর্দশাপূর্ণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ১৬১১ খৃস্টাব্দে মিলটনের জীবদ্দশায় মি: লেগাট ও মি: ওয়াইটম্যান (Legatt and wightman) নামক দু'ব্যক্তিকে রাজার অনুমোদনক্রমে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। তাদের অপরাধ ছিল যে, তারা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে নিয়ে প্রচারিত ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তারা বিশ্বাস করতেন যে, যীশু যেমন ঈশ্বরের প্রকৃত স্বাভাবিক সন্তান নন তেমনি ঈশ্বরের সত্ত্বা, চিরন্তনতা ও সর্বময় ক্ষমতার অনুরূপ কোনো গুণ তার ছিল না। যীশু ছিলেন নিছক একজন মানুষ, একই ব্যক্তি সত্ত্বায় ঈশ্বর ও মানুষের সমন্বিত কিছু তিনি ছিলেন না।

মিলটন কেন তার জীবদ্দশায় নীরব ছিলেন, এ থেকেতো বুঝা যায়।

**জন লক (John Locke) ১৬৩২-১৭০৪ খৃ.**

সামাজিক চুক্তি বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার জন্য সুপরিচিত জন লোকও একত্ববাদী ছিলেন। কিন্তু তিনিও তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে ভীত

ছিলেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এক পর্যায়ে তিনি ইংল্যান্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৬৮৮ সালের বিপ্লবের পর দেশে ফিরে তিনি নিশ্চিত করেন যে, তিনি সরাসরি চার্চ শক্তির বিরোধিতা করবেন না। কারণ এর ফলে আরো নিপীড়ন- নির্যাতনের আশঙ্কা ছিল। যুক্তি সমর্থনে তার পান্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থও চার্চ পছন্দ করে নি। অন্য একটি গ্রন্থ তাকে বেনামীতে প্রকাশ করতে হয়। যা হোক, জানা যায় যে, তিনি যীশু খৃষ্টের গোড়ার দিকের শিষ্যদের শিক্ষা অধ্যয়ন করেন এবং ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করার কোনো যুক্তি খুঁজে পান নি। তিনি বিজ্ঞানী নিউটনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তার সাথে এসব ব্যাপার নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন যেগুলোর ব্যাপারে তার মত ছিল অত্যন্ত বিতর্কিত। লোক ও নিউটনের বন্ধু লী ক্লেয়ার বলেছেন, একদিকে এত দক্ষতা নিয়ে অথবা অন্যদিকে এত ভুল প্রতিনিধিত্ব, বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতা নিয়ে আর কোনো বিতর্কিত বিষয় এমনভাবে আলোচিত হয় নি। কথিত আছে যে, লকই ১৬৮৯ খৃস্টাব্দে সহিষ্ণুতা আইনের (Act of Toleration) প্রণেতা ছিলেন।

**স্যার আইজাক নিউটন (Sir Isac Newton) ১৬৪২-১৭২৭ খৃ.**

সুবিখ্যাত ইংরেজ কবি আলেকজান্ডার পোপের (Alexander pope) কবিতায় নিউটনের বর্ণাঢ্য জীবন চিত্রিত হয়েছে এভাবে:

প্রকৃতি ও প্রকৃতির বিধান ঢাকা পড়ে ছিল রাতে

ঈশ্বর বললেন “নিউটন সৃষ্টি হও”

এবং সব আলোকিত হলো।”[৪৩]

নিউটন ছিলেন তাদেরই একজন যারা তাদের বিশ্বাসকে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করা বিচক্ষণতার পরিচায়ক বলে মনে করতেন না। ১৬৯০ খৃস্টাব্দে জন ৫ : ৭ ও তীমথীয় ৩ : ১৬ প্রসঙ্গে নিউ টেস্টামেন্টের বক্তব্যের বিকৃতি বিষয়ে তার মন্তব্য সংবলিত একটি ক্ষুদ্র প্যাকেট তিনি জন লকের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, যেহেতু এটা ইংল্যান্ডে প্রকাশ করা বিপজ্জনক সে কারণে জন লক তার পুস্তিকাটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ ও ফ্রান্সে প্রকাশের কাজে সহায়তা করবেন। এ পাণ্ডুলিপির নাম ছিল: “এন হিস্টোরিকাল একাউন্টস অফ টু নোটেবল করাপশনস অব স্ক্রিপচার (An Historical Accounts of Two Notable Corruptiouns of scripture)। ১৬৯২ সালে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির রচনা হিসেবে এর ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশের চেষ্টা নেওয়া হয়। নিউটন ব্যাপারটা শুনতে পেয়ে এ প্রকাশনা বন্ধের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য লককে অনুরোধ করেন। কারণ, তার ধারণা ছিল যে, সময়টি এ পুস্তিকা প্রকাশের অনুকূল নয়।

নিউটন তার ‘হিষ্টোরিকাল একানউন্টস’ গ্রন্থে জন ৫: ৭ প্রসঙ্গে বলেছেন:

“ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে জেরোমের সময় এবং তার আগে ও পরে বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত শক্তিশালী দীর্ঘকালীন ও স্থায়ী কোনো বিতর্কেই তিন ঈশ্বরের বিষয়টি কখনোই ছিল না। এটা এখন প্রত্যেকের মুখে এবং কাজের

প্রধান ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত এবং নিশ্চিতভাবে তাদের জন্যই তা করা হয়েছে যেভাবে তাদের গ্রন্থ্গুলোতে রয়েছে।”

নিউটন আরো বলেন,

যারা যোগ্য, এ ব্যাপারে তাদের বোধোদয় হওয়া উচিৎ। আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। যদি এটা বলা হয় যে, আমার ধর্মগ্রন্থ কী তা নির্ধারণ এবং ব্যক্তিগত বিচারের কেউ নেই সেক্ষেত্রে যেসব স্থানে বিরোধ নেই সেখানে আমি এটা স্বীকার করি, কিন্তু যেখানে বিরোধ আছে সেখানে আমি সবচেয়ে ভালো বুঝি, তাই করি। মানব সমাজের উত্তপ্ত মেজাজ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন অংশ ধর্মীয় ব্যাপারে চিরকালই রহস্যময়তার ভক্ত, আর এ কারণেই তারা যা কম বোঝে সেটাই বেশি পছন্দ করে। এ ধরনের লোকেরাই প্রেরিত দূত যোহনকে যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু তার প্রতি আমার এমন শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে যাতে আমি বিশ্বাস করি তিনি যে উদ্দেশ্যে লিখেছেন যা থেকে ভালোটুকু গ্রহণ করা যায়।[৪৪]

নিউটনের মতে, এই অংশটি এরাসমাসের নিউ টেস্টামেন্টের তৃতীয় সংস্করণে প্রথম দেখা যায়। তিনি মনে করতেন যে, এই সংস্করণ প্রকাশের আগে এই মিথ্যা অংশটি নিউ টেস্টামেন্টে ছিল না। নিউটন বলেন, “তারা যখন এই সংস্করণে ত্রিত্ববাদ পেল তখন তারা নিজেরাই নিজেদের ধর্মগ্রন্থ থেকে থাকলে তা ছুঁড়ে ফেলল যেমন লোকজন পুরোনো আলমানাককে ছুঁড়ে ফেলে। এ ধরনের পরিবর্তনের ঘটনা কি কোনো বিবেচক ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করতে পারে?” তিনি বলেন, “ভাঙ্গা

বাদ্যযন্ত্রে সুর তোলার মতই এটা ধর্মের জন্য উপকারী হওয়ার পরিবর্তে বিপজ্জনক।"

১ তীমথীয় ৩ : ১৬ প্রসঙ্গে নিউটন বলেন, উত্তপ্ত ও দীর্ঘস্থায়ী আরিয়ান বিতর্কের কোনো সময়েই এটা শোনা যায় নি.... যারা বলে "ঈশ্বর রক্তমাংসের মানুষের মধ্যে প্রকাশিত" তারা তাদের উদ্দেশ্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য হাসিলের জন্যই তা বলে থাকে।[৪৫]

নিউটন ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রতীকী বা দ্বৈত ব্যাখ্যার বিরোধী ছিলেন। তিনি সব ধর্মগ্রন্থকে সমান শ্রদ্ধা করতেন না। হুইস্টন বলেন, তিনি অন্য দু'টি ধর্মগ্রন্থের ওপর একটি গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেন যেগুলো এথানাসিয়াস বিকৃত করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে আজ আর তার সে গ্রন্থের কোনো হদিস পাওয়া যায় না।

নিউটন সবশেষে বলেন,

দেবতা (Deity) শব্দটি অধীনস্থ প্রাণীকুলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশক এবং ঈশ্বর (God) শব্দটি স্বতস্ফূর্তভাবে প্রভূত্ব প্রকাশক। প্রত্যেক প্রভূই ঈশ্বর নয়। এক আধ্যাত্মিক সত্ত্বার মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটে। যদি এ প্রাধান্য সত্য হয় তাহলে সে সত্ত্বাই প্রকৃত ঈশ্বর। এটা যদি সন্দেহপূর্ণ হয় তবে তা হবে মিথ্যা ঈশ্বর, আর যদি তা সন্দেহাতীত হয় তবে তিনি হবেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।[৪৬]

**টমাস এমলিন (Thomas Emlyn) ১৬৬৩-১৭৪১ খৃ.**

টমাস এমলিন ১৬৬৩ খৃস্টাব্দে ২৭ মে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৬৭৮ খৃস্টাব্দে তিনি কেমব্রিজ গমন করে সেখানে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর তিনি ডাবলিনে ফিরে আসেন। খুব শিগগির তিনি সেখানে একজন জনপ্রিয় ধর্মপ্রচারক হয়ে উঠেন। ১৬৮২ খৃস্টাব্দে এই যাজক প্রথম ধর্মোপদেশ প্রচার করেন এবং পরবর্তী ১০ বছর একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবে তার খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ১৭০২ খৃস্টাব্দে তার ধর্মপ্রচার সভার একজন সদস্য লক্ষ করেন যে, এমলিন ত্রিত্ববাদের সমর্থনে ব্যবহৃত হয় এমন কিছু সুপরিচিত ব্যাখ্যা ও যুক্তি পরিহার করেছেন। এ ঘটনার ফলে ত্রিত্ববাদের ধারণার ব্যাপারে তিনি কী শিক্ষা দিচ্ছেন, সে বিষয়ে তাকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যখন তাকে সুনির্দিষ্টভাবে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি কোনো দ্বিধা ছাড়াই খোলাখুলি তার মত প্রকাশ করেন।

তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি একত্ববাদে বিশ্বাসী। তিনি ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বর একক সর্বোচ্চ সত্ত্বা এবং যীশু তার সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব শুধু তার কাছ থেকেই লাভ করেছেন। তিনি আরো বলেন, ধর্ম সমাবেশের কেউ যদি তার মতকে আপত্তিকর বলে দেখেন, তবে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন যাতে তারা তাদের মতের সমর্থনকারী একজন ধর্মপ্রচারক যাজককে মনোনীত করতে পারেন। ধর্মীয় সমাবেশের অধিকাংশই এটা চাইছিল না, কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, তিনি পদত্যাগ করেন। এতে অধিকাংশ লোকই দুঃখিত হয়। পরিস্থিতি যাতে শান্ত হয়ে আসে সে জন্য স্বল্পকালের জন্য তাকে ইংল্যান্ড গমন করতে বলা হয়। তিনি তাই করেন।

ইংল্যান্ডে ১০ সপ্তাহ অবস্থানের পর তিনি তার পরিবারের সদস্যদের ইংল্যান্ডে নিয়ে যাবার জন্য ডাবলিন ফিরে আসেন। কিন্তু তার আগেই তাকে ১৭০৩ খৃস্টাব্দে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে ধর্ম বিরোধিতার অভিযোগ আনা হয়। দেখা যায় যে, তিনি “An humble Inquiry into the Scripture account of Jesus Christ” নামক একত্বাবাদের সমর্থক একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য দায়ী। এ ঘটনায় তার বিচারের জন্য যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ খোঁজা হচ্ছিল, তা মিলে গেল। পুরো পুস্তকটিই মূলত জন এর গসপেলের ১৪ : ২৮ শ্লোকের ওপর ভিত্তি করে রচিত যাতে যীশু বলেছেন “পিতা আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ।” এমলিন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যে, যীশু ছিলেন মানুষ ও ঈশ্বরের মাঝে একজন মধ্যস্থতাকারী। এভাবে তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম পন্থায় যীশুকে ঈশ্বর থেকে পৃথক করেন। আর তা করার মাধ্যমে ত্রিত্ববাদের ধারণাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন।

এমলিনের বিরোধীরা তাকে দোষী প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় তার বিচার কয়েক মাসের জন্য পিছিয়ে যায়। এ সময়টি তার কাটে কারাগারে। যখন চূড়ান্ত বিচার শুরু হলো, তখন “দীর্ঘ আলখেল্লা পরিহিত এক সৎ ব্যক্তি” তাকে অবহিত করেন যে, আত্মপক্ষ সমর্থনের অনুমতি তাকে দেওয়া হবে না, বরং কোনো “আইন বা খেলা ছাড়াই একটি নেকড়ের ন্যায় তাকে ধাওয়া করে শেষ করে ফেলার জন্যই এ চক্রান্ত করা হয়েছে।”[৪৭] সুতরাং তিনি যে “যীশুখ্রিষ্ট সর্বোচ্চ ঈশ্বর নন” একথা ঘোষণা করে একটি অখ্যাত ও কলঙ্কজনক বাইবেল রচনা ও প্রকাশের জন্য অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত হবেন, তাতে

বিস্ময়ের কিছু নেই।[৪৮] তাকে এক বছরের কারাদণ্ড অথবা এক হাজার পাউন্ড জরিমানা প্রদান- এ দুয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা হলো। জরিমানার অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তিনি কারাগারে থাকেন। এ দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে তিনি আপিল করলে তাকে আদালতে টানা-হেঁছড়া করা হয় এবং জনসাধারণের সামনে তাকে একজন ধর্মদ্রোহী হিসেবে প্রদর্শন করা হয়। এই অবমাননাকর আচরণকেও অবশ্য কর্তৃপক্ষ সদয় আচরণ বলেই আখ্যায়িত করেছিল, কারণ তিনি যদি স্পেনে থাকতেন তাহলে তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হত। যা হোক, সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হওয়ার ফলে তার জরিমানা কমিয়ে ৭০ পাউন্ড করা হয়। জরিমানা পরিশোধের পর এ মলিন প্রথমে কারাগার এবং পরে আয়ারল্যান্ড ত্যাগ করেন। ধর্মদ্রোহীদের প্রতি এ আচরণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন বিশিষ্ট যাজক বলেন যে, একটি অন্ধকার কারাগারে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলনকারী বিভাগ ও জরিমানা দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদক।[৪৯]

এরপর এ মলিন সেসব বিশিষ্ট সাধুদের সাথে যোগদান করেন যারা ত্রিত্ববাদ প্রত্যাখ্যান এবং এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিশ্বাসী ছিলেন। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। তিনি সর্বোচ্চ এবং তার মত অন্য কেউ নেই। আর এতে আল্লাহ হিসেবে আর কারো উল্যেখ নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে বাইবেলে এভাবে বলা হয় নি। তাই এমলিন তার পুস্তকে এ বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন: ঈশ্বর “কোন কোনো সময় সর্বোচ্চ, পবিত্র ও অবিনশ্বর সত্ত্বা হিসেবে পরিগণিত যিনি নিজে একক এবং তিনি অন্য কারো জাত নন, তার

কর্তৃত্ব এবং অন্যান্য কোনো কিছুই অন্য কারো কাছ থেকে লব্ধ নয়। তাই, যখন আমরা ঈশ্বরের কথা বলি বা সাধারণভাবে আলোচনা করি এবং প্রার্থনা করি এবং প্রশংসা করি, তখন এ বিষয়গুলোতে মহত্তম অর্থে ঈশ্বরকে বুঝাই।”

এমলিন পরবর্তীতে দেখান যে, বাইবেলে যদিও “ঈশ্বর” শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু তা প্রায়শই এমন সব ব্যক্তির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যাদেরকে সর্বোচ্চ সত্তার তুলনায় নিম্নতর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল: “ দেবদূতদের (ফিরিশতাদের) ঈশ্বর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল.... যারা ঈশ্বরের চাইতে কিছুটা নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন (গীতসংহিতা ৮ : ১, যোহন ১০: ৩৪-৩৫)। কোনো কোনো সময় একজন ব্যক্তিকেও ঈশ্বর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন নবী মূসা আলাইহিস সালামকে হারুন আলাইহিস সালাম নবীর কাছে দুইবার ঈশ্বর হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং পরবর্তীতে ফেরাউনের (Pharaoh) কাছেও। এমনকি শয়তানকেও এই পৃথিবীর ঈশ্বর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাজপুত্র ও প্রবল ক্ষমতাশালী শাসকদেরও ঈশ্বর বলে আখ্যায়িত করার কথা জানা যায় যারা অন্যায়ভাবে ও বলপূর্বক এবং ঈশ্বরের অনুমোদনক্রমে শাসক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। যিনি একক সত্ত্বাময় ঈশ্বর তিনি এ সবের ঊর্ধ্বে অবিনশ্বর। সুতরাং অন্য যাদের ঈশ্বর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তাদের চাইতে ঈশ্বরকে আমরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দেখতে পাই।”

এ বৈশিষ্ট্য আরো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমলিন ফিলোকে (Philo) উদ্ধৃত করেছেন। ফিলো সর্বোচ্চ সত্ত্বাকে "শুধুমাত্র মানুষের ঈশ্বরই নয়, ঈশ্বরের ঈশ্বর" বলে বর্ণনা করেছেন। ওল্ড টেস্টামেন্টে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার মহিমান্বিত উল্যেখ কালে তাঁকে এই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক গৌরবান্বিত আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যেহেতু বাইবেল ঈশ্বরের বর্ণনা ও ঈশ্বরের চাইতে নিম্নতম সত্ত্বারও বর্ণনাকালে "ঈশ্বর" (God) শব্দটি ব্যবহার করেছে সেহেতু এমলিন এ প্রশ্নের একটি উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন: পবিত্র গ্রন্থে দু'টি অর্থের কোনোটিতে খৃষ্টকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করা হবে? তিনি বলেন ঈশ্বরদের ঈশ্বরের তুলনায় খৃষ্ট একজন অধস্তন সত্ত্বা (দেখুন ১ করিণথীয় ৮ : ৫)। তিনি নিজেকে নিম্নের প্রশ্ন করেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন: যীশু খৃষ্টের ঊর্ধ্বতন যদি কোনো ঈশ্বর থাকেন তার কর্তৃত্ব অধিকতর বেশি এবং তার চাইতে অধিকতর ক্ষমতাবান, নয় কি? এ প্রশ্নের উত্তর একভাবে অথবা অন্যভাবে যীশুর অবস্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। যদি ঈশ্বর তার ওপর হয়ে থাকেন তাহলে তিনি অর্থাৎ যীশু সর্বোচ্চ ঈশ্বর হতে পরেন না। এমিলিনের জবাব: হ্যাঁ, তাই এবং তিনি তার জবাবের সমর্থনে ৩টি যুক্তি পেশ করেন:

যীশু সুস্পষ্টভাবে তিনি ছাড়া অন্য একজন ঈশ্বরের কথা বলেছেন।

তিনি তার ঈশ্বরকে তার চেয়ে ঊর্ধ্বতন অথবা উচ্চতর বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্রতা অর্জনের কথা বলেছেন যেহেতু তিনি সর্বোচ্চ

বৈশিষ্ট্য এবং অবিনশ্বর পবিত্রতার অধিকারী ছিলেন না যা শুধু সর্বোচ্চ সত্ত্বা ঈশ্বরেরই রয়েছে।

এমলিন উপলব্ধি করেন যে, সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে পারে সেরকম পন্থায় এই ৩টি যুক্তিকে বিশদ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। যারা সাধারণ লোকের কাছে বোধগম্য নয় এমনভাবে ধর্মগ্রন্থাদি সম্পর্কে লিখেছেন অথচ যারা তাদের রচনায় ব্যক্ত মতবাদ লোকে বিশ্বাস করবে বলে প্রত্যাশা করেছেন- তিনি সেই সব লোকদের পন্থা বর্জন করেন। এমলিন এই ৩টি যুক্তি ব্যাখ্যা করেন এভাবে:

**প্রথমত:** যীশু তার চেয়ে পৃথক অন্য একজন ঈশ্বরের কথা বলেছেন। বেশ কয়েকবার আমরা দেখি অন্য কারো সম্পর্কে তিনি বলছেন "আমার ঈশ্বর আমার ঈশ্বর" (মথি ২৭: ৪৬), "আমার ঈশ্বর আমার ঈশ্বর, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছে? (যোহন ২০ : ১৭)। নিঃসন্দেহে তিনি একথা বলতে চান নি যে, "আমার আমি আমার আমি, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছে?" এই ঈশ্বর তার চেয়ে পৃথক, যেমনটি তিনি অন্যান্য স্থানে ঘোষণা করেছেন (যোহন ৮: ৪২), উলেখ্য যে, সেখানে তিনি ঈশ্বরকে পিতা হিসেবে তার থেকে পৃথক করেন নি, কিন্তু ঈশ্বর হিসেবে এবং অতঃপর, সকল ন্যায় বিবেচনায়, তিনি স্বয়ং সেই একই ঈশ্বর হতে পারেন না, যা থেকে তিনি নিজেকে পৃথক করেছেন....

**দ্বিতীয়ত:** যীশু তিনি ছাড়া অন্য ঈশ্বরকে শুধু মেনেই নেন নি, তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে, সেই তিনি অর্থাৎ ঈশ্বর তার চেয়ে

ঊর্ধ্বতন ও উচ্চ, যেমনটি সোজাসুজি ব্যক্ত করেছেন তার শিষ্যগণ। বহু ঘটনায়ই তিনি উচ্চস্বরে পিতা ঈশ্বরের প্রতি তার আনুগত্য ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি নিজের ইচ্ছায় কিছু করার জন্য আসেননি, তার সবকিছুই শুধু পিতার (ঈশ্বর) নাম ও ক্ষমতা বলে। নিজের নয়, ঈশ্বরের মহিমাই তার কাম্য ছিল; নিজের ইচ্ছায় পরিচালনা নয়, ঈশ্বরের শাসন তার কাম্য ছিল। এ ধরনের আনুগত্য ধারণ করেই তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন। পুনরায় তিনি ঈশ্বরের ওপর তার নির্ভরতার কথা ঘোষণা করেন। এমনকি সে সকল বিষয়ও, যেগুলো একজন ঈশ্বর হিসেবে তার বলেই বলার চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োগ, মৃতকে জীবিত করা, ন্যায়বিচার বলবৎ করা ইত্যাদি। আর এসব বিষয়ে তিনি বলেছেন, “আমি নিজে কিছুই করতে পারি না।”

**তৃতীয়ত:** যীশু নিজে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন (যেমন অনর্জিত শক্তি, একচ্ছত্র ঈশ্বরত্ব, সীমাহীন জ্ঞান), একমাত্র ঈশ্বরগণের সর্বোচ্চ ঈশ্বরই যার অধিকারী এবং এটা সুনিশ্চিত যে, তিনি যদি এসব গুণের একটি বা কোনো একটির অধিকারী না হয়ে থাকেন, যা ঈশ্বরত্বের জন্য অত্যবশ্যকীয়, তাহলে তিনি সে অর্থে ঈশ্বর নন। এর কোনো একটি গুণ যদি তার মধ্যে আমরা না দেখি, তিনি অন্যগুলো চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। কেননা তার নিজের সবকয়টি ঐশ্বরিক গুণাবলি না থাকা আর নিজেকে অবিনশ্বর ঈশ্বর হিসেবে অস্বীকার করা একই ব্যাপার।

এরপর এমলিন তার সর্বশেষ যুক্তির প্রমাণ হিসেবে কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন:

ঈশ্বর এক মহান ও বিচিত্র গুণ হলো সর্বময় ও অনর্জিত সর্বময় শক্তিমত্তা। যিনি সকল কিছু অলৌকিকভাবে এবং নিজের ইচ্ছানুরূপ করতে পারেন না তিনি কখনোই সর্বোচ্চ সত্ত্বা হতে পারেন না। যদি তিনি অন্য কারো সাহায্য না নিয়ে কিছু করতে না পারেন, তাকে তুলনামূলকভাবে অপূর্ণাঙ্গ ত্রুটিযুক্ত সত্ত্বা বলে মনে হয় যেহেতু তিনি অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং তার নিজের ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে অতিরিক্ত শক্তির প্রতি তিনি নির্ভরশীল। এখন সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, যীশু (তার ক্ষমতা যাই থাক না কেন) বার বার স্বীকার করেছেন যে, তার নিজের অসীম শক্তি ছিল না: "আমি নিজে কিছুই করতে পারি না" (যোহন ৫ : ৩০)। তিনি মহা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে বলেছেন, যেমন মৃতদের পুনরুজ্জীবন, সকলের প্রতি সমবিচার করা; তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, মানুষের জানা উচিৎ যে, এসব ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা পূরণ করার মালিক ঈশ্বর। শুরুতে তিনি বলেন, "পুত্র কিছুই করতে পারে না, তার পিতা যা করেন সে তাই শুধু দেখে।" তাই, মাঝে এসেও তিনি একই কথা ব্যক্ত করেন। তিনি যেন তার মহান সত্য সম্পর্কে খুব বেশি অংহকারী না হয়ে ওঠেন সে জন্য তিনি উপসংহারে বলেন, "আমি নিজে থেকে কিছুই করতে পারি না" ... নিশ্চিতভাবে এটি ঈশ্বরের কথা নয়, একজন মানুষের কথা। যিনি সর্বোচ্চ তিনি কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি তাঁকে নিজের চেয়ে অধিক শক্তিশালী বা জ্ঞানী হিসেবে তৈরি করতে পারেন না,

কেননা পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের সাথে আর কিছু যোগ হতে পারে না। যেহেতু ঈশ্বরের ক্ষমতা একটি অত্যাবশ্যক পূর্ণতা সেহেতু সেটি যদি উদ্ভূত হয় তাহলে সত্তা বা অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও তা ঘটবে যা কিনা সর্বোচ্চ সত্তার বিরুদ্ধেই অবমাননাকর। তাঁকে উদ্ভূত সত্তা সমূহের মধ্যে স্থাপন করা তাঁকে "অ-ঈশ্বর" করারই শামিল। সর্বোচ্চ ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র তিনিই যিনি একক এবং সকল কিছুর মূল।

মার্ক তার গসপেলের ১৩ : ৩২ শ্লোকে যীশু সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন, এমলিন তা পরীক্ষা করেছেন। বিচার দিবস সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "সেই দিন সম্পর্কে কোনো মানুষ, স্বর্গের দেবদূত (ফিরিশতা) পুত্র কেউই জানে না- শুধু পিতা ছাড়া।" এমলিন বলেন, যীশুর ঈশ্বরত্ব বিশ্বাস করে এমন যে কোনো লোকের কাছেই এ বক্তব্য ঈশ্বরের একই সঙ্গে দু'টি প্রকৃতি বা দু'টি ভিন্ন অবগতির অবস্থার ধারণা প্রদান করে। কার্যত এটি একই সাথে তাঁকে কিছু জিনিস জানা এবং কিছু জিনিস না জানার মত এক উদ্ভট অবস্থায় স্থাপন করে। যদি যীশু ঈশ্বর হয়ে থাকতেন এবং ঈশ্বরের তা জানা থাকত তাহলে যীশু এ ধরনের কথা বলতেন না, কারণ এই প্রকৃতির অধিকারী হওয়ার কারণে তারও উক্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কথা।

টমাস এমলিন ভালোভাবেই সচেতন ছিলেন যে, বিপুল সংখ্যক খৃষ্টান তাকে ভুল বুঝতে পারে। তিনি তার বিশ্বাসের সমর্থনে খৃষ্টধর্মে তার সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন এই বলে যে, তিনি যীশুকে তার শিক্ষক হিসেবে শ্রদ্ধা করেন। তিনি তার অনুরাগী ভক্ত এবং পিতা,

মাতা, বন্ধু-বান্ধব সকলের চেয়ে তাঁকে বেশি ভালোবাসেন। তিনি বলেন, "আমি জানি যে, যীশু শুধু সত্যকেই ভালোবাসতেন এবং যারা তার বাণী অনুসরণ করে তিনি তাদের কারো প্রতিই ক্রুদ্ধ হবেন না যারা বলে "পিতা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ" (যোহন ১৪ : ২৮)। এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এমলিন বলেন, "ঈশ্বর যীশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন" এ কথা বলা বিপজ্জনক হবে।[৫০]

টমাস এমলিন ছিলেন একজন ঈশ্বর ভক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি তার পাণ্ডিত্য, নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার জন্য বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি নির্যাতনের মুখেও কখনো আপোশ করেন নি। তিনি ছিলেন ঐ সাধুমণ্ডলীর একজন যারা তাদের বিরোধীদের সাথে লড়াই করেছেন নির্ভীকভাবে। তারা কারাদণ্ড, নির্যাতন, এমনকি মৃত্যুদণ্ডও মাথা পেতে নিয়েছেন, কিন্তু রাষ্ট্র ও চার্চের অপশক্তির কাছে নতজানু হন নি। তারা মিলিতভাবে তাদের নির্মূল করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সার্বিক সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। কার্যত প্রতিটি নির্যাতনের ঘটনাই তাদের সেই পরমপ্রিয় বাণীকে অধিকতরভাবে জনপ্রিয় করেছে। সে বাণীটি ছিল:

ঈশ্বর তিনজন নন, একজন।

এমলিন সেই সত্য ঘোষণাকারী ভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে ছিলেন প্রথম সারির অন্যতম যার ত্রিত্ববাদে অবিশ্বাসের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার সাহস ছিল। যেসব যাজক তার সাথে যোগ দিয়েছিলেন, যারা আরিয়াসের অনুসারী ছিলেন এবং আঠারো শতকের গোড়ার দিকে আরিয়াসের অনুসারী ও অন্যান্য একত্ববাদীদের সংখ্যা ছিল

উল্লেখযোগ্য। এমলিনের বিচারের দশ বছর পর যীশুর কথিত ঈশ্বরত্ব নিয়ে প্রশ্নের ফলশ্রুতিতে যে চাপা অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল, চার্চ অব ইংল্যান্ড তার তীব্রতা উপলব্ধি করেছিল। ১৭১২ খৃস্টাব্দে স্যামুয়েল ক্লাক (Samuel Clarke) এর "Scripture Doctrine of the Trinity" গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সে চাপা অসন্তোষের বিস্ফোরণ ঘটে। এ গ্রন্থে "পিতা ঈশ্বর হলেন সর্বোচ্চ এবং খৃষ্ট ও পবিত্র আত্মা তার অধীনস্থ সৃষ্টি"- একথা প্রমাণের জন্য তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে ১২৫১ টি অংশ উদ্ধৃত করেছেন। ক্লার্ক পরে এথানাসিয়াসের ধর্মমত ও অন্যান্য ত্রিত্ববাদী বৈশিষ্ট্য বর্জন করে সর্বসাধারণের উপযোগী প্রার্থনা গ্রন্থের একটি সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করেন।

টমাস এমলিন ১৭৪১ খৃস্টাব্দে জুলাই মাসে পরলোকগমন করেন।

**থিওফিলাস লিন্ডসে (Theophilus Lindsey) ১৭২৩-১৮০৮ খৃ.**

থিওফিলাস লিন্ডসে ১৭২৩ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডে প্রথম একত্ববাদীদের সমাবেশ অনুষ্ঠানের সংগঠক। ৬০ বছর পূর্বে স্যামুয়েল ক্লার্কের সংশোধনীর ভিত্তিতে সংশোধিত প্রার্থনা রীতি ব্যবহার করে এবং প্রচলিত প্রথানুযায়ী সাদা আঙরাখা বা উত্তরবাস ছাড়া আলখেল্লা পরিধান করে লিন্ডসে লন্ডনের এসেক্স স্ট্রিটের এক নিলাম কক্ষে প্রথম প্রার্থনা সভায় বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন ও জোসেফ প্রিস্টলি সহ বহু সংখ্যক মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। পরের দিন লিন্ডসে তার এক বন্ধুর কাছে লেখা পত্রে এ ঘটনার বিবরণ দেন:

আপনি শুনে খুশি হবেন যে, গতকাল সব কিছু খুব ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। আমি যা ধারণা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বড় সমাবেশ হয়েছিল এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এতে যোগদান করেন। তাদের আচরণ ছিল পরিশীলিত ও সার্বিকভাবে সুন্দর। তাদের অনেকেই প্রার্থনা সভাকে সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত সন্তোষজনক বলে আখ্যায়িত করেন। কিছু গোলযোগের আশঙ্কা করা হয়েছিল। তবে কোনো কিছু ঘটে নি। একমাত্র যে ত্রুটি দেখা গিয়েছিল তা হলো এই যে আয়োজন প্রয়োজনের তুলনায় ছোট মনে হচ্ছিল। অনুষ্ঠান থেকে অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, সবাই গুরুত্ব দিয়েছে ও সন্তোষ প্রকাশ করেছে। আমার এখন প্রত্যয় জন্মেছে যে, এ প্রচেষ্টা ঈশ্বরের আশীর্বাদে ব্যাপক কল্যাণে আসবে। আমাদের ও চার্চের প্রার্থনার মধ্যে বৈপরীত্য প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমাকে একথা বলার জন্য ক্ষমা করবেন যে, আমার লজ্জাবোধ করা উচিৎ ছিল যে, আমি একটি সাদা পোশাক পরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলাম। উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউই এটা চায় নি বলে মনে হয়েছে। সেখানে যে কোনো অঘটন ঘটে নি, শুধু এ কারণেই আমি সন্তুষ্ট নই, আমি সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের ব্যাপারেই সন্তুষ্ট যা আগে কখনো হইনি। একথা আমাকে আবারও বলতে হচ্ছে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও করুণার ফলে আমরা এটা ভালোভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা শুধু আশা পোষণ করি যে, আমাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে তার আশীর্বাদ ও করুণা অব্যাহত থাকবে...।[৫১]

এসেক্স ট্রিটের এই ধর্মীয় সমাবেশ অন্যান্য একত্বাবাদীদের বার্মিংহাম, ম্যাঞ্চেষ্টর ও ইংল্যান্ডের অন্যান্য শহরে ছোট গির্জা (Chape) প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করে। গির্জায় ধর্মপালনের স্বাধীনতা মতবাদগত স্বাধীনতার বিকাশ ঘটায়। এর ফলে ১৭৯০ খৃস্টাব্দে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাকালে লিন্ডসে সকলের কাছে সুস্পষ্ট ও সহজ করে তোলার জন্য নিম্নোক্ত “সত্য” গুলো ব্যক্ত করেন যার কাছে পবিত্র গ্রন্থসমূহে বিশ্বাসী সকল মানুষ আগে বা পরে অবশ্যই নতি স্বীকার করবে ও মেনে নেবে:

ঈশ্বর একজন। তিনি একক সত্ত্বা, যিনি ঈশ্বর তিনি একমাত্র স্রষ্টা ও সকল কিছুর সার্বভৌম প্রভু; যীশু ইয়াহূদী জাতিভূক্ত একজন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ছিলেন ঈশ্বরের বান্দা, তার দ্বারা বিপুল মর্যাদা মণ্ডিত ও সম্মান প্রাপ্ত; আত্মা অথবা পবিত্র আত্মা কোনো ব্যক্তি নন অথবা বুদ্ধি জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী নন, তিনি শুধু এক বিশেষ শক্তি অথবা ঈশ্বরের উপহার, তিনি যীশুখৃষ্টের জীবনকালে তাকে সংবাদাদি প্রদান করতেন এবং তার পরবর্তী সময়ে তিনি ধর্ম প্রচারকগণ ও বহু আদি খৃষ্টানকে সাফল্য জনকভাবে গসপেলের প্রচার ও প্রসার শক্তি ও উৎসাহ জুগিয়েছেন (প্রেরিতদের কার্য ১ : ২)।

এবং এই ছিল ঈশ্বর এবং খৃষ্ট এবং পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত মতবাদ যা ধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক শিক্ষা প্রদান এবং ইয়াহূদী ও পৌত্তলিকদের কাছে প্রচার করা হয়েছে।[৫২]

এই আধুনিক প্রত্যয় দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে ইংরেজ একত্ববাদ তার শ্রেষ্ঠতম যুগে প্রবেশ করে।

লিন্ডসে তার রচনায় যীশুখৃষ্ট যে ঈশ্বর নন, সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করেন:

যীশু কখনোই নিজেকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা বা আখ্যায়িত করেন নি। এমনকি, তিনি এক ব্যক্তি যার দ্বারা সকল কিছু সৃষ্টি হয়েছে এরকম সামান্যতম কোনো আভাসও তিনি দেন নি।

ওল্ড টেস্টামেন্টের পবিত্র গ্রন্থগুলোর সবগুলোতেই শুধু এক ব্যক্তি, এক যিহোভা, এক ঈশ্বর, তাকে একা এবং সকল কিছুর স্রষ্টা বলে বলা হয়েছে। যোহন এর গসপেল এর ৫ : ৭ শেক প্রসঙ্গে উলেখ্য যে, যোহনের মত একজন ধর্মনিষ্ঠ ইয়াহূদী হঠাৎ করে একজন অন্য স্রষ্টা, একজন নতুন ঈশ্বর হাযির করবেন, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি কখন এই অদ্ভুত মতবাদ উদ্ভাবন করলেন এবং কোনো ক্ষমতাবলে তা প্রচার করলেন, সেটা জানা যায় না। বিশেষ করে তিনি নিজেই যেখানে বিশ্বাস করতেন যে, মূসা আলাইহিস সালাম নবীর বিধান অনুযায়ী যিহোভা ছাড়া অন্য কোনো ঈশ্বরের বিশ্বাস স্থাপন বা উপাসনা করা মূর্তি পূজার মতোই একটি অপরাধ এবং ধর্মের প্রতি অবমাননা কর। তার গুরু প্রভূ যীশু যিহোভা ছাড়া অন্য কোনো ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন বা উপাসনা করা মূর্তি পূজার মতই একটি অপরাধ এবং ধর্মের প্রতি অবমাননা কর। তার গুরু প্রভূ যীশু যিহোভা ব্যতীত অন্য কোনো ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নি, তিনি নিজের সম্পর্কেও কখনো এরকম কিছু বলেন নি; বরং

তিনি বলেছেন যে, পিতা, যার দূত ছিলেন তিনি, তিনিই তাকে কি বলতে হবে এবং কি বলা উচিৎ তার নির্দেশনা প্রদান করেছেন (যোহন ১২ : ৪৯)।

গসপেল ইতিহাসের লেখকগন একজন ঐশী ব্যক্তি, পিতাকে, একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বর বলেছেন (যোহন ১৭ : ৩)

মার্ক, মথি ও লূক কেউই তাদের স্ব- স্ব গসপেল লেখার সময় কারো সাথে আলোচনা করেন নি। তারা কখনোই যীশু ঈশ্বর ছিলেন বলে কোনো ইঙ্গিত দেন নি। তারা যদি তাকে ঈশ্বর এবং বিশ্বের স্রষ্টা হিসেবেই জানতেন, সেক্ষেত্রে এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা নিশ্চুপ থাকতেন -একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

যোহন যিনি তার গসপেলের শুরুতেই ঈশ্বরকে ঈশ্বর এবং যীশুকে রক্ত মাংসের মানুষ রূপী বাণী বলে উল্লেখ করেছেন, গসপেলের অবশিষ্ট অংশে তিনি যীশুকে ঈশ্বর বলে আখ্যায়িত করতে পারেন না।

লূকের গসপেল পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে দেখা যায়, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মা মেরীর গর্ভে জন্মগ্রহণের পূর্বে যীশুর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। (যেহেতুঃ

৩.২৩.৩৮ এ যীশুর বংশানুক্রমের ধারাবাহিক উল্লেখ আছে।

৪: ২৪ এবং ৮: ৩৩ এ যীশুকে ঈশ্বরের নবী বলে স্বীকার করা হয়েছে।

৭: ১৬ ও ২৪: ১৯ এ যীশুকে নবী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৩: ১৩, ২৬ ও ৪: ২৭, ৩০ এ পিটার ও অন্য কয়েকজন ধর্মপ্রচারক যীশুকে ঈশ্বরের বান্দা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

১৭: ২৪, ৩০ এ লূক তাকে "মানুষের পুত্র" পৃথিবীর স্রষ্টা ঈশ্বরের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

যারা যীশুর উপাসনা করে লিন্ডসে তাদের প্রশ্ন করেছেন যে, যীশু যদি তাদের সামনে হাযির হন ও নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করেন, তখন তাদের প্রতিক্রিয়া কি হবে:

তোমরা আমার উপাসনা কর কেন? আমি কি তোমাদের কখনো এ ধরনের নির্দেশ দিয়েছি অথবা ধর্মীয় উপাসনার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে আমি কি নিজের নাম তোমাদের কাছে প্রস্তাব করেছি?

আমি কি সর্বদা এবং একেবারে শেষ পর্যন্ত পিতা, আমার ও তোমাদের পিতা, আমার ও তোমাদের ঈশ্বরের উপাসনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করি নি? (যোহন ২০ : ১৭)

আমার শিষ্যরা তাদের প্রার্থনা শেখানোর জন্য আমাকে অনুরোধ করেছিল (লূক ১১ : ১-২)। আমি কি তখন তাদেরকে আমার কাছে প্রার্থনার অথবা পিতা ছাড়া অন্য কারো প্রার্থনা করার শিক্ষা দিয়েছিলাম?

আমি কি কখনো নিজেকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেছিলাম অথবা তোমাদের কি বলেছিলাম যে, আমিই বিশ্বের স্রষ্টা এবং আমার উপাসনা করতে হবে?

সোলায়মান আলাইহিস সালাম উপাসনালয় (বায়তুল মুকাদ্দস) নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর বলেছিলেন, "ঈশ্বর কি সত্যই পৃথিবীতে বাস করবেন? স্বর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, স্বর্গের স্বর্গও তাঁকে ধারণ করতে পারে না; আমি যে ভবন নির্মাণ করেছি তা তার চেয়ে কত যে নুনতম (রাজাবলি ৩৮: ২৭)[৫৩]

এক ঈশ্বরে লিন্ডসের বিশ্বাসের বিষয়টি নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়:

সকল স্থানে চিরন্তন ঈশ্বরের উপাসনা হওয়া প্রয়োজন, কারণ তিনি সর্বত্র বিরাজিত... কোনো স্থানই অন্যটির চেয়ে অধিক পবিত্র নয়, কিন্তু প্রতিটি স্থানই উপাসনার জন্য পবিত্র। উপাসনাকারীরাই স্থান নির্ধারণ করে। কেউ যখন ভক্তিপূর্ণ বিনয়াবনত চিত্তে সেখানে ঈশ্বরের সন্ধান করে তখন ঈশ্বর সেখানে থাকেন। পাপমুক্ত মনই হচ্ছে ঈশ্বর প্রকৃত মন্দির।[৫৪]

### যোসেফ প্রিস্টলি (Josheph Priestly) ১৭৩৩-১৮০৪)

যোসেফ প্রিস্টলি ১৭৩৩ খৃস্টাব্দে লিডস এর ৬ মইল দক্ষিণ- পশ্চিমে ক্ষুদ্র ফিল্ডহেড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন স্থানীয় একজন বস্ত্র উৎপাদক। প্রিস্টলি ছিলেন পিতার জ্যোষ্ঠপুত্র। তার ৬

বছর বয়সের সময় মা মারা যান। কঠোর ক্যালভিনীয় শিক্ষায় বাড়িতে তিনি বেড়ে ওঠেন। কিন্তু স্কুলে তিনি সেই সব ভিন্ন ধর্মীয় আদর্শের অনুসারী শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন যারা চার্চ অব ইংল্যান্ডের মতবাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করতেন। একজন যাজক হওয়ার লক্ষ্যে তিনি ল্যাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করেন। আদমের পাপ (Adam’s Sins) বিষয়ে তিনি পর্যাপ্ত অনুতাপ প্রদর্শন না করায় তাকে বন্ধু সভার (Elders of the Quakers) সদস্য ভুক্তি করতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। অর্থোডক্স চার্চের সকল মতবাদের অনুসারী নয়, এমন কাউকে গ্রহণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অস্বীকৃতি জানায়। ফলে তাকে একটি সুপরিচিত একাডেমিতে পাঠানো হয় যেখানে শিক্ষক ও ছাত্ররা অর্থোডক্স চার্চের মতবাদ ও ‘ধর্মবিরোধী মতবাদ’ তথা একত্ববাদে বিশ্বাসের মধ্যে বিভক্ত ছিল। এখানে প্রিস্টলি খৃষ্টান চার্চের মৌলিক মতবাদ সমূহের বিশেষ করে ত্রিত্ববাদের সত্যতার ব্যাপারে গভীরভাবে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেন। তিনি যতই বাইবেল পাঠ করলেন ততই তার নিজের মতে আস্থাশীল হয়ে উঠলেন। আরিয়াস, সারভেটাস ও সোজিনির রচনা তার মনের ওপর গভীর ছাপ ফেলে। তাদের মত তিনিও সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ধর্মগ্রন্থগুলো ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে জোরালো প্রমাণ দিতে পারে নি। এর ফল হলো এই যে, তিনি যখন শিক্ষা শেষ করে একাডেমি ত্যাগ করলেন, দেখা গেল তখন তিনি একজন কট্টর আরিয়াস অনুসারীতে পরিণত হয়েছেন।

প্রিস্টলি বার্ষিক ৩০ পাউন্ড বেতনে একজন যাজকের সহকারী নিযুক্ত হন। যখন আবিষ্কৃত হলো যে, তিনি একজন আরিয়াস অনুসারী তখন তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। ১৭৫৮ খৃস্টাব্দে তিনি চেশায়ারে নান্টউইচে (Nantwich) একজন যাজক হিসেবে নিয়োগ লাভ করতে সক্ষম হন। সেখানে তিনি তিন বছর চাকুরি করে। তার আয় অতি সামান্য হওয়ায় প্রাইভেট টিউশনির মাধ্যমে তিনি আরো অর্থোপার্জন করতেন। খুব শিগগিরই একজন ভালো শিক্ষক হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আরিয়াসপন্থীরা ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে ওয়ারিংটনে (Warrington) একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করলে প্রিস্টলি নান্টউইচ ত্যাগ করেন এবং সেখানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। অবসরকালীন সময়ে তিনি প্রায়ই লন্ডন গমন করতেন। এভাবেই এক সফরের সময় লন্ডনে বিজ্ঞানী বেনজামিন ফ্রাংকলিনের সাথে তার প্রথমবারের মত সাক্ষাৎ ঘটে। ১৬৬৭ সালে তিনি তার পুরোনো বাসস্থানের কাছাকাছি লিডস (Lids)-এর মিল হিল (Mill Hill)- এর যাজক হয়ে আসেন। সেখানে তিনি ৬ বছর ছিলেন। লিডস-এ প্রিস্টলি বেশ কিছু পুস্তিকা প্রকাশ করেন। শিগগিরই একত্ববাদের একজন অসাধারণ ও জ্ঞানী মুখপাত্র হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। অবসর সময়ে তিনি রসায়নবিদ্যা পাঠ করতে শুরু করেন। এ ক্ষেত্রে তার সাফল্য ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি রয়াল সোসাইটির স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৭৭৪ সালে তিনি অক্সিজেন আবিষ্কার করার ফলে অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে আরো গবেষণায় তিনি নতুন কিছু গ্যাস আবিষ্কার করেন যা তার আগে আর কোনো বিজ্ঞানী করতে পারেন নি। তবে

পদার্থ বিজ্ঞানের চেয়ে ধর্মের ব্যাপারেই তিনি বেশি উৎসাহী ছিলেন। তাই তিনি এসব আবিষ্কারকে একজন ধর্মতত্ত্ববিদের অবসর মুহূর্তের ফসল হিসেবেই বিবেচনা করতেন। আত্মজীবনীতে প্রিস্টলি তার এসব যুগান্তকারী আবিষ্কার সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাত্র একটি পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন। এক সময় তিনি লিখেছিলেন: "রসায়নের কয়েকটি শাখায় আমি কিছু আবিষ্কার করেছি। আমি এ ব্যাপারে কখনোই স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত মনোযোগ দিই নি এবং সাধারণ প্রক্রিয়াসমূহের ব্যাপারেও আমি সামান্যই জানতাম।[৫৫]

পরবর্তীতে যোসেফ প্রিস্টলি আর্ল অব শেলবার্সের (Earl of Shellburne) লাইব্রেরিয়ান ও সাহিত্য সঙ্গী হন। এ কাজের জন্য তাকে আকর্ষণীয় বেতন এবং তার খুশি মত কাজ করার স্বাধীনতাসহ আজীবন ভাতা বরাদ্দ করা হয়। তিনি এ কাজে ৭ বছর নিয়োজিত ছিলেন। তার গ্রীষ্মের দিনগুলো কাটত আর্লের পল্লী- প্রসাদে এবং শীতকাল কাটত লন্ডনে। প্যারিস, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও জার্মানী সফরের সময় তিনি আর্লের সঙ্গী ছিলেন। আর্ল বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনের সাথে প্রিস্টলির বন্ধুত্বের কারণে বিব্রত বোধ করতে থাকেন। করণ এ সময় ফ্রান্সে যে বিপ্লব চলছিল ফ্রাংকলিন তার সমর্থক ছিলেন। প্রিস্টলি আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রাংকলিনের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং এর অত্যল্পকাল পরই বসবাসের জন্য বার্মিংহাম চলে যান। এই শহরে তার বসবাস ১১ বছর স্থায়ী হয়। যদিও শেষদিকটি ছিল অত্যন্ত মর্মবিদারক ট্রাজেডি, তা সত্ত্বেও এটিই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে সুখকর অধ্যায়। যাজক

হিসেবে তাকে সপ্তাহে মাত্র এক দিন অর্থাৎ রবিবারে দায়িত্ব পালন করতে হতো। সে কারণে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে তিনি প্রাণভরে গবেষণাগারে কাজ করতে ও ইচ্ছেমত লিখতে পারতেন।

বার্মিংহামে থাকতে প্রিস্টলি তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী গ্রন্থ History of the Corruptions of Christianity রচনা করেন। এ গ্রন্থটি চার্চকে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ করে তোলে। এ গ্রন্থে প্রিস্টলি শুধু ত্রিত্ববাদের বৈধতা প্রত্যাখ্যানই করেন নি, উপরন্তু তিনি যীশুর মানবীয়তাকেও সমর্থন করেন। তিনি বলেন, যীশু জন্ম সম্পর্কে যেসব বর্ণনা ও বিবরণ পাওয়া যায় তা পরস্পর অসংগতিপূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যীশু ছিলেন একজন মানুষ। মানুষের মতই সকল উপাদানে তিনি গঠিত ছিলেন। আর দশজন মানুষের মত তিনিও অসুস্থতা, অজ্ঞতা, সংস্কার ও দুর্বলতার প্রবণতা সম্পন্ন ছিলেন। বিশ্বে নৈতিক বিধান চালুর জন্যই ঈশ্বর তাঁকে নির্বাচিত করেছিলেন। তার কাজ ও দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল অলৌকিক ক্ষমতা। যীশুকে মৃত্যু পরবর্তী পরলৌকিক জীবন সম্পর্কে বিপুল জ্ঞান দান করে মানুষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল যে জীবনে মানুষকে তার ইহজীবনের সৎকাজের জন্য পুরস্কৃত করা হবে, নিছক খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য নয়। সরকার কিংবা চার্চ কেউই প্রিস্টলির এই মত পছন্দ করতে পারে নি।

প্রিস্টলি যীশুর মানবীয়তাকে শুধু সমর্থনই করেন নি, যীশুর অলৌকিক জন্মগ্রহণের (Immaculate Conception) বিষয়টিও তিনি প্রত্যাখ্যান

করেন। এভাবে তিনি এক নয়া চিন্তার ভিত্তি স্থাপন করেন। এর ফলশ্রুতিতে একত্ববাদীদের অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরে হাল-বিহীন এক জাহাজের মত। সার্বজনীন একত্ববাদ নামে পরিচিত যে আন্দোলনের সূচনা হয়, তাতে এক দিক নির্দেশনার একান্তই অভাব ছিল। তাই যীশুর অলৌকিক জন্মগ্রহণের ধারণা প্রত্যাখ্যান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও তিক্ত এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে যা একত্বাদের সমর্থকদের মঙ্গলের চাইতে ক্ষতিসাধন করে বেশি। ফরাসি বিপ্লব ও সন্ত্রাসের রাজত্বের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ইংল্যান্ডেও অনুরূপ আরেকটি আন্দোলনের জন্ম ঘটে যা বহু ইংল্যান্ডবাসীকে ভীত করে তোলে। গোঁড়া চার্চ এই সুযোগে প্রচারণা চালাতে থাকে যে, প্রিস্টলির শিক্ষা ইংল্যান্ডেও অনুরূপ ট্রাজেডির সৃষ্টি করবে। এর ফলে প্রিস্টলিকে অপমান করে ও তাকে হুমকি দিয়ে লেখা অসংখ্য চিঠি তার বাড়িতে আসতে শুরু করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে তার কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়।

১৭৯১ খৃস্টাব্দে ১৪ জুলাই একদল লোক বার্মিংহামের একটি হোটেলে বাস্তিল পতনের বার্ষিকী উদযাপন করছিল। এ সময় শহরের বিচারকদের নেতৃত্বে এক বিশাল জনতা হোটেলের বাইরে সমবেত হতে শুরু করে। প্রিস্টলি এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন ধারণা করে তারা হোটেলে হামলা চালায় ও জানালার কাচ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। প্রিস্টলি সেখানে ছিলেন না। জনতা তখন প্রিস্টলির বাড়িতে হামলা চালায়। প্রিস্টলির ভাষায় "তারা নিষ্ঠুরভাবে লুণ্ঠনপূর্ব সমাপ্ত করে বাড়িটিতে আগুন জ্বালিয়ে দিল।"[৫৬] তার গবেষণাগার, লাইব্রেরি এবং তার সকল পাণ্ডুলিপি ও দলিলপত্র পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। এক বন্ধু

আগে থেকে সতর্ক করে দেওয়ায় প্রিস্টলি কোনো রকমে প্রাণে রক্ষা পান। পরদিন সকল গুরুত্বপূর্ণ একত্ববাদে বিশ্বাসী মানুষের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এর দু'দিন পর জনতা, যারা ঘোষিত একত্ববাদী নয়, কিন্তু একত্ববাদীদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েছে এমন সব লোকদের বাড়িগুলোও পুড়িয়ে দেয়। এ সময়টি বার্মিংহামের লোকজনের কাটে আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে। সকল দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণ মানুষকে উন্মত্ত জনতার রোষ থেকে বাঁচার জন্য "চার্চ ও রাজা" চিৎকার করে উচ্চারণ করতে ও দরজায় লিখে রাখতে দেখা যায়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। তখন দাঙ্গাকারীরা অদৃশ্য হয়।

এ পর্যায়ে বার্মিংহামে অবস্থান করা প্রিস্টলির জন্য বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। তিনি ছদ্মবেশে লন্ডনের উদ্দেশ্যে বার্মিংহাম ত্যাগ করেন। বার্মিংহামের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন: "আইনবিহীন সহিংসতা থেকে পালানোর পরিবর্তে আমি পালিয়েছিলাম গণবিচার থেকে। চূড়ান্ত প্রতিহিংসার উন্মত্ত আবেগ নিয়ে সেখানে আমাকে খোঁজা হচ্ছিল।"[৫৭] লন্ডনে এসে লোকের চিনে ফেলার ভয়ে তিনি রাস্তায় প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে সক্ষম ছিলেন না। ইতোমধ্যে তার আশ্রয়দাতার বাড়িতে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ফলে তাকে একটি ভাড়া বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়। তার গৃহস্বামী শুধু বাড়ি হারানোর ভয়েই শঙ্কিত ছিলেন না, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হারানোর ভয়েও ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

১৭৯৪ খৃস্টাব্দে বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনকে সাথে নিয়ে প্রিস্টলি আমেরিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। ফিলাডেলফিয়া পৌঁছে তারা শহরে ও আশপাশে প্রথম কয়েকটি একত্ববাদীদের চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী বছরগুলোতে ইংল্যান্ডের পরিস্থিতি অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে আসে। ১৮০২ খৃস্টাব্দে প্রিস্টলির পুরোনো সংগঠন একটি ক্ষুদ্র গির্জা স্থাপন করে। একত্ববাদীদের এক শীর্ষস্থানীয় নেতা বিলাশামকে (Bilsham) উক্ত গির্জার উদ্বোধনী ধর্মোপদেশ প্রদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে প্রিস্টলি আমেরিকাতেই থেকে যান। ১৮০৪ খৃস্টাব্দে তিনি মারা যান।

ইংল্যান্ডে একত্ববাদীদের জন্য প্রিস্টলির বড় অবদান হলো ঈশ্বরের একত্বের সমর্থনে ব্যাপক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক যুক্তিসমূহ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এবং প্রাচীন খৃষ্টান যাজক ও ধর্মপ্রচারকগণের রচনা থেকে এসব যুক্তি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলো তিনি তার সময়কালের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমস্যায় যুক্তিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করতেন। তিনি লিখেছিলেন, “অসার বিষয়কে শক্তি দিয়ে যুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে টিকিয়ে রাখা পায় না।”[৫৮] তার সকল ধর্মীয় কর্মকান্ডের মধ্যে দুই খন্ডে লেখা History of the corruptions of Christianity গ্রন্থটি ছিল সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। এ গ্রন্থে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, প্রকৃত খৃষ্টান ধর্ম, যা প্রথমদিকের চার্চের ধর্ম বিশ্বাসের অঙ্গ ছিল, তা একত্ববাদী এবং এ বিশ্বাস থেকে সকল ধরনের বিচ্যুতি কার্যত ধর্মবিকৃতি ছাড়া কিছুই নয়। এ গ্রন্থটি ইংল্যান্ড ও আমেরিকার গোঁড়া খৃষ্টানদের ক্রুদ্ধ এবং উদার পন্থীদের আনন্দিত করেছিল। হল্যান্ডে গ্রন্থটি প্রকাশ্যে পোড়ানো হয়। এ গ্রন্থে প্রিস্টলি লিখেছেন:

খৃষ্টান ধর্মের পদ্ধতিটি বিবেচনা করে দেখলে যে, কেউ একে ধর্মের বিকৃতি ও অপব্যবহারের জন্য দায়ী বলে ভাবতে পারে। খৃষ্টান ধর্মের বাহ্যিক রূপে থেকে যা মনে হয় তা হলো এই যে, মানব জাতির শাশ্বত পিতা (ঈশ্বর) যিশুখ্রিস্টকে মানুষকে সৎকাজ করার আহ্বান জানাতে, অনুশোচনাকারীদের জন্য তার ক্ষমার আশ্বাস প্রদান করতে এবং সকল সৎকর্মকারীদের জন্য পরকালে অমর জীবন ও সুখময় দিন যাপনের সংবাদ পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করেন। এর মধ্যে এমন কিছু নেই যা নিয়ে দুর্বোধ্য জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি বা আপত্তিকর মনে হতে পারে। এ মতবাদ এতই সরল যে, জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলের কাছেই তা শ্রদ্ধার বিষয় বলে যে কারোরই মনে হবে। যে ব্যক্তি এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, সে এ ধর্মের প্রচারকালে এ ধর্ম ব্যবস্থার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভয়ংকর বিকৃতি ও অপব্যবহার সম্পর্কে কিছু খুঁজতে গেলে ব্যর্থ হবে। যীশু ও তার ধর্মপ্রচারকগণ পূর্ব থেকেই অবহিত হয়েছিলেন যে, এক সময় সত্য থেকে ব্যাপক বিচ্যুতি ঘটবে এবং তারা যা শিক্ষা প্রদান করেছেন তার সাথে চার্চের মতবাদের বিরাট ফারাক ঘটবে, এমনকি তা সত্য ধর্মের জন্য ধ্বংসকর হবে।

যা হোক, বাস্তবে ধর্মের বিকৃতির কারণসমূহ উত্তরোত্তর বহাল থাকে এবং তদনুযায়ী, ধর্মের স্বাভাবিক রীতি- নীতি আরো অনুসরণের বদলে অপব্যবহার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। এক্ষেত্রে যা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক তা হলো, সত্য ধর্মের স্বাভাবিক কারণে এসব অপব্যবহার ধীরে ধীরে সংশোধিত হচ্ছে এবং খৃষ্টানধর্ম তার প্রকৃত সৌন্দর্য ও মহিমা ফিরে পাচ্ছে।

এ ধর্মীয় বিকৃতির কারণসমূহ প্রায় সর্বাংশেই অ-খৃষ্টান জগতের প্রচলিত মত থেকে উদ্ভূত, বিশেষ করে তাদের দর্শনের অংশ এগুলো। সে কারণেই এই অ-খৃষ্টানরা যখন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করল তারা এর সাথে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কারগুলিও মিশিয়ে দিল। উপরন্তু ইয়াহূদী ও অ-খৃষ্টানরা উভয়েই অভিন্ন অনিষ্টকারী হিসেবে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন এমন এক ব্যক্তির অনুসারী হওয়ার ধারণায় এতবেশি মর্মপীড়ার শিকার হয়ে পড়েছিল যে, খৃষ্টানরা এ কলঙ্ক একেবারে মুছে ফেলতে যে কোনো মতবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল।

বলা হয় যে, মানুষের মানসিক ক্ষমতা শরীর কিংবা মস্তিষ্ক থেকে পৃথক বিষয় এবং এই অদৃশ্য আত্মিক অংশ, অথবা আত্মা, দেহের সাথে সম্মিলনের পূর্বে বা পরে নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম, সকল দর্শনের মধ্যেই তা গভীর শিকড় বিস্তার করেছে, এই উদ্দেশ্যের জবাব খোঁজার ক্ষেত্রে চমৎকারভাবে তার ওপর নির্ভর করা হয়েছে। এ পন্থায় খৃষ্টানরা খৃষ্টের আত্মাকে তার জন্মের পূর্বেই তাদের পছন্দ মত একটি ঐশ্বরিক মর্যাদায় স্থাপিত করতে সক্ষম হয়। প্রাচ্য দর্শন থেকে উদ্ভূত মতবাদ গ্রহণকারী অধ্যাত্ম রহস্যবাদী খৃষ্টানগণ এ নীতি অবলম্বন করেছিল। পরবর্তীতে খৃষ্টান দার্শনিকগণ জ্ঞান অথবা ঈশ্বর পিতার সর্ব নিয়ন্ত্রক শক্তিকে ব্যক্তিসম্ভুত করে ঈশ্বর পিতার সমকক্ষ করার অন্য নীতি গ্রহণ করে...।

খৃষ্টানধর্মের সদর্থক প্রতিষ্ঠানগুলোর অপব্যবহার ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। এর উদ্ভব ঘটে ধর্মীয় রীতি ও অনুষ্ঠানের বিশুদ্ধকরণ ও পবিত্রকরণের

মতবাদ থেকে, যা ছিল অ-খৃষ্টানদের উপাসনার সর্বপ্রধান ভিত্তি এবং সেগুলো ছিল ইয়াহূদী ধর্মের অপব্যবহারের অনুরূপ। আমরা অ-খৃষ্টানদের মত ও আচার-কর্মের মধ্যে সন্ন্যাসীদের কৃচ্ছ্রতার সকল উপাদান দেখতে পাই যারা শরীরকে মাসকারাভূষিত হওয়ার ও বাসনা দমন করার মাধ্যমে আত্মাকে পবিত্র ও মহিমান্বিত করার চিন্তা করত। চার্চের কর্তৃত্বের এই অপব্যবহারকে সহজেই বেসামরিক সরকারের অপব্যবহারের মতই ব্যাখ্যা করা যেত। জাগতিক স্বার্থসম্পন্ন লোকেরা তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যে কোনো সুযোগকে কাজে লাগাতে সদাপ্রস্তুত ছিল এবং অন্ধকার যুগে এমন বহু ঘটনা সংঘটিত হয় যা তাদেরকে এ ধরনের বিচিত্র সুযোগ এনে দিয়েছিল।

সামগ্রিকভাবে আমি বলতে চাই যে, একজন মনোযোগী পাঠকের কাছে এটা সুস্পষ্ট হবে যে, খৃষ্টান ধর্মের ধর্ম বিশ্বাস ও প্রতিটি কর্মকান্ডে বিকৃতি রয়েছে, আর তা হলো পরিস্থিতিতে তার প্রচার ঘটেছিল, তারই ফল। এ সাথে একথাও বলতে হয় যে, এ বিচ্যুতি থেকে মুক্তিও বিভিন্ন পরিস্থিতির স্বাভাবিক পরিণতি।

পুরো বিষয়টিকে (খৃষ্টানদের ভ্রান্ত অবস্থান) সংক্ষিপ্ত করলে দাঁড়ায়:

1) সাধারণ সভা পুত্রকে পিতার মত একই বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেছিল।
2) পবিত্র আত্মাকে ত্রিত্ববাদের অন্তর্ভুক্ত করেছিল।
3) মানবিক আত্মার অধিকারী খৃষ্টকে বিশ্ব নিয়ন্ত্রক শক্তির সাথে সংযুক্ত করেছিল।

4) খৃষ্টের ঐশ্বরিক ও মানবিক বৈশিষ্ট্যের কল্পিত মিলন ঘটিয়েছিল এবং
5) এই মিলনের পরিণতি হিসেবে দু'টি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে একই ব্যক্তি গঠিত হওয়ার কথা সমর্থন করেছিল।

এসব বৈশিষ্ট্য মনে রাখার জন্য যথেষ্ট ভালো স্মৃতিশক্তি প্রয়োজন। কারণ এগুলো শুধু কথার বেসাত, এর সাথে ভাবনা- চিন্তার কোনো সম্পর্ক নেই।[৫৯]

"The History of Jesus Christ" নামে প্রিস্টলি আরো একটি গ্রন্থে তিনি বলেছেন:

আমরা যখন কোনো বিষয়ে একটি বা বেশ কিছু বইয়ের মতবাদ খুঁজে দেখি এবং যখন বিভিন্ন মতের সমর্থনে বক্তব্যসমূহ দেখতে পাই, তখন আমাদের প্রধানত বিবেচনা করতে হবে যে, পুরো গ্রন্থটির মূল সুর ও মর্ম কি অথবা এ ব্যাপারে প্রথম সযত্ন অনুসন্ধান একজন নিরপেক্ষ পাঠকের ওপর কি ছাপ ফেলবে...।

আমরা যদি সৃষ্টি সম্পর্কে মূসা আলাইহিস সালামের ধারণা আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, তিনি একজনের বেশি ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নি যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি পৃথিবীতে গাছপালা ও জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি মানুষও সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর সম্পর্কে বহুবচনাত্মক সংখ্যা তখনি ব্যবহৃত হতে পারে যখন তার বক্তব্য এভাবে উপস্থাপন করা হয়। "চল, আমরা মানুষ সৃষ্টি করি" (আদি পুস্তক ১ : ২৬); কিন্তু এটা যে শুধুমাত্র বাগশৈলী তার প্রমাণ

মিলে কিছু পরেই একবচন সংখ্যা থেকে, ঈশ্বর মানুষকে তার নিজস্ব কল্পনায় সৃষ্টি করেছেন। (আদি পুস্তক ৫ : ২৭), সুতরাং স্রষ্টা কিন্তু একজনই। উপরন্তু বাইবেলের তোরণ নির্মাণ বিবরণেও আমরা পাঠ করি যে, "ঈশ্বর বললেন, চল আমরা নীচে নামি এবং সেখানে তাদের ভাষা তালগোল পাকিয়ে গেছে" (আদি পুস্তক ১১ : ৭); কিন্তু পরবর্তী বাক্যেই আমরা দেখতে পাই যে, প্রকৃতপক্ষে এ কাজটি যিনি করেছিলেন তিনি ছিলেন একক সত্ত্বা মাত্র।

ঈশ্বরের সঙ্গে আদম আলাইহিস সালাম নূহ আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য নবীর কথোপকথনের ক্ষেত্রে কখনোই এক সত্ত্বা ছাড়া অন্য কিছুর উল্লেখ পাওয়া যায় না। তারা ঈশ্বরকে একজন হিসেবেই সম্বোধন করেছেন। কোনো কোনো সময় তাকে "যিহোভা" অন্যান্য সময় "ইবরাহিমের ঈশ্বর" ইত্যাদি নামেও তাকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু এখানে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না যে, প্রথমেই যাকে ঈশ্বর নামে সাধারণ সম্বোধন করা হয়েছে এবং পৃথিবী ও স্বর্গের স্রষ্টা বলে যাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তিনি একই সত্ত্বা।

ধর্মগ্রন্থগুলোতে স্বর্গীয় দূতদের (Angels) বিষয়ে বারংবার উল্লেখ রয়েছে যারা কখনো কখনো ঈশ্বরের নামে কথা বলেছেন, কিন্তু তারা সর্বদাই স্রষ্টা এবং ঈশ্বরের দাস হিসেবে উল্লিখিত... কোনো অবস্থাতেই এসব স্বর্গীয় দূতকে "ঈশ্বর" বলা যেতে পারে না। তারা সর্বোচ্চ সত্ত্বার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে কিংবা তার সমমর্যাদা সম্পন্ন হতে পারেন না।

ঈশ্বরের একত্ব সম্পর্কিত সবচেয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়ে ওল্ড টেস্টামেন্টে বার বার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রথম নির্দেশ হলো, "আমার পূর্বে আর কোনো ঈশ্বর ছিল না" (যাত্রা পুস্তক ২০ : ৩)। এ কথাটি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, " হে ইসরাইলিরা, শোন, যিনি প্রভূ তিনিই ঈশ্বর, তিনি একজনই" (দ্বিতীয় বিবরণ ৫: ৪)। এ বিষয়ে পরবর্তী নবীদের ক্ষেত্রে কি ঘটেছিল তা পুনরাবৃত্তি করার সুযোগ আমার নেই। দেখা যায়, ইয়াহূদী ধর্মে এটি ছিল বিরাট বিষয় এবং এর ফলে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ উপস্থিতি ও তত্ত্বাবধান, নিজেদের মধ্যে একেশ্বরের জ্ঞান সংরক্ষণ অন্যান্য জাতির সাথে তাদের পার্থক্য সূচিত করেছিল, অন্যদিকে বাকি বিশ্ব ছিল মূর্তিপূজার অনুসারী। এ জাতির মাধ্যমে এবং অনুসৃত শৃঙ্খলার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এই মহান মতবাদ কার্যকরভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল এবং আজো তা অব্যাহত আছে।

ত্রিত্ববাদ যেমনটি বলে তেমনটি পৃথক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একাধিক ঈশ্বর থেকে থাকলে তা নুনতম পক্ষে মৌলিক ইয়াহূদী ধর্ম- মতবাদের লঙ্ঘন হতো এবং তা নিশ্চিতরূপে ব্যাখ্যা দাবি করত, উপরন্তু এর বিপক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হত। শাশ্বত পিতার যদি কোনো পুত্র এবং আরো একটি আত্মা থেকে থাকে (পবিত্র আত্মা) যারা প্রত্যেকে তার নিজের সমান ক্ষমতা ও মহিমা সম্পন্ন, যদিও এমন একটি অর্থ থাকা উচিৎ ছিল যে, তাদের প্রত্যেকেই প্রকৃত ঈশ্বর তবুও সঠিকভাবে বলতে গেলে মাত্র একজন মাত্র ঈশ্বর রয়েছেন। ন্যূনতম পক্ষে এমন সিদ্ধান্ত হতে পারত যে, তিন জনের প্রত্যেকেই যদি প্রকৃত ঈশ্বর হতেন তারা সকলে

মিলে তিন ঈশ্বর হতেন। তবে যেহেতু ওল্ড টেস্টামেন্টে এ ধরনের কিছু বলা হয় নি, কোনো আপত্তি উত্থাপন বা তার জবাবও দেওয়া হয় নি। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, এ ধারণাটি তখন ছিল না। সেকালের কোনো বক্তব্য বা ঘটনা থেকেও এ ধরনের সমস্যার কথা জানা যায় না।

ইয়াহূদীরা যে জ্ঞান ও উপলব্ধি দিয়ে তাদের নিজেদের পবিত্র গ্রন্থ সমূহ অবধান করত, আমরা যদি তার দ্বারা পরিচালিত হই, তাহলে যা দেখতে পাব তা হলো, খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের মতো কোনো মতবাদ সেসব গ্রন্থে নেই। প্রাচীন বা আধুনিককালের কোনো ইয়াহূদী তাদের কাছ থেকে এ ধরনের কোনো মতবাদ কখনোই গ্রহণ করে নি। ইয়াহূদীরা সব সময়ই তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোকে ঈশ্বর এক, একাধিক ঈশ্বরের উল্যেখ না করা এবং সেই অদ্বিতীয় সত্ত্বাই পৃথিবীর স্রষ্টা প্রভৃতি শিক্ষা প্রদানের জন্যই ব্যবহার করেছে এবং তাদের এসব ধর্মগ্রন্থ যাজক ও নবীদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে ঈশ্বর, স্বর্গীয় দূত (ফিরিশতা) ছাড়া তাদের পাশাপাশি অন্য কোনো সত্ত্বার কথা বলে নি।

খৃষ্টানরা কল্পনা করে যে, ত্রি-ঈশ্বরের মধ্যে মসীহের (Messiah) স্থান হলো দ্বিতীয়। কিন্তু ইয়াহূদীরা কখনোই এ ধরনের কোনো বিষয় কল্পনা করে নি। অন্যদিকে আমরা যদি এ মহান ব্যক্তির নবিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণীর বিষয়টি বিবেচনা করি, আমরা দেখতে পাব যে, তারা তাকে মানুষের বাইরে অতিরিক্ত কিছু হিসেবে প্রত্যাশা করে নি। এটা নিঃসন্দেহে সন্তোষজনক। মসীহকে “স্ত্রীলোকের সন্তান” শিরোনামের অধ্যায়ে আমাদের পূর্ব পুরুষদের কাছে ঘোষণা করা

হয়েছে বলে মনে হয়” (আদি পুস্তক ৩ : ১৩)। ঈশ্বর ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পৃথিবীতে তার বংশধরগণের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকবে (আদি পুস্তক ১২: ৩)। এ বিষয়টি (মোটেও যদি মসীহের সাথে জড়িত হয়ে থাকে) আমাদেরকে যে ধারণা দেয় তা হলো এই যে, তার কোনো সন্তান বা বংশধর মানব সমাজের জন্য এক বিরাট আশীর্বাদ বয়ে আনার কারণ হবেন। এ প্রসঙ্গে মসীহ সম্পর্কে মূসা আলাইহিস সালামের কথিত বর্ণনার কথাও উল্যেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, আমি তাদের নবী হিসেবে সৃষ্টি করব তাদের মধ্য থেকে, তোমার মত এবং তার মুখে দেব আমার বাণী এবং আমি তাকে যা নির্দেশ প্রদান করব সে তা তাদের কাছে ব্যক্ত করবে: (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ : ১৮)। এখানে ত্রিত্ববাদ অনুযায়ী দ্বিতীয় ঈশ্বরের মত কিছু নেই বা পিতার সমকক্ষ কোনো ব্যক্তির কথা বলা হয় নি- এখানে বলা হয়েছে একজন নবীর কথা যিনি ঈশ্বরের নামে কথা বলবেন এবং তাই করবেন যা করার জন্য তিনি নির্দেশিত....।

নিউ টেস্টামেন্টেও আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে ওল্ড টেস্টামেন্টের মত একই মতবাদ লক্ষ্য করি। প্রথম এবং শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বরিক নির্দেশ কী, ধর্মগুরুর এ অনুসন্ধানের জবাবে আমাদের পবিত্র আত্মা বলেন, “হে ইসরাঈলিগণ, ঈশ্বরে প্রথম নির্দেশ হলো আমাদের প্রভূ যিনি ঈশ্বর তিনি এক প্রভূ” ইত্যাদি এবং ধর্মগুরু তার জবাবে বলেন “হ্যাঁ প্রভূ! আপনি সত্য বলেছেন: কারণ ঈশ্বর একজনই আছেন এবং তিনি ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই” ইত্যাদি।

যীশু সর্বদাই তার ঈশ্বর ও পিতা হিসেবে এই এক ঈশ্বরের উপাসনাই করেছেন। তিনি বলতেন তার ধর্মমত ও শক্তি তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকেই প্রাপ্ত এবং তিনি বারংবার তার নিজের কোনো শক্তি বা ক্ষমতা থাকার কথা অস্বীকার করেছেন (যোহন ৫ : ১৯), "তখন যীশু জবাব দিলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয় আমি তোমাদের বলছি, পুত্র নিজে কিছুই করতে পারে না।" "আমি তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছি, তা আমার নিজের কথা নয়, সেগুলো হলো আমার পিতার যিনি আমার ভিতরে বাস করেন, তিনিই সবকিছু করেন" (গালাতী ১৪ : ১৯)। "আমার সহযোগীদের কাছে গমন কর এবং তাদের উদ্দেশ্যে বল, আমি আমার পিতার ও তোমাদের পিতার এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বরের অধীনস্থ" (গালাতীয় ২০ : ১৭)। কোনো ঈশ্বর এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করবেন, কোনোক্রমেই তা হতে পারে না।

শেষ দিকের ধর্মপ্রচারকগণ তাদের লেখা, কথা বার্তার একই বিশ্বাস ও ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তারা পিতাকে একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বর এবং খৃষ্টকে একজন মানুষ ও ঈশ্বরের বান্দা হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন যিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন এবং তার প্রতি আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে খৃষ্ট যেসকল শক্তির অধিকারী ছিলেন তা তিনি তাকে দিয়েছিলেন। (প্রেরিতদের কার্য ২ : ২২)। পিটার বলেছেন " হে ইসরাইলিগণ, তোমরা শোন, নাজারেথের যীশু, তিনি তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত, তিনি অলৌকিক, আশ্চর্য ক্ষমতা ও নিদর্শনসমূহের অধিকারী যা ঈশ্বর তাকে দিয়েছেন, ইত্যাদি, ঈশ্বর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন।" পলও বলেছেন, "ঈশ্বর একজনই

বিরাজমান এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একজন মধ্যস্থ ছিলেন, সেই লোকটি হলেন যিশুখ্রিষ্ট” (তীমথীয় ২ : ৫)।

ইতিহাসের ধারায় দেখা যাবে যে, সেসব সাধারণ মানুষ, যাদের ব্যবহারের জন্য নিউ টেস্টামেন্ট রচিত হয়েছিল, তারা সেগুলোর মধ্যে খৃষ্টের কোনো প্রাক- অস্তিত্ব বা ঈশ্বরত্ব দেখে নি। অথচ এখনকার বহু লোকেই দৃঢ় বিশ্বাসী যে, তারা সেগুলোর মধ্যে তা দেখেছে। তা যদি সত্যই হয়ে থাকে তাহলে ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টে যেমন সুনির্দিষ্ট এক ঈশ্বরের মতবাদ সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ত্রিত্ববাদ সেখানে সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় নি কেন? ন্যূনতমভাবে নিউ টেস্টামেন্টে তো তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যেত। কেন একত্ববাদকে এত শর্তহীনভাবে, ত্রিত্ববাদের প্রতি কোনো ছাড় ব্যতিরেকে, যাতে এ ব্যাপারে কোনো বিভ্রান্তি না ঘটতে পারে এত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? যেমনটি আজকাল গোঁড়া শিক্ষা রীতি, ধর্মমত, উপদেশ সকল ক্ষেত্রেই ত্রিত্ববাদের বিভ্রান্তিকে লালন করা হচ্ছে। ধর্মতত্ত্ববিদ গণ খুবই মামুলি কথাবার্তার ওপর অনুমান করে অদ্ভুত এবং অ-ব্যাখ্যাযোগ্য ত্রিত্ব মতবাদ সৃষ্টি করছেন যা সুস্পষ্ট, বলিষ্ঠ এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে ধর্মগ্রন্থ সমর্থিত বলে কারো কাছেই প্রমাণ করা যায় না।

বাইবেলে এমন বহু অংশ রয়েছে যেগুলোতে সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে একত্ববাদের মতবাদ ঘোষিত হয়েছে। ত্রিত্ববাদের সমর্থনে এরকম কোনো একটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত করা যাবে না। তাহলে সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতিরেকে রহস্যময় সব বিষয়ে আমরা কেন বিশ্বাস করব?

যারা বিশ্বাস করে যে, খৃষ্ট হয় ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের অধীনে পৃথিবীর স্রষ্টা তাদের বিবেচনার জন্য আরেকটি বিষয় এখানে উত্থাপিত হতে পারে। এটি হলো: আমাদের প্রভূ (যীশু) নিজের সম্পর্কে যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে কথা বলেন এবং তার যে শক্তি দিয়ে তিনি অলৌকিক কর্মকান্ড সাধন করেন, তা তার ভাষার সাথে অসংগতিপূর্ণ বলে মনে হবে যদি তা থেকে অন্য কোনো ব্যক্তির চেয়ে তার নিজের কোনো শক্তি অধিক রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

যদি খৃষ্ট পৃথিবীর স্রষ্টা হতেন তাহলে তিনি নিজের সম্পর্কে বলতেন না যে, তিনি নিজে কিছু করতে পারেন না, তিনি যা বলেন তা নিজের কথা নয় এবং তার মধ্যে যে পিতা আছে তিনিই সবকিছু করেন। কোনো সাধারণ লোক, অন্য সাধারণ লোকের মত কাজ করে যদি এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করত এবং বলত যে, সে কিছু বলে না বা করে না, তার মাধ্যমে ঈশ্বরই সবকিছু বলেন ও করেন এবং সে কোনো কিছুই বলতে বা করতে সক্ষম নয়- আমরা বলতে দ্বিধা করতাম না যে, সে হয় মিথ্যাবাদী অথবা ধর্ম অবমাননাকারী...।

যদি মনে করা হয় যে, খৃষ্ট যখন বলেছেন যে, তার পিতা তার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর তখন তিনি তার মানব সত্ত্বার কথা ব্যক্ত করেছেন, অথচ একই সাথে তার ঐশ্বরিক সত্ত্বা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের সমকক্ষ ছিল, তাহলে তা হবে ভাষার অপব্যবহার। মথি, মার্ক বা লূকের গসপেলে ঐশ্বরিকত্ব, এমনকি অতি দৈবিক সত্ত্বা বলে আখ্যায়িত করা যায়, এমন কিছু যীশুর প্রতি আরোপিত হয় নি। জনের গসপেলের ভূমিকায় এ ধরনের

কিছু আভাস আছে বলে স্বীকার করে নিলেও একথা বিশেষভাবে উলেখ্য যে, সেখানে এমন বহু অংশ আছে যাতে চূড়ান্তভাবে যীশুকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

এখন এ খৃষ্টানরা উপলব্ধি করতে পারে না যে, যাদের জন্য গসপেলসমূহ রচিত হয়েছিল সেই ইয়াহূদী অথবা অ-ইয়াহুদীদের এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে তথ্যের প্রয়োজন ছিল না যা এ উভয় শ্রেণির লোকদের ধারণার বাইরে ছিল বরং যা একই সময়ে ক্রুশের সমালোচনাকে কার্যকরভাবে আবৃত করেছিল, যা ছিল সে যুগের খৃষ্টানদের অব্যাহত দুর্দশার কারণ। খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব অথবা তার পূর্ব অস্তিত্বের মতবাদ যদি সত্য হয় তাহলে তা যে অতি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ও আগ্রহোদ্দীপক বিষয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যেহেতু এ খৃষ্টানরা সেগুলো সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোনো বিবরণ দিতে পারে না এবং তাদের গুরুত্ব সম্পর্কেও কিছু বলে না, সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায় এগুলো তাদের অজ্ঞাত ছিল।

আরেকটি প্রশ্নও তাদেরকে অবশ্যই করা যেতে পারে। তা হলো, ধর্মপ্রচারকারীরা যখন যীশুকে ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের অধীন পৃথিবীর স্রষ্টাকে এক অতি- দৈবিক শক্তি হিসেবে আবিষ্কার করলেন, তারপরও তারা কিভাবে তাদের প্রেরিতদের কার্যাবলী (Book of Acts) গ্রন্থে এবং পত্রাবলিতে সব সময়ই যীশুকে একজন মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করলেন? উক্ত ধারণার পর এটা ছিল অমর্যাদাকর, অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক, মানুষের রূপে তার উপস্থিতি একেবারেই বেমানান।...

আসুন, আমরা প্রেরিতদের ও যীশুর শিষ্যদের স্থানে নিজেদের স্থাপন করি। তারা নিশ্চিতভাবে যীশুকে তাদের মতই একজন মানুষ হিসেবে ভেবেছিলেন বলেই তার সাথে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলেছিলেন। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। এরপর, তিনি মানুষ নন, বরং প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর, অথবা পৃথিবীর স্রষ্টা বলে জানতে পারলে তাদের বিস্ময় তেমনটিই হত যেমনটি আমাদের হবে যদি আমরা আবিষ্কার করি যে, আমাদের চেনা-জানা কোনো একজন মানুষ বাস্তবে ঈশ্বর অথবা পৃথিবীর স্রষ্টা। এখানে আমাদের বিবেচনা করতে হবে যে, আমাদের কেমন অনুভূতি হত এবং আমরা এ ধরনের একজন ব্যক্তির সাথে কেমন ব্যবহার করতাম এবং তার সাথে কীভাবে কথা বলতাম। আমি আস্থাশীল যে কেউ যদি উপলব্ধি করতে পারে যে, এই লোকটি ঈশ্বর অথবা একজন স্বর্গীয় দূত, সে কখনোই ঐ ব্যক্তিকে আর মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করবে না। সে এরপর থেকে তার পদ ও মর্যাদার উপযোগী পন্থায় তার সাথে কথা বলবে।

ধারা যাক, আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো দু'ব্যক্তি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর স্বর্গীয় দূত মাইকেল ও গ্যাব্রিয়েল (ফেরেশতা মিকাইল ও জিবরীল) বলে প্রমাণিত হলেন। এরপরও কি আমরা তাদের মানুষ বলেই আখ্যায়িত করব? অবশ্যই না। আমরা তখন স্বাভাবিকভাবেই বন্ধুদের বলব, "ঐ দুই ব্যক্তি যাদের আমরা মানুষ বলে জানতাম, তারা মানুষ নন, ছদ্মবেশে স্বর্গীয় দূত।" এ কথাটি হবে স্বাভাবিক। যিশুখ্রিষ্ট যদি পৃথিবীতে আসার পূর্বে মানুষের চাইতে বেশি কিছু হতেন, বিশেষ করে তিনি যদি ঈশ্বর বা পৃথিবীর স্রষ্টা হয়ে থাকতেন, তিনি কখনোই

পৃথিবীতে থাকাকালে একজন মানুষ হিসেবে কখনোই গণ্য হতেন না, কেননা তিনি তার শ্রেষ্ঠত্ব ও আসল বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করতে পারতেন না। তিনি যদি ছদ্মবেশেও থাকতেন তাহলে প্রকৃতপক্ষে তিনি পূর্বে যা ছিলেন তাই থাকতেন এবং যারা তাকে প্রকৃতপক্ষে চিনত, তাদের কাছে সেভাবেই তিনি আখ্যায়িত হতেন।

যীশুখৃষ্টকে তখন কোনোক্রমেই ন্যায়নিষ্ঠ, যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না, যদিও তার বাহ্যিক উপস্থিতি মানুষকে অভিভূক্ত করত এবং তারা তাকে এ নামে ডাকত না।

নিউ টেস্টামেন্টের বাগ-বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রতিটি লোকের মনে যে, কথাটা নাড়া দিবে তা হলো 'খৃষ্ট' ও 'ঈশ্বর' নামক দু'টি আখ্যা যা পরস্পর বিরোধী হিসেবে আগাগোড়াই ব্যবহার হয়েছে 'ঈশ্বর' ও 'মানুষ' শব্দ দ্বয়ের মত। আমরা যদি শব্দের সাধারণ ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করি, আমরা সন্তোষের সাথে দেখতে পাব যে, এমনটি কখনই ঘটত না যদি প্রথমটি পরেরটির গুণ নির্দেশক হতো, অর্থাৎ যদি খৃষ্ট ঈশ্বর হতেন।

আমরা বলি, "রাজপুত্র এবং রাজা", কারণ রাজপুত্র রাজা নন। যদি তিনি রাজা হতেন, তাহলে আমদেরকে অন্য কোনো পার্থক্যসূচক শব্দ যেমন "বৃহৎ ও ক্ষুদ্র" 'ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন' 'পিতা ও পুত্র' ইত্যাদি ব্যবহার করতে হতে। যখন ধর্মপ্রচারক পল বলেন যে, করিনথের চার্চ খৃষ্টের এবং খৃষ্ট ঈশ্বরের একজন, (নিউ টেস্টামেন্টে বারংবার এরকম উল্লেখ আছে) তখন প্রতীয়মান হয় যে, অর্থপূর্ণভাবে খৃষ্টের ঈশ্বর হওয়া

সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। অনুরূপভাবে ক্লিমেন্স রোমানাস কর্তৃক খৃষ্টকে "ঐশ্বরিক মহিমার রাজদণ্ড" হিসেবে আখ্যায়িত করা থেকে পর্যাপ্ত প্রমাণ মিলে যে, তার মতে রাজদণ্ড হলো এক জিনিস এবং ঈশ্বর অন্য জিনিস। আমার বক্তব্য এই যে, কথাটি যখন প্রথম বলা হয়েছিল তখন তার অর্থ এ রকমই ছিল।

বাইবেলগুলোর সামগ্রিক মর্ম এবং কতিপয় বিবেচনা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সেগুলো ত্রিত্ববাদের অথবা খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব অথবা প্রাক অস্তিত্বের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। উপরন্তু আরেকটি বিবেচনার দিকে লক্ষ্য করা যায় যেদিকে কারোরই দৃষ্টি খুব একটা পড়ে নি যা এসকল মতবাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং তা তাদের ধর্মগ্রন্থের মতবাদেরও বিরুদ্ধে। সেটি হলো যীশু মসীহ হলেও সে বিষয়টি ধর্মপ্রচারক ও ইয়াহূদীদের কাছে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রকাশ করা হয়েছিল। আমদের প্রভূ দীর্ঘ সময় যাবৎ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছুই বলেন নি, বরং ইয়াহূদীদের মত তার শিষ্যদেরও তাঁকে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাদের ওপর ছেড়ে দেন। তিনি শুধু তার কাছে ব্যাপ্টিস্ট যোহন এর প্রেরিত দূতদেরকেই ব্যাপারটি জানিয়ে ছিলেন।

যীশু নিজেকে মসীহ বলে ঘোষণার পর যদি সর্বোচ্চ পুরোহিত তার পোশাক ছিঁড়ে ফেলার মাধ্যমে আতঙ্ক প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে তিনি যদি অন্য কোনো উচ্চতর রকম দাবি করতেন, তা শোনা বা সন্দেহ করার পর ঐ পুরোহিত কি করতেন? যদি তিনি সে রকম কিছু দাবি করতেন তবে নিশ্চয় তা প্রকাশ পেত। যখন সাধারণ মানুষ তার

অলৌকিক কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করল, তারা বিস্মিত হয়েছিল এই ভেবে যে, ঈশ্বর একজন মানুষকে এ ধরনের ক্ষমতা দান করতে পারেন! জনগণ যখন তা দেখল তারা বিস্মিত ও চমৎকৃত হলো এবং ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করল যিনি মানুষকে এ ধরনের ক্ষমতা দিয়েছেন (মথি ৯: ৮)। হেরোদ যে সময় তার কথা শুনলেন, কেউ কেউ ধারণা করল তিনি ইলিয়াস আলাইহিস সালাম কেউ কেউ বলল তিনি নবী এবং কেউ কেউ বলল তিনি পুনর্জীবন লাভকারী যোহন। কিন্তু কেউই তাঁকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের অধীন পৃথিবীর স্রষ্টা হিসেবেভাবেনি। একটি লোকও একথা বলে না যে যীশু তার নিজের শক্তিতে এরকম অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করছেন। প্রেরিতগণ যদি প্রকৃতপক্ষে যীশুর ঈশ্বরত্বের মতবাদই প্রচার করতেন এবং ধর্মান্তরিত ইয়াহূদীরা যদি সামগ্রিকভাবে তা গ্রহণ করত তাহলে অবিশ্বাসী ইয়াহূদীদের মধ্যে তা অবশ্যই সুবিদিত থাকত এবং সে সময় যারা পূর্বাপর একত্ববাদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিল তারা কি একাধিক ঈশ্বরের ধর্মমত প্রচারের জন্য খৃষ্টানদের কাছে আপত্তি উত্থাপন করত না? এখন পর্যন্ত প্রেরিতদের কার্যাবলী গ্রন্থ কিংবা নিউ টেস্টামেন্টের কোনোখানেই এ ধরনের কোনো কিছুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। দুই অথবা তিনজন ঈশ্বর সম্পর্কিত অভিযোগের জবাব দান কতিপয় প্রাচীন খৃষ্টান পাদ্রীর রচনার উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল। তারপরও কেন আমরা প্রেরিতদের সময়ে এ ধরনের কিছু খুঁজে পাই না? এর জবাব একটাই- আর তা হলো এই যে, তখন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি এবং খৃষ্টের ঈশ্বরত্বের মতবাদও উত্থাপিতই হয় নি। মন্দির ও আইনের বিরুদ্ধে কথা

বলা ছাড়া স্টিফেনের বিরুদ্ধে আর কি অভিযোগ ছিল (প্রেরিতদের কার্য ৬ : ১৩)? আমরা যদি পলের সকল সফরেই তার সঙ্গী হই এবং ইয়াহূদীদের উপাসনালয়ে (Synagogue) ইয়াহূদীদের সাথে তার আলোচনাসমূহে যোগ দেই, তাদের অবিরাম ও প্রচণ্ড নির্যাতনের বিষয় লক্ষ করি, তাহলে দেখতে পাব যে, তিনি যীশুর নয়া ঈশ্বরত্বের প্রচার করেছেন বলে ইয়াহূদীরা কোনো সন্দেহ প্রকাশ করছে না। যদি যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রচার করা হতো তাহলে ইয়াহূদীরা তাদের চিরাচরিত নিয়মে এক নয়া ঈশ্বরের প্রচার হচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করত।

প্রেরিতগণ কখনোই যীশুর ঈশ্বরত্ব বা পূর্ব অস্তিত্বের মতো কোনো মতবাদের ব্যাপারে কি কখনো নির্দেশিত হয়েছিলেন? যদি তাই হত তাহলে তার সাথে তাদের সংযোগ স্থাপনের সময়কালটি আমাদের কাছে ধরা পড়ত যেহেতু সেটি ছিল তখনও সম্পূর্ণ নতুন ও অস্বাভাবিক এক মতবাদ। যদি এ বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে তারা দৃঢ়ভাবে সন্দেহমুক্ত না থাকতেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তারা বিস্ময় প্রকাশ করতেন। তারা যদি অবিচল বিশ্বাসে তা অন্যদের শিক্ষা দিতেন তবে তারা তাদের তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করত না। কিছু বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে তাদের তর্ক-বিতর্ক করা কিংবা কতকগুলো বিষয়ে আপত্তির জবাব দিতে হতো। কিন্তু তাদের সমগ্র ইতিহাসে এবং তাদের বিশাল রচনার ভান্ডারে তাদের নিজেদের বিস্ময় বা সন্দেহ কিংবা অন্যদের সন্দেহ বা আপত্তির কোনো প্রমাণ মিলে না।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, উপাসনার যথাযথ লক্ষ্যবস্তু হচ্ছেন পিতা ঈশ্বর, ত্রিত্ববাদে যাকে ঈশ্বরদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি বলা হয়। কার্যত ধর্মগ্রন্থগুলোতে এরকম কোনো অনুমোদিত বিধান পাওয়া যায় না যা আমাদের অন্য কোনো ঈশ্বর বা তদানুরূপ কাউকে সম্বোধন করতে বলে। এ বিষয়ে স্বপ্নে যীশুকে দেখার পর তার উদ্দেশ্যে ষ্টিফেনের কথিত সংক্ষিপ্ত ভাষনের উল্যেখ গুরুত্বহীন। যীশু সব সময়ই তার পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন, আর তা তিনি করতেন এত বিনীত ও আত্ম সমর্পিতভাবে যা একজন অতি নির্ভরশীল ব্যক্তির পক্ষেই শুধু করা সম্ভব। তিনি ঈশ্বরকে সর্বদাই তার পিতা বলে অথবা তার জীবনের প্রভূ বলে সম্বোধন করতেন এবং তিনি তার শিষ্যদেরও একই সত্ত্বার প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন, আমাদের তারই উপাসনা করা উচিৎ।

তদনুযায়ী শুধুমাত্র পিতার প্রার্থনা করা ছিল চার্চের সুদীর্ঘকালের নিয়ম ও ঐতিহ্য। লিটানিতে (Litany) যেমনটি রয়েছে, “প্রভু আমাদের করুণা কর”, “খৃষ্ট আমাদের করুণা কর”- এ ধরনের সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা তুলনামূলকভাবে অনেক পরে প্রবর্তন করা হয়। ক্লিমেন্টীয় প্রার্থনা যা সবচেয়ে প্রাচীন প্রার্থনা হিসেবে আজও বিদ্যমান এবং গীর্জা সংক্রান্ত সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত, এটি রচিত হয়েছিল চতুর্থ শতাব্দীতে এবং সেখানে এ ধরনের কোনো বিষয় নেই। অরিজেন প্রার্থনা বিষয়ক এক বিশাল গ্রন্থে অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে শুধু পিতাকে উপাসনার আহ্বান জানিয়েছেন, খৃষ্টকে নয়; এবং যেহেতু জনসাধারণের এ ধরনের প্রার্থনার ক্ষেত্রে নিন্দার বা দোষের কিছু আছে এমন কথা তিনি বলেননি,

স্বাভাবিকভাবেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, খৃষ্টের কাছে পূর্বোক্ত ধরনের কাতর অনুনয় বিনয় করা খৃষ্টানদের গণ প্রার্থনা সভার কাছে অজ্ঞাত ছিল।

এখানে প্রেরিতদের ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। হেরোদ যখন জেমসকে হত্যা করলেন (যনি ছিলেন জনের ভাই) এবং পিটারকে বন্দী করলেন, আমরা পাঠ করি যে, চার্চে অবিরাম "ঈশ্বরের উদ্দেশ্য" প্রার্থনা করা হয়েছিল; খৃষ্টের উদ্দেশ্যে নয়, "তাঁর জন্য" (প্রেরিতদের কার্য ১২ : ৫)। পল ও সাইলাস যখন ফিলিপির কারাগারে বন্দী ছিলেন, আমরা পাঠ করি যে, তখন তারা "ঈশ্বরের গুণগান ও প্রশংসা করেছিলেন" (প্রেরিতদের কার্য ১৬: ২৫) যীশুর নয়; এবং যখন পলকে জেরুজালেম গমন করলে তার পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হলো, তখন তিনি বলেছিলেন "ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন তাই হবে (প্রেরিতদের কার্য ২১ : ১৪)। এ থেকে অবশ্যই মনে করা যায় যে, তারা পিতা ঈশ্বরকেই বুঝিয়েছেন, কারণ যীশু নিজেও এ ক্ষেত্রে একই ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। যেমন ঈশ্বরের উপাসনাকালে তিনি বলতেন: আমার ইচ্ছায় নয়, আপনার ইচ্ছাই পূরণ হোক...।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ধর্মগ্রন্থসমূহে ত্রিত্ববাদের মত কোনো মতবাদ নেই। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনো যুক্তিবাদী ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের পক্ষে এ ত্রিত্ববাদ গ্রহণ বা ধারণ করা অসম্ভব। কেননা এর স্ববিরোধিতা এটাকে অর্থহীন করে দিয়েছে।

এথানাসিয়াসের ত্রি-ঈশ্বর বিষয়ক মতবাদে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, পিতা-পুত্র বা আত্মার কারোরই কোনো কিছুর অভাব নেই। কেননা তাদের মধ্যে প্রত্যেকে প্রকৃত ও যথাযথ ঈশ্বর, প্রত্যেকেই অবিনশ্বরতার দিক দিয়ে সমান এবং প্রত্যেকেই ঐশ্বরিকতায় পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা তিনজন তিন ঈশ্বর নন, শুধু এক ঈশ্বর। ফলে তারা প্রত্যেকে পূর্ণাঙ্গ ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও এক এবং বহু উভয়ই। এটি নিঃসন্দেহে এক স্ববিরোধী বিষয়- যেমন একথা বলা যে, পিটার, জেমন ও জন এদের প্রত্যেকেরই এক একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই আছে, তবে তারা সম্মিলিতভাবে তিন ব্যক্তি নয়- একজন মাত্র। "ঈশ্বর" অথবা "মানুষ" শব্দ দ্বয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ধারণা সমূহ এ দু'টি প্রস্তাবের প্রকৃতিতে কোনো পার্থক্য সূচিত করতে পারে না। নিসিয়ার কাউন্সিলের পর এই বিশেষ রীতিতেই ত্রিত্ববাদের মতবাদকে ব্যাখ্যা করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। সে যুগের যাজক ও পাদ্রীগণ বিশেষভাবে তিন "ব্যক্তির" পূর্ণাঙ্গ সমকক্ষতা রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। আর তা করতে গিয়ে তারা একত্বের বিষয়টি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। যা হোক, এ মতবাদ কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, সেটি কোনো ব্যাপার না হলেও এগুলোর একটিকে সর্বদাই অন্যটির জন্য বলি দিতে হয়। যেহেতু "ব্যক্তি" (Person) ও "সত্ত্বা" (being) শব্দের ব্যবহার নিয়ে মানুষ বিভ্রান্তির শিকার, সে কারণে তা সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। "সত্তা" আখ্যাটি প্রত্যেকটি বিষয়ের এবং তারপর ত্রি-ঈশ্বরের তিন ব্যক্তির প্রত্যেকের গুণবাচক আখ্যা হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যদি বলা হয় খৃষ্টই ঈশ্বর। কিন্তু এখানে কোনো

সত্ত্বা নেই, বৈশিষ্ট্য নেই যা দিয়ে তার গুণ প্রকাশ পায়। তাহলে এটাকে এক অর্থহীন বিষয় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কিন্তু যখন বলা হয় যে, এসব ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই স্বয়ং ঈশ্বর, এর অর্থ অবশ্যই এই হবে যে, পিতা পৃথকভাবে একটি সত্ত্বা, পুত্র পৃথকভাবে একটি সত্ত্বা এবং তদানুরূপ পবিত্র আত্মারও স্বতন্ত্রভাবে একটি সত্ত্বা রয়েছে। এখানে তিনটি সত্ত্বার তিনজনই ব্যক্তি। সে ক্ষেত্রে এই তিনজন ঈশ্বর ছাড়া আর কি হতে পারেন যদি না অনুমান করা যায় যে, তিনজন সমন্বিত ব্যক্তি অথবা তিনজন পিতা, তিনজন পুত্র অথবা তিনজন পবিত্র আত্মা আছেন?

পিতার যদি জন্মদানের রহস্যময় বিচিত্র ক্ষমতা থাকে, তবে এখনও তা সক্রিয় নয় কেন? তিনি যদি অপরিবর্তনীয় নাই হবেন তাহলে শুরুতে যা ছিল এখন তা নেই কেন? তার পূর্ণাঙ্গতা কি একই আছে এবং তার পরিকল্পনা করার ক্ষমতাও কি একরই রকম রয়েছে? তাই যদি হয় তাহলে আরো সন্তান তিনি উৎপাদন করেন নি কেন? গোঁড়া যাজকরা যেমনটি জিজ্ঞাসা করে সে রকম তিনি কি সন্তান জন্মদানে অক্ষম হয়ে পড়েছেন? অথবা তিনি তার জন্মদানের ক্ষমতা কাজে লাগাবেন কিনা সেই ইচ্ছা ও মর্জির ওপরই কি তা নির্ভরশীল? তিনি তার দ্বারা ভিন্নভাবে সৃষ্ট অন্য কোনো রূপ বা আকৃতি সম্পন্ন অন্য কোনো কিছুর মতই? এবং তিনি তারই মত একই উপাদানে গঠিত হবেন কি না?

এ প্রশ্নও অবশ্যই করতে হবে যে, ত্রি-ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তি কোনো পন্থায় উৎপন্ন হয়েছেন। তাকে প্রথম দু'ব্যক্তির স্ব স্ব পূর্ণাঙ্গতার অভিপ্রায়

থেকে যৌথ ক্ষমতার মাধ্যমে হয়েছে? যদি তাই হয়, তাহলে একই কার্যক্রমে কেন চতুর্থ বা পরে আরো উৎপন্ন করা হলো না?

যা হোক, ত্রিত্ববাদের এই অদ্ভুত জন্মদানের কথা স্বীকার করে নিলে পুত্রের ব্যক্তিক অস্তিত্ব তার পিতার মেধা থেকেই উৎসারিত বলে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, আর তা পুত্রের তুলনায় নিশ্চিতভাবে পিতার অগ্রাধিকার অথবা শ্রেষ্ঠত্বের কথাই তুলে ধরে। আর কোনো সত্ত্বাই যথাযথ ঈশ্বর হতে পারে না যদি তার চেয়ে ঊর্ধ্বতন বা শ্রেষ্ঠ কেউ থাকে, সংক্ষেপে এই পরিকল্পনা কার্যকরভাবে যথাযথ সমকক্ষতার এবং পাশাপাশি ত্রিত্ববাদে তিন ব্যক্তির একত্বের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে।

ত্রিত্ববাদের ব্যাপারে প্রধান আপত্তি এই যে, এটি হলো ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের প্রধান উদ্দেশ্য উপাসনার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। এই একত্ববাদের সংস্কার করা অথবা অন্যরূপে তার অনুসরণ সন্দেহের বিষয় বলেই বিবেচিত বা গণ্য হবে। আর তা এ কারণে যে, এ মতবাদ বহু ঈশ্বর তথা পৌত্তলিক উপাসনার প্রবর্তন করে।[৬০]

ইংল্যান্ডের একত্ববাদী আন্দোলনের গভীর প্রভাব আমেরিকাতেও পড়েছিল। ক্যালভিনপন্থী একটি গোষ্ঠীর মাধ্যমে এর সূচনা হয়েছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে ধর্মীয় আশ্রমে পরিণত হয় এবং এ পর্যায়ে ধর্মমতের ওপর তত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত না। এভাবে ধীরে ধীরে ধর্মীয় পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত হয়। চার্লস চনসী (Charles Chauncy, ১৭০৫-১৭৫৭ খৃ.) ছিলেন বোস্টনের

অধিবাসী। তিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনের এক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেন। জেমস ফ্রিম্যানের (১৭৫৯-১৮৩৫ খৃ.) নেতৃত্বে কিংস চ্যাপালের ধর্মীয় সমাবেশ ত্রিত্ববাদ বিষয়ক তাদের অ্যাংগলিকান গির্জার সকল রীতি- নীতি বিলোপ করে। ১৭৮৫ খৃস্টাব্দে এ ঘটনা ঘটে। এভাবে আমেরিকায় প্রথম একত্ববাদী চার্চের অস্তিত্ব ঘোষিত হয়। প্রিস্টলির মতবাদ প্রকাশ্যে মুদ্রিত ও বিতরিত হতে থাকে। অধিকাংশ লোকই তা গ্রহণ করে। এর ফল হিসেবে বোস্টনে একজন ছাড়া সকল যাজক নেতৃবৃন্দ কর্তৃক একত্ববাদ গৃহীত হয়।

**উইলিয়াম এলরি চ্যানিং (W. Ellery Channing, ১৭৮০-১৮৮২ খৃ.)**

ইউলিয়াম এলারি চ্যানিং ১৭৮০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বছর বয়সে তিনি বোস্টনে আগমন করেন এবং যাজকের দায়িত্ব পালন শুরু করেন। তিনি একত্ববাদী চিন্তা দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। চ্যানিং কখনোই ত্রিত্ববাদ গ্রহণ করেন নি, তবে সে সময় তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা নিরাপদ ছিল না। তাকে অন্যান্য একত্ববাদী যাজকদের সাথে মিলে গোপনে ত্রিত্ববাদ বিরোধী মতবাদ প্রচারের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। চ্যানিং জবাবে বলেন যে, ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের মতামত তারা গোপন রাখেননি, তবে তারা সে মতবাদ এমনভাবে প্রচার করেছেন যেন আগে কারো তা জানা ছিল না। চ্যানিং আরো বলেন, তারা এ পন্থা গ্রহণ করেছেন এ কারণে যাতে খৃষ্টানরা পরস্পরের বিরুদ্ধে আরো বিভক্ত না হয়ে পড়ে। সে কারণে এ পর্যায়ে একত্ববাদী আন্দোলন প্রকাশ্য রূপ গ্রহণ করতে পারে নি।

১৮১৯ খৃস্টাব্দে চ্যানিং রেভারেন্ড জ্যারেড স্পার্কসের (Jared Sparks) দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি তার অননুকরণীয় রীতিতে একত্ববাদী ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, নিউটেস্টামেন্টের ভিত্তি হলো ওল্ড টেস্টামেন্ট। খৃষ্টানদের জন্য যে শিক্ষা প্রচার করা হয়েছে, তাই ইয়াহূদীদের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল। এটি ছিল ঈশ্বরের সুদূর প্রসারী বিশাল পরিকল্পনার পূর্ণতা যা উপলব্ধি করার জন্য বিপুল প্রজ্ঞা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, একথা মনে রেখে তিনি এ বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে, পবিত্র গ্রন্থের এক অংশে ঈশ্বর যে শিক্ষা প্রদান করেন তা অন্য অংশের সাথে বিরোধিতাপূর্ণ হতে পারে না। ঈশ্বর তার গভীর বিবেচনার পর এমন সব ব্যাখ্যার প্রতি আমরা অবিশ্বাস ব্যক্ত করি, যা প্রতিষ্ঠিত সত্যের পরিপন্থী। চ্যানিং জোর দিয়ে বলেন, মানুষের উচিৎ তার যুক্তি ব্যবহার করা। তিনি বলেন, "ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েছেন এবং এর জন্য আমাদের জবাবদিহী করতে হবে। আমরা যদি একে ব্যবহার না করে নিষ্ক্রিয় রাখি, যে ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে আনা হবে। আমরা বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী বলেই আমাদের উদ্দেশ্যে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করা হয়েছে। আমরা আলস্যে নিমজ্জিত হয়ে আশা করতে পারি যে, ঈশ্বর আমাদের এমন ব্যবস্থা দিয়েছেন যেখানে তুলনা করা, সীমাবদ্ধ করা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা হবে আমাদের বর্তমান অস্তিত্বের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের চাইতে পৃথক কিছু। প্রত্যাদেশ যেভাবে আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে তাকে সেভাবেই গ্রহণ করা এবং যার ওপর তার বিশ্বাস ও ভিত্তি নির্ভর করে সেই মনের

সাহায্যে তার ব্যাখ্যা করা প্রজ্ঞার কাজ।” তিনি আরো বলেন, “ঈশ্বর যদি অপরিসীম জ্ঞানী হন তাহলে তিনি তার সৃষ্টির জ্ঞান নিয়ে কৌতুক করতে পারেন না। একজন জ্ঞানী শিক্ষক তার ছাত্রগণ কর্তৃক তাকে গ্রহণের ক্ষমতার মধ্যেই তার সার্থকতা দেখতে পান, তাদের বোধের অগম্য কিছু শিক্ষা দিয়ে হতবিহবল করে কিংবা পরস্পর বিরোধী বিতর্কের মধ্যে তাদের অসহায়ভাবে নিক্ষেপ করে নয়। বুদ্ধির অগম্য বাগ শৈলীর দ্বারা আমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত কিছু বোঝানোর চেষ্টা করা এবং বিতর্কের মধ্য দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও কোনো সমাধান না করা প্রজ্ঞার পরিচায়ক নয়। একটি প্রত্যাদেশ একটি ঐশ্বরিক উপহার। তা আমাদের অজ্ঞানতাকে বৃদ্ধি এবং জটিলতাকে বহুমুখী করে না।”

এই নীতি অনুসরণ করে চ্যানিং বলেন,

“প্রথমেই আমরা বিশ্বাস করি এক ঈশ্বরে অর্থাৎ ঈশ্বর একজনই এবং শুধুমাত্র এক। এই সত্যের প্রতি আমরা অশেষ গুরুত্ব প্রদান করি এবং কোনো ব্যক্তি যাতে ব্যর্থ দর্শনের মাধ্যমে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে সে জন্য এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে আমরা দায়বদ্ধ। ঈশ্বর এক প্রচারিত সত্যটি আমাদের কাছে অত্যন্ত সরল বলে মনে হয়। এর দ্বারা আমরা বুঝি যে, একজন মাত্র সত্ত্বাই রয়েছেন। এক সত্ত্বা, এক মন, এক ব্যক্তি, এক বুদ্ধিমান ঘটয়িতা এবং অদ্বিতীয় সেই একজনই যিনি অনুদ্ভূত, চিরন্তন, সম্পূর্ণ নিখুঁত এবং প্রভূত্বের অধিকারী। আমরা জানি যে এই মহা সত্যের যারা ভবিষ্যতের জন্য আমানতকারী ছিল এবং যারা সত্ত্বা ও ব্যক্তির মধ্যকার চুলচেরা পার্থক্য বুঝতে একেবারেই

অক্ষম ছিল, সেই সরল ও অননুশীলিত লোকদের কাছে এই সব শব্দ অন্য কোনো অর্থ বহন করত না। এসব বিচারবুদ্ধি মূলত আরো পরবর্তী কালের আবিষ্কার। আমরা এ ধরনের কোনো আভাস পাই না যে ঈশ্বরের একত্ব অন্যান্য বুদ্ধিমান সত্ত্বার একত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক কোনো বিষয় ছিল।

আমরা ত্রিত্ববাদের বিরোধী এ কারণে যে, তা শাব্দিকভাবে ঈশ্বরের একত্বের কথা বললেও কার্যত তার বিপরীত। এই মতবাদ অনুযায়ী তিনজন অবিনশ্বর ও সমকক্ষ ব্যক্তি রয়েছেন যারা সর্বোচ্চ ঈশ্বরত্বের অধিকারী, তাদের বলা হয় পিতা-পুত্র ও পবিত্র আত্মা। ধর্মতাত্ত্বিকগণ যেমনটি বর্ণনা করেছেন, এই সব ব্যক্তির প্রত্যেকেরই নিজস্ব চেতনাবোধ, ইচ্ছা (মন) ও উপলব্ধি রয়েছে তারা পরস্পরকে ভালোবাসেন, পরস্পর কথাবার্তা বলেন এবং একে অন্যের সহচর্যে উৎফুল্ল হন। তারা মানুষের প্রায়শ্চিত্তের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করেন, প্রত্যেকেরই রয়েছে যথাযথ কর্মস্থল এবং প্রত্যেকেই যার যার নিজের কাজ করেন, একজন অন্যজনের কাজ করেন না। পুত্র মধ্যস্থতাকারী, তিনি পিতা নন। পিতা পুত্রকে প্রেরণ করেন, নিজে প্রেরিত হন না। তিনি পুত্রের মত দেহ সচেতন নন। সুতরাং এখানে আমরা তিন ধরনের বুদ্ধিমান ঘটয়িতাকে পাচ্ছি যারা ভিন্ন চেতনাবোধ সম্পন্ন, ভিন্ন ইচ্ছার অধিকারী ও ভিন্ন উপলব্ধি সম্পন্ন; তারা ভিন্ন কাজ করেন এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখেন। এসব বিষয় যদি তিনটি ‘মন’ বা ‘সত্তা’ গঠন না করে, তাহলে আমরা সত্যই জানি না যে, তিনটি মন বা সত্ত্বা কীভাবে গঠিত হয়। এটি হলো বৈশিষ্ট্যের

পার্থক্য, কর্মকান্ডের পার্থক্য, চেতনাবোধের পার্থক্য যা আমাদের বিভিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন সত্ত্বার ব্যাপারে বিশ্বাসী করে এবং যদি এসব লক্ষণ সত্য না হয় তাহলে সমগ্র জ্ঞানেরই পতন ঘটে, কারণ আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই যে, বিশ্বজগতের সকল ঘটয়িতা ও ব্যক্তি এক নন বা অভিন্ন মনের নন। আমরা যখন তিন ঈশ্বরের কথা কল্পনা করার চেষ্টা করি, আমরা আমাদের তিনজন ঘটয়িতার প্রতিনিধিত্ব করার কথা ছাড়া বেশি কিছু ভাবতে পারি না যারা একই প্রকার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক যেগুলো ত্রিত্ববাদের ব্যক্তিদেরও পৃথক করে রাখে। যখন সাধারণ খৃষ্টানরা এ ব্যক্তিদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে, একে অপরকে ভালোবাসতে ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব পালন করার কথা শোনে, তখন তারা কীভাবে তাদের পৃথক সত্ত্বা, পৃথক মন সম্পন্ন নন বলে মনে করতে পারে?

আমরা আমাদের সহযোগী ভাইদের নিন্দা না করেও মনে-প্রাণে এই অযৌক্তিক ও ধর্মগ্রন্থ বহির্ভূত ত্রিত্ববাদের প্রতিবাদ করি। ধর্মপ্রচারক ও আদি খৃষ্টানদের মত “আমাদের কাছেও ঈশ্বর অদ্বিতীয়, এমনকি পিতাও।” যীশুর মত আমরাও পিতার উপাসনা করি, আর তা একমাত্র জীবন্ত ও প্রকৃত ঈশ্বর হিসেবেই। আমরা আশ্চর্য হই, যেকোনো লোক নিউ টেস্টামেন্ট পাঠ করতে পারে এবং এই বিশ্বাস পরিহার করতে পারে যে, পিতাই একমাত্র ঈশ্বর। আমরা শুনি যে, আমাদের পবিত্র আত্মা অব্যাহতভাবে এভাবে যীশুর সাথে পার্থক্যমণ্ডিত হয়েছেন যে, “ঈশ্বর তার পুত্রকে প্রেরণ করেছেন”, “ঈশ্বর যীশুকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।” এখন এই আখ্যা যদি যীশুর জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য হয়ে

থাকে এবং এ গ্রন্থের একটি প্রধান উদ্দেশ্য যদি তাকে ঈশ্বর হিসেবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে, সর্বোচ্চ ঈশ্বর পিতার সমকক্ষ হিসেবে, তাহলে গোটা নিউ টেস্টামেন্ট ভর্তি বাগ শৈলী কতই না অদ্ভুত ও অব্যাখ্যেয় হয়ে পড়বে। আমরা আমাদের বিরোধীদের নিউ টেস্টামেন্ট থেকে এমন একটি অংশ উদ্ধৃত করার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি যেখানে ঈশ্বর বলতে তিন ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে, যেখানে তা এক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং যেখানে সাধারণ সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিতে অর্থের ব্যতিক্রম ছাড়া এর অর্থ পিতা ব্যক্ত করা হয় নি। তিন ব্যক্তি সংবলিত ঈশ্বরের মতবাদ যে খৃষ্টানদের মৌলিক মতবাদ নয়, এ ব্যাপারে তাদের কাছে বলিষ্ঠ প্রমাণ আছে কি?

এই মতবাদ যদি ব্যাপক স্পষ্টতা, বিপুল সতর্কতা ও সম্ভাব্য সকল ধরনের নির্ভূলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হতো। কিন্তু এরকম বক্তব্য কোথায়? ঈশ্বর সংক্রান্ত ধর্মগ্রন্থের বহু অংশ থেকে আমরা একটি মাত্র অংশ দেখতে চাই যাতে আমাদের বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর তিনটি সত্ত্বা অথবা তিনি তিন ব্যক্তি অথবা তিনি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এর বিপরীতে নিউ টেস্টামেন্টে আমরা যেখানে কমপক্ষে এ বৈশিষ্ট্যের বহুবার উল্লেখ আশা করি, সেখানে ঈশ্বরকে অদ্বিতীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে বলেই দেখতে পাই এবং সেক্ষেত্রে সাধারণভাবে ন্যূনতম কোনো আপত্তিও পরিলক্ষিত হয় না। ঈশ্বর সেখানে সর্বদাই বর্ণিত ও সম্বোধিত হয়েছেন একবচনে, অর্থাৎ সেই ভাষায় যা একক ব্যক্তির কথাই সার্বিকভাবে প্রকাশ করে এবং যার সাথে অন্য কোনো ধারণা যুক্তি হলে প্রকাশ্য ভৎর্সনা ডেকে আনে। সুতরাং আমাদের সকল ধর্মগ্রন্থ ত্রিত্ববাদ

বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ বিরত। তাই আমাদের বিরোধীরা তাদের ধর্মমত ও ঈশ্বর মহিমা কীর্তনের প্রার্থনায় বাইবেলের শব্দমালা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং এমন সব শব্দগুচ্ছ আবিষ্কার করে যা ধর্মগ্রন্থ কর্তৃক অনুমোদিত নয়। এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ ধরনের মতবাদ এত অদ্ভুত, এত বিভ্রান্তি সৃষ্টিকর, এত অপরিপক্ক এবং সতর্ক ব্যাখ্যা সাপেক্ষ যা অনির্ণীত ও অরক্ষিত অবস্থায়ই রেখে দিতে হয় এবং যে ব্যাপারে শুধু অনুমান করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এ ব্যাপারে কোনো অনুসন্ধান করতে হয় ধর্মগ্রন্থের দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন অংশ দ্বারা, এটি এক সমস্যা, যা আমাদের মতে কোনো উদ্ভাবন পটুতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

আমাদের আরেকটি সমস্যা আছে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, খৃষ্টান ধর্মের গোড়াপত্তন ও তার বিকাশ ঘটেছে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায়। তারা এ মতবাদের কোনো আপত্তিকর অংশের প্রতিই উদাসীন থাকে নি এবং ত্রিত্ববাদের মত স্ববিরোধী একটি মতবাদ ব্যক্ত হলে তাকে সমালোচনার জন্য তারা অত্যন্ত আগ্রহভরে লুফে নিত। ইয়াহূদীরা যারা একত্ববাদের অনুসারী বলে গর্ববোধ করত, তারা এরকম একটি গোলযোগ সৃষ্টি করেছিল বলে তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়, আমরা তা মেনে নিতে পারি না। এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে এটা ঘটে যেখানে প্রকৃত খৃষ্টান ধর্মের অনুসারীদের রচনা এই খৃষ্টান ধর্ম ও ধর্ম থেকে উদ্ভূত বিতর্কিত বিষয় সংশ্লিষ্ট হলেও সেখানে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে গসপেলের বিরুদ্ধে অভিযোগমূলক কোনো শব্দ নেই, এর সমর্থনে ও ব্যাখ্যায়ও একটি শব্দ ব্যয় করা হয় নি, নিন্দা ও ভুল

থেকে উদ্ধারের লক্ষ্যেও কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় নি? এই যুক্তি স্পষ্ট ও শক্তিশালী। আমাদের বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, খৃষ্টান ধর্মে তিনজন ঐশ্বরিক ব্যক্তি রয়েছেন যা খৃষ্টান ধর্মের আদি প্রচারকগণ ঘোষণা করে গেছেন, তারা সকলেই সমকক্ষ, সকলেই অবিনশ্বর সত্ত্বা, তাদের মধ্যে একজন হলেন যীশু যিনি পরে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যান। খৃষ্টান ধর্মে ত্রিত্ববাদের এই বিচিত্র ব্যাপার-স্যাপার ঘটে থাকলে তার বিরুদ্ধে অব্যাহত আক্রমণ এত বিপুলভাবে আসত যে, সকলেই তার জবাব দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত এবং প্রেরিতগণকে সে আক্রমণ ঠেকাতে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। তবে বাস্তব সত্য এই যে, খৃষ্টান ধর্মের প্রতি যে আপত্তির কথাবার্তা শোনা যায়, তা প্রেরিতদের সময়কালীন নয়। তাদের পত্রাবলিতে ত্রিত্ববাদ থেকে সৃষ্ট বিতর্কের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

এ মতবাদ সম্পর্কে আমাদের আরো আপত্তি তার বাস্তব প্রভাব থেকে উৎসারিত। ঈশ্বরের সাথে সংযোগ থেকে মনকে পৃথক করা বা ভিন্ন পথে চালিত করাকে আমরা উপাসনায় একাগ্রতা অর্জনের প্রতিকূল বলে বিবেচনা করি। একত্ববাদী মতবাদের এক বিরাট মহিমা যে তা আমাদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার, ভক্তির ও ভালোবাসার এক সত্ত্বার, এক চিরন্তন পিতার, সত্ত্বাসমূহের একক সত্ত্বা, এক আদি ও উৎস উপাস্য সত্ত্বার কথা বলে, যার কাছে আমরা সকল ভালো কাজের প্রতিদান চাইতে পারি, তিনি আমাদের সকল মুক্তি এবং অবলম্বন এবং যার সুন্দর ও অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য আমাদের চিন্তাকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে। কোনো অবিভক্ত সত্ত্বার প্রতি নিবেদিত অকৃত্রিম উপাসনার মধ্যে

বিশুদ্ধতা, অনন্যতা রয়েছে যা ধর্মীয় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার জন্য অত্যন্ত অনুকূল। এখন ত্রিত্ববাদ আমাদের সামনে হাযির করে সর্বোচ্চ ভক্তিভাজন তিনটি পৃথক সত্ত্বা, তিনজন অবিনশ্বর ব্যক্তি, আমাদের অন্তরের ওপর সমান দাবি জানায়, তিনজন ঐশ্বরিক সত্ত্বা বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত এবং পৃথক পৃথক স্বীকৃতি ও উপাসনা দাবি করে। আমাদের প্রশ্ন, দুর্বল ও সীমাবদ্ধ মানুষের মন নিজেকে সেই রকম একাধিক শক্তির সাথে কি সম্পৃক্ত করতে পারে, যেমনটি করতে পারে এক অবিনশ্বর পিতা, এক ঈশ্বরের সাথে যিনি সকল করুণা ও মুক্তি লাভের একমাত্র প্রভূ? ধর্মীয় উপাসনাকে তিন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির দাবির দ্বারা বিভক্ত করা অবশ্যই উচিৎ নয়। কেননা সে ক্ষেত্রে একজন জ্ঞানসম্পন্ন দৃঢ় বিশ্বাসী খৃষ্টানের মনোযোগ বিঘ্নিত হবে এই আশঙ্কায় যে কোনো একজন ঈশ্বর বা অন্যজনের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা ও ভক্তির অনুপাত না ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে।

আমরা আরো চিন্তা করি যে, ত্রিত্ববাদ উপাসনার ক্ষতি সাধন করে। আর তা পিতার সাথে অন্যান্য সত্ত্বাকেও উপাসনার লক্ষ্য স্থির করেই শুধু নয়, উপরন্তু পিতার সর্বোচ্চ স্নেহ যা শুধু তারই এখতিয়ার, তা তার কাছ থেকে নিয়ে পুত্রের কাছে স্থানান্তরের মাধ্যমেও। এটা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যিশুখ্রিস্ট যদি অবিনশ্বর সত্ত্বা হন তাহলে পিতার চেয়েও তিনি অধিক আকর্ষণীয় হবেন- ইতিহাস থেকে এটাই প্রত্যাশিত। মানব স্বভাবের গতি প্রকৃতি থেকে দেখা যায় যে, মানুষ এমন এক উপাস্য বস্তু চায় যা হবে তাদের মতই এবং মূর্তি পূজার গোপন রহস্যটি মানুষের এই প্রবণতার মধ্যেই নিহিত। আমাদের মত

একই পোশাকে সজ্জিত, আমাদের চাওয়া ও দুঃখের অনুভূতি সম্পন্ন, দুর্বল প্রকৃতি নিয়ে যিনি কথা বলেন তিনিই আমাদের কাছে আকর্ষণীয়, স্বর্গের সেই ঈশ্বর থেকে যিনি শুদ্ধ আত্মা; অদৃশ্য এবং চিন্তাশীল ও পরিশুদ্ধ মন ছাড়া অন্যের কাছে অনধীগম্য। আমরা আরো ভাবি যে, প্রচলিত ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী যীশুর ওপর যে বিচিত্র দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা তাকে ঈশ্বরদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। পিতা ন্যায়বিচারের ধারক, অধিকারসমূহের রক্ষাকারী এবং ঐশ্বরিক বিধি-বিধানের প্রতিফলদাতা। অন্যদিকে পুত্র, যিনি ঐশ্বরিক ক্ষমার উজ্জ্বল্যদীপ্ত, তার অবস্থান ক্রুদ্ধ ঈশ্বর ও অপরাধী মানুষের মধ্যে, তিনি ঝড়ের মধ্যে তার বিনত মস্তক এগিয়ে দেন, ভালোবাসা পরিপূর্ণ বক্ষ প্রসারিত করেন ঈশ্বরের ন্যায়- বিচারের তলোয়ারের নিচে, তিনি বহন করেন আমাদের শাস্তির সমগ্র বোঝা এবং নিজের রক্ত দিয়ে ক্রয় করেন ঈশ্বরের প্রতিটি করুণা বিন্দু। খৃষ্টান ধর্ম তাদের জন্য প্রধানত প্রেরিত হয়েছিল, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের, যাদের কাছে পিতাকে সুন্দরতম সত্ত্বা হিসেবে প্রতিভাত করার কথা, তাদের মনের ওপর এই উপস্থাপনার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তার বর্ণনার আর প্রয়োজন আছে কি?

একত্ববাদ সম্পর্কে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনার পর আমি দ্বিতীয় যে বিষয়টির কথা বলব, তা হলো আমরা যীশু খৃষ্টের একত্বে বিশ্বাসী। আমরা বিশ্বাস করি যে, যীশু এক মন, এক আত্মা, প্রকৃতপক্ষে যেমনটি আমরা এবং তিনি সমানভাবে এক ঈশ্বর থেকে আলাদা। আমরা ত্রিত্ববাদকে অভিযুক্ত করব এ কারণে যে, তা ঈশ্বরের তিনটি সত্ত্বা তৈরি

করেই ক্ষান্ত হয় নি, যীশুরও দু'টি সত্ত্বা তৈরি করেছে এবং এভাবে তার ব্যাপারে আমাদের সাধারণ জ্ঞান ও ধর্মগ্রন্থের স্বাভাবিক মর্মবাণীর পরিপন্থী এবং তা যীশুর সরল সত্যকে বিকৃত করার মিথ্যা দর্শনের ক্ষমতার এক উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

এ মতবাদ অনুযায়ী যীশুখ্রিস্ট আমাদের পক্ষে যা বুঝা সম্ভব সেই এক মন, এক জ্ঞান সম্পন্ন বুদ্ধিমান মানুষ হওয়ার পরিবর্তে দু'টি আত্মার সমন্বয়ে গঠিত, দুই মনসম্পন্ন সত্ত্বা। এর একটি হলো ঐশ্বরিকতা, অন্যটি হলো সর্বজ্ঞতা। আমরা লক্ষ্য কির, যীশুকে দু'টি সত্ত্বা করার জন্যই এটি করা হয়েছে। তাকে এক ব্যক্তি, এক সত্বা আখ্যা দেওয়া এবং তদুপরি তাকে দুই মন সম্পন্ন বলে অনুমানের কারণ অপব্যবহার ও তালগোল পাকানোর মাধ্যমে বোধশক্তি সম্পন্ন সত্ত্বা সম্পর্কে আমাদের ধারণার ওপর সামগ্রিকভাবে একটি কালো পর্দা ছুঁড়ে দেওয়া। সাধারণ মতবাদ অনুসারে খৃষ্টের এই দু'টি মনের প্রত্যেকেরই নিজস্ব বোধ, নিজস্ব ইচ্ছা, নিজস্ব উপলব্ধি রয়েছে। কার্যত তাদের কোনো অভিন্ন বৈশিষ্ট্য নেই। ঐশ্বরিক মন মানুষের কোনো অভাব বা দুঃখ অনুভব করে না এবং মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক পূর্ণাঙ্গতা ও সুখ নেই। আপনি কি বিশ্ব পৃথিবীতে অধিক স্বাতন্ত্রমণ্ডিত দু'টি সত্ত্বার কথা ভাবতে পারেন? আমরা সব সময়ই ভেবে এসেছি যে, এক ব্যক্তি এক সচেতনতা বোধ দ্বারা গঠিত ও স্বতন্ত্র। এক এবং অভিন্ন ব্যক্তির দু'টি সচেতনতাবোধ, দু'টি ইচ্ছা, দু'টি আত্মা, এগুলো সম্পূর্ণরূপে পরস্পর থেকে আলাদা। এগুলো মানুষের বিশ্বাসের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টিকারী বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়।

আমাদের বক্তব্য যে, এ ধরনের একটি অদ্ভুত, জটিল, মানুষের পূর্ব ধারণা থেকে বহু দূরবর্তী মতবাদ যদি প্রকৃতই প্রত্যাদেশের অংশ বা অত্যাবশ্যক অংশ হয়ে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণভাবে শিক্ষা দিতে হবে। আমরা আমাদের ভাইদের এরকম কিছু সরল, সরাসরি অংশ দেখানোর আহ্বান জানাচ্ছি যেখানে যীশুকে দু'মনের অধিকারী হিসেবে পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে, এক ব্যক্তি হিসেবে নয়। আমরা এমন কিছুই দেখি না। অন্য খৃষ্টানরা বলেন, এ মতবাদ ধর্মসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অত্যাবশ্যক, কারণ কিছু ধর্মগ্রন্থে যীশুকে মানুষ এবং কিছু ধর্মগ্রন্থে তাকে ঐশ্বরিক সত্ত্বা হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর এক্ষেত্রে একটি সমন্বয় সাধনের জন্যই আমাদের অবশ্যই দুই মনের অনুমান করতে হবে যাতে এই বৈশিষ্ট্যসমূহ তার সাথে সম্পৃক্ত করা যায়। অন্য কথায়, কিছু নির্দিষ্ট অংশকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে আমাদের অবশ্যই একটি কল্পিত বিষয় আবিষ্কার করা প্রয়োজন যা আরো জটিল এবং ব্যাপকভাবে অযৌক্তিক। আমাদের একটি সূত্রের মাধ্যমে এই গোলকধাঁধার জটিল আবর্ত থেকে পরিত্রাণ লাভের পথ খুঁজে বের করতে হয়।

যদি যীশুখ্রিস্ট নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতেন যে, তিনি দুই মন দ্বারা গঠিত এবং তা তার ধর্মের শীর্ষস্থানীয় বৈশিষ্ট্য, তাহলে তার মর্যাদা সংক্রান্ত তার বক্তব্য এই বৈশিষ্ট্যের রঙে রঞ্জিত থাকত। মানুষের বিশ্বজনীন ভাষা যে ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তা হলো, এক ব্যক্তি, একই ব্যক্তি, একই মন এবং একই আত্মা। যখন সাধারণ মানুষ যীশুর মুখ থেকে এ ভাষা উচ্চারিত হতে শুনেছে তারা অবশ্যই তা

সাধারণ অর্থেই গ্রহণ করেছে এবং ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যার স্পষ্ট নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত একক আত্মার সাথেই তা সম্পর্কিত করেছে যার কথাই তিনি সর্বদা বলেছেন। কিন্তু আমরা এ নির্দেশনা কোথায় পাব? যেসব কথাবার্তায় ত্রিত্ববাদ গ্রন্থগুলো পরিপূর্ণ এবং যা যীশুর দ্বৈত বৈশিষ্ট্য থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে সৃষ্ট হয়েছে, নিউ টেস্টামেণ্টে তা আপনি কোথায় পাবেন? কোথায় এই ঐশ্বরিক শিক্ষক বলেছেন, "আমি এটা বলছি ঈশ্বর হিসেবে এবং এটা বলছি মানুষ হিসেবে, এটা শুধু আমার মানব মনের সত্য, এটা শুধু আমার ঐশ্বরিক মনের সত্য?" আমরা কি পত্রাবলিতে এই অদ্ভুত কথার কোনো সন্ধান পাই? কোথাও নয়। তখনকার দিনে এগুলোর প্রয়োজন ছিল না। পরবর্তীকালে ভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যই এসব করা হয়েছে। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি যে, খৃষ্ট এক মন, এক সত্ত্বা এবং আমি এর সাথে যোগ করছি যে, তিনি এক সত্ত্বা যা ঈশ্বর থেকে পৃথক।... আমরা আশা করি, যাদের সাথে আমাদের মতপার্থক্য রয়েছে, তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করবেন। যীশু তার শিক্ষা প্রচারকালে অব্যাহতভাবে ঈশ্বরের কথা বলেছেন। এ শব্দ সব সময় তার মুখে থাকত। আমাদের প্রশ্ন, এই শব্দ দ্বারা তিনি কি নিজেকে বুঝিয়েছেন? আমরা বলি, কখনোই না। বরং তিনি সোজাসুজিভাবে ঈশ্বর ও তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এবং তার প্রত্যক্ষ অনুসারীরাও তাই করেছেন। সুতরাং একথা কীভাবে মেনে নেওয়া যায় যে, ঈশ্বর হিসেবে যীশুর প্রকাশ খৃষ্টান ধর্মের প্রধান লক্ষ্য? আমাদের প্রতিপক্ষকে অবশ্যই তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে।

ধর্মগ্রন্থগুলোর যে অংশগুলোতে যীশুকে ঈশ্বর থেকে পৃথক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা সেগুলো পরীক্ষা করলে দেখতে পাব যে, সেগুলোতে তাঁকে শুধু আলাদা সত্ত্বাই বলা হয় নি, উপরন্তু তার অধস্তন হওয়ার কথাও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সর্বদাই নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত, ঈশ্বর থেকে সকল শক্তি লাভকারী, ঈশ্বরের সাহায্যেই সকল অলৌকিক ঘটনা সংঘটন, ঈশ্বর তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন বলেই ন্যায় বিচার করতে পেরেছেন, যেহেতু ঈশ্বর তাঁকে নিযুক্ত ও বৈধতা প্রদান করেছেন সে কারণে তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস দাবি করেছেন এবং তিনি নিজে কোনো কিছু করতে সক্ষম নন বলে জানিয়েছেন। নিউ টেস্টামেন্ট এসব কথায় পরিপূর্ণ। এখন আমাদের প্রশ্ন, এসব কথা দ্বারা কী বলতে ও বুঝাতে চাওয়া হয়েছে? যারা এসব কথা শুনেছে তারা কি এ ধারণা করবে যে, যীশুই ছিলেন সেই ঈশ্বর যে ঈশ্বরের চাইতে তিনি নিজেকে অধস্তন বলে বার বার ঘোষণা করেছেন; যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছেন এবং যার কাছ থেকে তিনি শক্তি ও ক্ষমতা লাভের কথা স্বীকার করেছেন!

ত্রিত্ববাদীরা যীশুর প্রতি তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা লাভের চেষ্টা করেছে। তারা আমাদের বলে যে, এটা তাদের জন্য ঐশ্বরিক প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, কেননা এটা তাদের দেখিয়েছে যে, তাদের পাপের কারণে এক ঐশ্বরিক সত্ত্বা যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। এই ভ্রান্ত যুক্তি তারা এত আস্থার সাথে ব্যক্ত করে যা দেখে বিস্মিত হতে হয়, যখন তাদের প্রশ্ন করা হয় যে, তারা কি প্রকৃতই বিশ্বাস করে যে, একজন অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর ক্রুশে বিদ্ধ

হয়ে যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবরণ করেছেন? তখন তারা স্বীকার করে যে, এটা সত্য নয়। তবে খৃষ্টের মানবিক মনই শুধু মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করে টিকে ছিল। তাহলে আমরা একজন যন্ত্রণা ভোগীকারী ঐশ্বরিক সত্ত্বাকে পাচ্ছি কীভাবে? আমাদের মনে হয়, এই সব কথা সাধারণ মানুষের সরল মনের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তা ঈশ্বরের ন্যায়-বিচারের প্রতি অত্যন্ত অবমাননা কর, যেহেতু এগুলো কূট তর্ক ও কল্পকাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়...।[৬১]

এভাবে যদিও চ্যানিং বিশ্বাস করতেন যে, যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন ও পুনর্জীবন লাভ করেছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি প্রায়শ্চিত্ত মতবাদের অসারতা প্রদর্শনে সক্ষম ছিলেন। যেসব ঘটনার ওপর ভিত্তি করে এ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত, সেগুলো যে বাস্তবে সংঘটিত হয় নি, সে ব্যাপারে কিন্তু তিনি অবহিত ছিলেন না। চ্যানিং নিম্নোক্ত কারণে প্রায়শ্চিত্ত মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন:

বাইবেলে এমন কোনো অংশ নেই যেখানে আমাদের বলা হয়েছে মানুষের পুত্র ঈশ্বর এবং তার ঐশ্বরিক প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। এ মতবাদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, মানুষ যদিও ঈশ্বর কর্তৃক নশ্বর, ভ্রান্তিশীল ও অপূর্ণাঙ্গ সত্ত্বা হিসেবে সৃষ্ট, সে স্রষ্টার কাছে একজন ঐশ্বরিক বিধান লংঘনকারী হিসেবেই গণ্য। চ্যানিং বলেন, একত্ববাদীরা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর কোনো কঠোর শাস্তি ছাড়াই পাপ ক্ষমা করতে পারেন। যে মতবাদ ঈশ্বরকে একজন যন্ত্রণা ভোগকারী ও নিজের বিদ্রোহপ্রবণ সৃষ্টির কারণে প্রাণদানের কথা বলে তা অযৌক্তিক ও ধর্মগ্রন্থ পরিপন্থী।

প্রায়শ্চিত্ত হয় ঈশ্বরের কাছে, ঈশ্বরের জন্য প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না। যদি ঐশ্বরিক প্রায়শ্চিত্ত অপরিহার্য হয়, যা শুধু ঈশ্বরই করতে পারেন, সেক্ষেত্রে ঈশ্বরকে অবশ্যই একজন যন্ত্রণা ভোগকারী হতে হবে এবং আমাদের দুঃখ ও ব্যথা গ্রহণ করতে হবে। এটা এক অবাস্তব, অগ্রহণযোগ্য কল্পনা। এই সমস্যা পরিহার করতে আমাদের বলা হচ্ছে যে, খৃষ্ট একজন মানুষ হিসেবে যন্ত্রণা ভোগ করেন, ঈশ্বর হিসেবে নয়। কিন্তু মানুষ যদি স্বল্প ও সীমিত সময়ের জন্য যন্ত্রণাভোগ করে তাহলে চিরন্তন প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন কি? আমাদের যদি স্বর্গে চিরন্তন গুণ ও শক্তি সম্পন্ন ঈশ্বর থেকেই থাকেন, তাহলে আমাদের রক্ষার জন্য অন্য কোনো চিরন্তন ব্যক্তির আমাদের প্রয়োজন নেই। এই মতবাদ যখন বলে যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঈশ্বর ছাড়া ঈশ্বর কোনো মানুষকে রক্ষা করতে পারেন না, তখন এ মতবাদ ঈশ্বরেরই অবমাননা করে। মানুষের মুক্তির জন্য ন্যায়- বিচারের প্রতি ঐশ্বরিক সন্তুষ্টি যদি অপরিহার্য হয়ে থাকে তবে বাইবেলের অন্তত একটি অংশে তার সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রকাশ থাকা উচিৎ ছিল। এ মতবাদ আদালতে উপস্থিত অপরাধীর দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য বিচারক কর্তৃক নিজেকে শাস্তি প্রদানের মতোই অবাস্তব ও অর্থহীন।

বাইবেল বলে, "খৃষ্টের বিচার আসনের সম্মুখে প্রত্যেককেই হাযির হতে হবে তার কৃতকর্মের ফললাভের জন্য, তা সে ভালোই করুক আর মন্দই করুক (২ করিনথীয় ৫ : ১০) এবং পুনরায় বাইবেল বলে: "আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরের কাছে নিজের বিবরণ দিতে হবে" (রোমীয় ১৪ : ১০)। যদি যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে অতীত,

বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে বলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে ধর্মীয় ও সৎকর্মশীল জীবন-যাপনের নির্দেশ দেওয়ার সকল ক্ষমতা ঈশ্বর হারিয়েছেন এবং অবাধ্যদের শাস্তি প্রদানেরও বিশেষ অধিকার তার নেই। ঈশ্বর যদি বিচার দিবসে কোনো পাপীকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হয় ঈশ্বর তার ওয়াদা লংঘণকারী, নয় প্রায়শ্চিত্ত মতবাদ অসত্য।

১৮১৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কারো বাড়িতে অথবা বোস্টনের বার্কলে স্ট্রীট অবস্থিত মেডিক্যাল কলেজের হলে একত্ববাদীদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতো। ১৮২০ খৃস্টাব্দে একত্ববাদীদের উপাসনার জন্য একটি ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৮২১ খৃস্টাব্দে তা শেষ হয়। এর মধ্য দিয়ে তাদের মতবাদের আরো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ মিললেও তখন পর্যন্ত একত্ববাদীদের ধর্মদ্রোহী, অবিশ্বাসী অথবা নাস্তিক বলে আখ্যায়িত করা হতো।[৬২] যাহোক, এ বছর একত্ববাদীদের ধর্মমত প্রচারের ক্ষেত্রে সতর্কতার নীতির অবসান ঘটে। চ্যানিং এতদিন গোঁড়া চার্চের সংকীর্ণ ও তিক্ত আক্রমণের শিকার হয়েছেন, কিন্তু কোনো প্রতি-আক্রমণ করতে পারেন নি। এখন তিনি অনুভব করলেন যে, পাল্টা আঘাত হানার সময় এসেছে। আর তা করতে হবে তার সর্বশক্তি দিয়ে, অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তার ধর্ম বিশ্বাসের সপক্ষে ও গোঁড়া কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলে।

A History of Unitarianism গ্রন্থে ই.এম. উইলবার (E. M. wilbar) চ্যানিং সম্পর্কে লিখেছেন, তার মূল বক্তব্য ছিল ধর্মগ্রন্থগুলো

যখন যুক্তিসংগতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তখন তা একত্ববাদীদের মতবাদই শিক্ষা দেয়। এগুলোতে রয়েছে প্রধান মতবাদসমূহ যার ওপর একত্ববাদীদের গোঁড়াপন্থীদের থেকে পৃথক এবং সেগুলো তারা সমুন্নত রেখেছে একের পর এক পরীক্ষা অনুসন্ধানের জন্য... এগুলো ক্যালভিনবাদের মত অযৌক্তিক, অমানবিক ও হতাশাগ্রস্ত পরিকল্পনা পরিপূর্ণ মতবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ও দ্ব্যর্থহীন আহ্বান জানায়.... এবং মানুষের যুক্তি ও জ্ঞান বহির্ভূত সেকালের গোঁড়া খৃষ্টান ধর্মীয় মতবাদকে অভিযুক্ত করে।[৬৩]

১৮২৩ খৃস্টাব্দে ম্যাসাচুসেটসে এক সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমেরিকায় একত্ববাদী আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য যারা প্রচার চালাতে আগ্রহী ছিল, গোঁড়া চার্চ তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতা একত্ববাদী আন্দোলনকে প্রকাশ্য রূপ লাভে সাহায্য এবং এর বিভিন্ন সমস্যাকে অভিন্ন স্বার্থরক্ষায় ঐক্যবদ্ধ করে।

১৮২৭ খৃস্টাব্দে চ্যানিং এর বিখ্যাত এক ধর্মীয় বক্তৃতার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় একটি চার্চের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ই. এম. উইলবার লিখেছেন, এই সুফল লাভের কৃতিত্ব প্রধানত তারই প্রাপ্য এ কারণে যে, সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করা না হলেও ত্রিত্ব-বাদ আনুষ্ঠানিক প্রচার সত্ত্বেও গোঁড়া ধর্ম বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় অবস্থান বিলুপ্ত হলো এবং তার গুরুত্ব আর আগের মত রইল না। উপরন্তু ক্যালভিনবাদের মতবাদ এক নতুন ব্যাখ্যা লাভ করল যা যাজকরা ইতিপূর্বে ভীতির সাথে প্রত্যাখ্যান করতেন।[৬৪] সব

ঘটনা প্রতিরোধ ছাড়া ঘটে নি। ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে একত্ববাদীদেরকে ঠান্ডা মাথায় অবিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং তাদের এমন নিপীড়ন করা হয় যে, তার কাছে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও গোঁড়ামির পূর্বের সকল নজির ম্লান হয়ে যায়।[৬৫] জানা যায় যে, ১৯২৪ খৃস্টাব্দের দিকে ৪০ জন একত্ববাদীর মধ্যে ৩০ জন বোস্টনে মিলিত হন এবং একটি অজ্ঞাতনামা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যদিও আগেকার দিনের একত্ববাদীদের মতো দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি বরণের আশঙ্কা তাদের ছিল না, তা সত্ত্বেও এক ঈশ্বরের সমর্থনকারী একজন খৃষ্টানের জন্য তখন পর্যন্ত পরিস্থিতি বিপজ্জনক ছিল।

চ্যানিং তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একত্ববাদে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তার কাছে যীশু শুধু একজন মানুষই ছিলেন না, ঈশ্বরের প্রেরিত একজন নবীও ছিলেন। মানুষের নৈতিক স্খলন, ঈশ্বরের রোষ এবং যীশুর প্রায়শ্চিত্তমূলক আত্মত্যাগের ক্যালভিনীয় মতবাদের বিপরীতে চ্যানিং এক মহত্তম ধারণার ঘোষণা দেন যার সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন এভাবে: "আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব, ঈশ্বরের সাথে আত্মিক সাদৃশ্যের কারণে তার সম্মিলন, ঈশ্বরের সত্ত্বার ধারণ ক্ষমতা, তার স্ব-গঠন শক্তি, অনন্ত জীবনের দিকে তার যাত্রা এবং তার অমরত্ব।"[৬৬]

প্রিস্টলির যুক্তিবাদ এবং কল্পিত জগৎ থেকে এটি ছিল এক নতুন পরিবর্তন। শুধু আমেরিকাতেই নয়, ইংল্যান্ডেও একত্ববাদী আন্দোলনে তা নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করেছিল। প্রিস্টলি কার্যত ছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক। তার যুক্তি ছিল জোরালো, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জড়বাদী।

চ্যানিং তাকে মহত্তম আধ্যাত্মিকতার শীর্ষে উন্নীত করেন। তিনি যখন বলেছিলেন- "মানুষের যুক্তিবাদী স্বভাব ঈশ্বরের প্রদত্ত"- তার সেই কথা আটলান্টিকের উভয় পারের মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।[৬৭] তিনি সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার প্রতিটি দিকেরই বিরোধী ছিলেন। শ্রেণি বা সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন ছিল তার কাছে অসহ্য এবং তার এই চেতনা আন্দোলনের নেতাদেরকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। এরই পরিণতি হিসেবে ১৮৬১ খৃস্টাব্দে ডিভিনিটি স্কুল অফ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সংগঠনের সংবিধানের এক অংশে বলা হয়েছে, "এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, খৃষ্টীয় সত্যের গুরুত্বপূর্ণ নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন অনুসন্ধানের প্রতিটি ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করতে হবে এবং ছাত্র, শিক্ষক অথবা প্রশিক্ষকদের কোনোপ্রকার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণযোগ্য হবে না।[৬৮] ১৮২৫ খৃস্টাব্দে আমেরিকান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছর ইংল্যান্ডেও এ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। রালফ ওয়ালডো এমারসন (Ralph Waldo Emerson, ১৮০৩-১৮৮২ খৃ.) বোস্টনের যাজক সম্প্রদায় থেকে পদত্যাগ করেন এবং নতুন ও পুরোনো চিন্তার অনুসারীদের মধ্যে ভাঙন সম্পন্ন হয়। যীশুর ধর্মকে ঈশ্বর প্রেম ও মানব সেবার ধর্ম এবং একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে একত্ববাদ আজও অব্যাহত রয়েছে। খৃষ্টান সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে অনেকেই এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং তারা বাইবেলের মধ্যকার স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও সেই নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন-

যাপনে আগ্রহী। যদিও যীশুর বাস্তব জীবন সম্পর্কে, যেমন তিনি কীভাবে মানুষের সাথে আচরণ করতেন এবং তাদের ধর্ম শিক্ষা দিতেন, তিনি কীভাবে সব কাজ করতেন ও জীবন-যাপন করতেন সেসব বিষয়ে তাদের সামান্যই জ্ঞান ছিল। যা হোক, প্রায়শ্চিত্ত, পাপ স্খলন ও ত্রিত্ববাদী মতবাদের ফলে সৃষ্ট বিভ্রান্তি এবং তার সাথে যীশু (ঈসা আলাইহিস সালাম) যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন, তদনুযায়ী চলার ব্যাপারে প্রকৃত দিক-নির্দেশনার অভাব থাকার কারণে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তা খৃষ্টধর্মকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যানের কারণ হয়েছে। বস্তুত খৃষ্টধর্মের চার্চগুলো আজ সামান্যতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

## অষ্টম অধ্যায়

## একালে খৃষ্টধর্ম

একালে খৃষ্টধর্মের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে দু'টি বিষয় মনে রাখা জরুরি। তা হলো পর্যবেক্ষণ ও অনুমান লব্ধ জ্ঞান ও মানুষের নিকট প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য। নতুন নতুন পর্যবেক্ষণ ও নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনুমান লব্ধ জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং এ জ্ঞান সন্দেহাতীত নয়। প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত দিক, অন্যটি হলো বাস্তব দিক। অধিবিদ্যাগত জ্ঞান এক ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। অন্যদিকে বাস্তব জ্ঞান শিক্ষা দেয় আচরণবিধি। প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান সর্বদা একজন বার্তা বাহক বা দূত কর্তৃক বহন করে আনা হয়েছে যিনি তার বাস্তব রূপ। তিনি যে পন্থায় জীবন-যাপন করেছেন সেটাই বাণী। একজন দূত বা বাণী বাহকের ন্যায় আচরণ করার জন্য সে বাণী সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। আর এ জ্ঞান হলো সন্দেহাতীত। বলা হয়, প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞানই হলো একালের খৃষ্টান ধর্মের ভিত্তি। কিন্তু কোনো বাইবেলেই যীশুর বাণী অবিকৃত অবস্থায় অর্থাৎ তার কাছে যেভাবে প্রত্যাদেশ হয়েছিল সেই আদিরূপ নেই। তার আচরণবিধির কোনো লিখিত বিবরণ কোথাও খুঁজে পাওয়া কঠিন। নিউটেষ্টামেন্টের কোনো গ্রন্থেই তার বাণী ও কর্মকান্ডের ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শীর কোনো বিবরণ নেই। সেগুলো এমন লোকদের দ্বারা লিখিত হয়েছে যারা যীশুকে স্বচক্ষে দেখেননি, তাঁকে দেখছেন এমন ব্যক্তিদের কাছে শুনে তারা লিখেছেন। এসব বিবরণ সমন্বিত বা উপলব্ধিযোগ্য নয়। যীশু যা বলেছেন ও করেছেন অথচ লিপিবদ্ধ হয় নি তার সবই চিরকালের মত বিলুপ্ত হয়েছে।

নিউ টেস্টামেণ্টে বিধৃত বিষয়সমূহ যারা যাচাই করতে চান, তারা দাবি করেন যে, একটি কোনোক্রমেই সমন্বিত না হলেও ন্যূনতম পক্ষে নির্ভুল। যা হোক, একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে যে, বাইবেলের বর্তমান অনুবাদগুলো যেখান থেকে উদ্ভূত, সেই নিউ টেস্টামেণ্টের প্রাচীনতম টিকে থাকা পাণ্ডুলিপিগুলোও নিসিয়ার কাউন্সিলের পর রচিত। সাইনাইটিকাসের (Codex Sinaiticus) পুঁথি ও ভ্যাটিকানাসের (Codes Vaticanus) পুঁথির রচনাকালে চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিক। অন্যদিকে আলেকজান্দ্রিয়াসের পুঁথির (Codes Alexandrius) রচনাকাল পঞ্চম শতাব্দী। নিসিয়ার কাউন্সিলের পর যীশুর জীবনের বিবরণ সংবলিত প্রায় ৩শ’ পাণ্ডুলিপি, যার মধ্যে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও ছিল, পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়। নিসিয়ার কাউন্সিলের ঘটনাবলী এ ইঙ্গিত দেয় যে, পলীয় চার্চ তখনও টিকে থাকা চারটি গসপেলের পরিবর্তন সাধন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এটা সুস্পষ্ট যে, নিসিয়ার কাউন্সিলের পর লিখিত নিউ টেস্টামেন্টের পাণ্ডুলিপিগুলোর সাথে সংগতিপূর্ণ নয় মরু সাগর পুঁথিগুলোর এমন অংশগুলোর প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলেও পরবর্তীতে উক্ত অংশের প্রকাশনা বন্ধ করা হয়।

গসপেলগুলোর অবাস্তবতা চার্চ নিজেও স্বীকার করেছে বলেই মনে হয়। খৃষ্টধর্মের অধ্যাত্ম দর্শন আজ এমনকি গসপেল ভিত্তিকও নয়। আদি পাপ, প্রায়শ্চিত্ত ও পাপস্খালন, যীশুর ঈশ্বরত্ব, পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব ও ত্রিত্ববাদী মতবাদের ওপর ভিত্তি করে চার্চ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গসপেলগুলোতে এসব মতবাদের কোনোটিই খুঁজে পাওয়া যায় না।

যীশু সেগুলো শিক্ষা প্রদান করেন নি। এর সবই পলের আবিষ্কার এবং গ্রীক সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রভাবের ফল। পল কখনোই যীশুর সাহচর্য লাভ করেন নি কিংবা তার কাছ থেকে সরাসরি কোনো জ্ঞান আহরণও করেন নি। তিনি ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের আগে যীশুর অনুসারীদের ওপর কঠোর নিপীড়ন চালিয়েছেন এবং যীশুর অন্তর্ধানের পর তিনি যখন খৃষ্টান ধর্মকে গ্রীসের অ-ইয়াহুদীদেরও অন্যদের কাছে নিয়ে যান, তখন যীশুর আচরণ বিধি বিপুলভাবে পরিত্যাগের জন্য তিনি দায়ী। "খৃষ্টের" রূপে যে ব্যক্তি তাকে তার নয়া মতবাদ শিক্ষা দিয়েছিলেন বলে তিনি দাবি করেন তা ছিল কল্পিত। তার শিক্ষা যা কিনা যীশুর কল্পিত মৃত্যু ও পুনরুত্থান নির্ভর এমন এক ঘটনা তা বাস্তবে কখনো ঘটে নি।

মূল সম্পর্কে সন্দেহপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এসব মতবাদ "খৃষ্টান ধর্ম শিক্ষাকারী" যে কোনো ব্যক্তির জন্য অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পালনযোগ্য। যদিও অনেকেই এসব মতবাদ পুরোপুরি বা আংশিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু তারপরও যারা এতে বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এই কুখ্যাত যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় যে, "চার্চের বাইরে কোনো মুক্তি নেই।" চার্চের অধ্যাত্ম দর্শনের কাঠামো হলো: প্রায়শ্চিত্ত ও পাপ মুক্তির মতবাদ বলে যে, ঈশ্বরদের একজন খৃষ্ট মানুষের রূপ গ্রহণ করেন, তিনি যীশু নামে পরিচিত হন, অতঃপর তিনি মানবজাতির সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে মৃত্যুবরণ করেন। চার্চ বিচারের দিনে "খৃষ্টে" বিশ্বাসী সকল মানুষ ও যারা চার্চের নির্দেশনা অনুসরণ করে তাদের সকলের পাপের ক্ষমা ও মুক্তির নিশ্চয়তা দেয়। উপরন্তু আরো বিশ্বাস করা হয়

যে, জগতের বিলুপ্তি না ঘটা পর্যন্ত সকল মানুষের ক্ষেত্রে এই চুক্তি কার্যকর। এ বিশ্বাসের স্বাভাবিক পরিণতি এরূপ:

**প্রথমত:** এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নয় এবং মৃত্যুর পর সেগুলোর জন্য সে দায়ী হবে না। কারণ সে যাই করুক না কেন তার বিশ্বাস যে, "খৃষ্টের আত্মত্যাগের" কারণে সে মুক্তি লাভ করবে। যাহোক, এর অর্থ এই নয় যে, পৃথিবীতে তার জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হবে। আদি পাপের মতবাদে তার বিশ্বাসের (যাতে বলা হয়েছে যে, আদমের ভুলের কারণে সকল মানুষই পাপী হয়ে জন্ম নেয়) অর্থ হলো এই যে, সে যতক্ষণ জীবিত থাকে তার অবস্থা থাকে অযোগ্যতা ও অপূর্ণতারই একটি দৃষ্টান্ত। জীবনের এই দুঃখজনক দৃষ্টিভঙ্গি জে. জি. ভস (J. G VOS) নামক একজন খৃষ্টানের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। এতে তিনি ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের তুলনা করেছেন:

ইসলাম এমন কিছু সেই যে, কোনো মানুষ বলবে "কি হতভাগ্য আমি মৃত্যুর পর কে আমাকে উদ্ধার করবে?" অথবা " আমি জানি, আমি অর্থাৎ আমার এই শরীর কোনো ভালো কাজ করে নি।" যুক্তিসংগত অভীষ্ট লাভের উদ্দেশ্য সংবলিত একটি ধর্ম পাপীকে অপরাধী বিবেকের যন্ত্রণা ভোগ বা একটি সম্পূর্ণ নৈতিক মানসম্মত জীবন- যাপনে সাফল্য লাভ না করার হতাশা প্রদান করে না। সংক্ষেপে, ইসলাম একজন মানুষের মনে উত্তম অনুভূতি সৃষ্টি করে, পক্ষান্তরে খৃষ্টধর্ম অনিবার্যভাবে সৃষ্টি করে খারাপ অনুভূতি। ভগ্নহৃদয় লোকদের ধর্ম হলো খৃষ্টধর্ম, ইসলাম নয়।[১]

**দ্বিতীয়ত:** প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তি লাভ মতবাদে বিশ্বাস এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে যখন একজন খৃষ্টান অন্য মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট অন্যান্য ধর্মের সাথে তার ধর্মের একটি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। এর অর্থ এই যে, 'খৃষ্টের আত্মত্যাগ' ও "বাণী" অতুলনীয় ও চূড়ান্ত এবং তিনি অন্য নবীদের শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন না। একই সাথে তিনি সেগুলোর মধ্যে যে, সত্য খুঁজে পান তাও অস্বীকার করতে পারেন না। এভাবে একজন খৃষ্টান ইয়াহূদীধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে, আবার গ্রহণ করে ওল্ড টেস্টামেন্ট যা ইয়াহূদীদের কাছে আনীত মূসার আলাইহিস সালাম শিক্ষা থেকে উদ্ভূত। সে নিজেকে যুগপৎভাবে দু'টি পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস গ্রহণ করার এক অসম্ভব অবস্থানে নিজেকে স্থাপিত করে। নিম্নোদ্ধৃত অংশে এর প্রমাণ মেলে: অ-খৃষ্টান ধর্মগুলোতে আপেক্ষিক ভালো উপাদান রয়েছে। মিথ্যা ধর্ম থেকে দূরে থাকার আহ্বানটি নিশ্চিতরূপেই বাইবেলের অন্যদিকে ধর্মগ্রন্থগুলোতে পৌত্তলিক ধর্মের অপদেবতাদের শিক্ষাও প্রদান করা হয়েছে... এ কথাও সত্য যে, সীমিত আপেক্ষিক ভালোর উপাদানগুলো এসব ধর্মেও রয়েছে। একথা যেমন সত্য যে, সেগুলো অপদেবতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, একথাও আবার সত্য যে, সেগুলোর মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের মানুষের কৃত বিকৃত ব্যাখ্যারই সৃষ্টি। যদিও সেগুলো শয়তানের কর্ম হতে পারে, তবে তা অংশিত ঈশ্বরের সাধারণ অনুগ্রহের এবং অংশিত পাপী মানুষ কর্তৃক ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের অপব্যবহারের ফসলও বটে।[২]

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, ভস বাইবেল যেসব বিকৃতির শিকার হয়েছে তার সবগুলোর উল্লেখ করেন নি।

অ-খৃষ্টান ধর্ম বিশ্বাসের যুগপৎ গ্রহণ ও বর্জনের এই সমস্যা পরিহারের প্রচেষ্টা এ যুক্তিতে শুরু হলো যে, কিছু খৃষ্টান "নিজেদের মধ্যে 'ঈশ্বরের খৃষ্টে'র প্রভাব উপলব্ধি করছে যিনি চিরন্তন বিশ্ব নিয়ন্ত্রক অথবা ঈশ্বর হিসেবে হচ্ছেন "আলো যিনি প্রতিটি মানুষকে আলোকিত করেন।" উইলিয়াম টেম্পল (W. Temple) এই মত সমর্থন করে লিখেছেন- "ঈশ্বরের বাণী, বলতে গেলে যীশুখৃষ্ট, যিশাইয় (Isaiah) ও প্লাটো, যরথ্রুস্ট্র (Zoroastor) বুদ্ধ ও কনফুসিয়াস সে সত্যই লিখেছেন ও বলেছেন যা তারা ঘোষণা করেছেন। ঐশ্বরিক আলো একটাই এবং প্রতিটি মানুষই তার নিজ নিজ পরিমাপ অনুযায়ী তা দ্বারা আলোকিত হয়েছে।"[৩] এই বক্তব্যে যে দু'টি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে তা হলো "এক ঐশ্বরিক আলো" এবং "খৃষ্ট"। এ দু'টি আসলে একই বিষয়। যেহেতু খৃষ্ট 'কল্পনার' বিষয়, তাই এ মতবাদ ব্যর্থ এবং সমস্যা বিরাজ করছে। জর্জ অরওয়েলের "দ্বৈত চিন্তা"র শরণাপন্ন হলেই শুধু তা পরিহার করা যেতে পারে। তিনি একে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন:

'দ্বৈত চিন্তা'র অর্থ হলো যুগপৎভাবে দু'টি পরস্পর বিরোধী শক্তিকে ধারণ করা এবং তাদের উভয়কেই গ্রহণ করা। দলীয় বুদ্ধিজীবী জানেন যে, তিনি বাস্তবের সাথে ভাঁওতাবাজি করছেন, কিন্তু দ্বৈত চিন্তার প্রয়োগ দ্বারা তিনি নিজেকে সন্তুষ্টও করছেন যে বাস্তবতা লংঘিত হচ্ছে না।[৪]

খৃষ্টই ঈশ্বর- একজন খৃষ্টানের এই মৌলিক ধারণার মূলে রয়েছে 'দ্বৈত চিন্তা'র অবস্থান। যীশুর দু'টি প্রকৃতির বৈপরীত্য থেকে যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, দ্বৈত চিন্তা তাকে বেষ্টন করে আছে। এক মুহূর্তে তিনি মানুষ। অন্য মুহূর্তে তিনি ঈশ্বর। প্রথমে তিনি যীশু, তার পরে তিনি খৃষ্ট। একজন মানুষ যুগপৎভাবে দু'টি পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস ধারণ করতে পারে। এটা শুধু দ্বৈত চিন্তার প্রয়োগেই সম্ভব। একমাত্র দ্বৈত চিন্তার দ্বারাই ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন ও তা বজায় রাখা যায়।

চার্চ অব ইংল্যান্ডের ৩৯ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৭ম অনুচ্ছেদ শুরু হয়েছে এভাবে:

"ওল্ড টেস্টামেন্ট নতুনটির বিরোধী নয়...." মিল্টন স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, ওল্ড টেস্টামেন্টের বহু অংশে ঈশ্বরের একত্বের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে এমন একটি অংশও নেই যেখানে ঐশ্বরিক সত্যকে ত্রিত্ববাদের রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট ও গসপেলগুলোতে একত্ববাদের প্রতি সমর্থন এবং একই সময়ে ত্রিত্ববাদের প্রতি সমর্থন সম্ভবত আজকের খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে দ্বৈত চিন্তার প্রভাবের শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ। এভাবে যীশু যা শিক্ষা দেন নি, সেই মতবাদ ভিত্তিক চার্চের অধিবিদ্যার যুক্তি শুধু যীশুর মর্যাদাকেই ম্লান করে নি, ঈশ্বরের একত্বকেও ক্ষুণ্ণ করেছেন। আজকের খৃষ্টান ধর্মের যে অধ্যাত্ম দর্শন তা যীশুর আনীত অধ্যাত্ম দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী। যীশুর শিক্ষার বাস্তব দিকগুলো অর্থাৎ তার আচরণ বিধি আজ চিরতরের জন্য বিলুপ্ত। যীশুর জীবন-যাপন অনুযায়ী জীবন যাপন করার

মাধ্যমেই তার বাণী উপলব্ধি করা সম্ভব, কিন্তু যীশুর আচরণের কোনো বিবরণ এখন কার্যত আর টিকে নেই। এ সম্পর্কে যৎসামান্য যা জানা যায়, তাও আজ উপেক্ষিত। যীশুর সবচাইতে মৌলিক কাজ ছিল স্রষ্টার উপাসনা- যে উদ্দেশ্যেই শুধু মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, যীশু যে উপাসনা করতেন, কোনো খৃষ্টানই এখন সে উপাসনার কাজ করে না। যীশু সাধারণ সিনাগগে উপাসনা করতেন। তিনি প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে উপাসনা করতেন- সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায়। তার উপাসনার প্রকৃত বিবরণ আজ আর পাওয়া যায় না। তবে জানা যায় যে, মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি যে রকম উপাসনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাই ছিল তার উপাসনার ভিত্তি। যীশু বলতেন, তিনি বিধি-বিধানকে সমুন্নত রাখার জন্যই এসেছেন। সেগুলোর বিন্দুমাত্র ধ্বংস সাধন বা ক্ষতি করার জন্য নয়। যীশুকে ১২ বছর বয়স থেকেই জেরুজালেমে সিনাগগে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। তিনি সিনাগগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেন। কোনো খৃষ্টানকেই এখন এ ধরনের কাজ করতে দেখা যায় না। যীশুর মত করে ক'জন খৃষ্টান খতনা করিয়েছেন? আজ চার্চে যে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় তার প্রচলন শুরু হয় যীশুর অন্তর্ধান ঘটার বহুকাল পর। তার অনেকগুলোই সরাসরি এসেছে পৌত্তলিক গ্রেকো- রোমান (Graeco-Roman) পৌরাণিক রীতি-নীতি থেকে। এখন তারা যে প্রার্থনা বাক্য পাঠ করে, তা যীশুর প্রার্থনা বাক্য নয়। তারা যে স্তোত্র গেয়ে থাকে তা যীশুর গাওয়া স্তোত্র নয়। পল ও তাদের অনুসারীদের মস্তিষ্ক প্রসূত মতবাদের কারণে কোনো জিনিস খাওয়া হারাম আর কোনোটি নয়- সে ব্যাপারে কোনো

প্রত্যাদেশজনিত শিক্ষা নেই। এখন যারা খৃষ্টান হয়, তারা যা খুশি খেতে পারে। যীশু ও তার অনুসারীরা শুধু হালাল গোশত খেতেন, তাদের শূকরের মাংস আহার করা নিষিদ্ধ ছিল। অন্তর্ধানের পূর্বে যীশু সর্বশেষ যে আহার করেন তা ধর্মীয় উৎসব (Passover meal) উপলক্ষে প্রস্তুত খাদ্য। কোনো খৃষ্টানই আজ দীর্ঘকালের এই ইয়াহূদী ঐতিহ্যটি পালন করে না যা যীশু অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পালন করেছিলেন। আজ আরো জানা যায় না যে, যীশু কীভাবে আহার ও পান করতেন, তিনি কার সাথে আহার করতেন এবং কার সাথে আহার করতেন না, কোথায় তিনি আহার করতেন এবং কোথায় করতেন না, কখন আহার করতেন এবং কখন আহার করতেন না। যীশু উপবাস করতেন, কিন্তু কীভাবে কোথায় এবং কখন উপবাস করতেন, তাও জানা যায় না। তার উপবাসের নিয়ম- কানুন আজ হারিয়ে গেছে। তিনি কোনো খাবার বিশেষ পছন্দ করতেন এবং কোনো খাবারের প্রতি তার বিশেষ কোনো দুর্বলতা ছিল না, তাও জানা যায় না। যীশু যতদিন পৃথিবীতে ছিলেন তিনি বিবাহ করেন নি, কিন্তু তিনি নিষিদ্ধও করেন নি। গসপেলে এমন কোনো অংশ নেই যেখানে তার একজন সহচরেরও কৌমার্য পালনের শপথ গ্রহণের কথা আছে। আবার মঠ বা আশ্রমের মতো পুরুষ অধ্যুষিত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রমাণও কোথাও নেই যদিও তাদের উৎসের সাথে সম্পর্কিত এরকম দু'একটি সম্প্রদায় তখন ছিল। যেমন প্রসেনীরা। যীশুর আদি অনুসারীদের মধ্যে যারা বিবাহ করেছিলেন তারা অবশ্যই মূসার আলাইহিস সালাম প্রচারিত ধর্মের নিয়ম- কানুন

অনুসারেই তা করেছিলেন। তাদের দৃষ্টান্ত আজ আর অনুসরণ করা হয় না।

পাশ্চাত্যে পারিবারিক কাঠামোর ভাঙ্গন থেকে দেখা যায় যে, একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোকের সাথে কি আচরণ করবে বা একজন মহিলা একজন পুরুষের সাথে কী ধরনের আচরণ করবে- এ ব্যাপারে খৃষ্টান বিবাহের মধ্যে কোনো কার্যকর নির্দেশনা নেই। গসপেল থেকে নৈতিক নীতি আহরণ করে তার সাহায্যে জীবন যাপনের চেষ্টা আর যীশু কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোনো নির্দিষ্টভাবে কাজ করেছেন বলে জ্ঞাত হয়ে সেভাবে কাজ করা এক কথা নয়। কারণ প্রথমটা হলো সিদ্ধান্তমূলক জ্ঞানের ফল, আর দ্বিতীয়টি হলো প্রত্যাদেশ লব্ধ জ্ঞানের বাস্তবায়ন।

যীশু কীভাবে হাঁটতেন, কীভাবে বসতেন, কীভাবে দাঁড়াতেন, কীভাবে নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেন, কীভাবে ঘুমাতে যেতেন, কীভাবে জেগে উঠতেন, কীভাবে মানুষকে শুভেচ্ছা জানাতেন, বৃদ্ধ লোকদের সাথে কি রকম ব্যবহার করতেন, অল্পবয়স্ক লোকদের সাথে তার ব্যবহার কেমন ছিল, বৃদ্ধা মহিলাদের সাথে তিনি কেমন ব্যবহার করতেন, তরুণী-যুবতীদের সাথে তার ব্যবহার কেমন ছিল, আগন্তুকদের কাছে তিনি কেমন ছিলেন, অতিথিদের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন, শত্রুদের সাথে তার ব্যবহার কেমন ছিল, কীভাবে ভ্রমণ করতেন, তিনি কি করার অনুমোদন প্রাপ্ত ছিলেন এবং তিনি কি করার অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন না- এ সবের কোনো বিবরণই নেই।

যীশুর কাছে ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট বাণীর যে বিবরণ পাওয়া যায় তা অপূর্ণ ও অ-যথার্থ। আজকের খৃষ্টান ধর্ম যে মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এসব বিবরণের মধ্যে তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। যীশুর কর্মকাণ্ডের বিবরণ প্রায় সম্পূর্ণই অনুপস্থিত, যৎসামান্য যাও বা আছে তাও কার্যত উপেক্ষিত। অবশ্য চার্চ যে রূপেই হোক না, সর্বদাই যীশুর বাণীর ব্যাখ্যাতা ও অভিভাবক হওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে। যীশু কিন্তু চার্চ প্রতিষ্ঠা করে যাননি। তিনি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য কোনো পুরোহিত বা যাজকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করে যাননি। তা সত্ত্বেও সেই প্রথমাবস্থা থেকেই প্রতিষ্ঠিত পলীয় চার্চ সর্বদাই খৃষ্টানদের এই শিক্ষা দিয়ে আসছে যে, তাদের মুক্তি নিশ্চয়তা তখনই দেওয়া যাবে যদি তারা চার্চ যা বলে তা করে ও বিশ্বাস স্থাপন করে। চার্চ কোথা থেকে এ কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা পেয়েছে?

এই চরমপন্থী কর্তৃত্বের দাবি দেখা যায় রোমান ক্যাথলিক চার্চের পোপদের অভ্রান্ত বলে দাবিকৃত মতবাদের মধ্যে। কার্ডিনাল হীনান (Heenan) এভাবে এর বর্ণনা দিয়েছেন:

আমাদের চার্চের মধ্যে এই আশ্চর্য ঐক্যের গোপন রহস্য হলো খৃষ্টের সেই অঙ্গীকার যাতে তিনি বলেছিলেন চার্চ কখনো সত্য শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হবে না। আমরা জানি যে, চার্চ যে শিক্ষা দেয় আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা জানি যে এটা অবশ্যই সত্য হবে... সকল ক্যাথলিক যাজকই একই মতবাদ শিক্ষা দান করেন যেহেতু তারা সকলেই খৃষ্টের প্রতিনিধিত্ব মান্য করেন।

‘প্রতিনিধিত্ব’ কথাটির অর্থ হলো “সেই ব্যক্তি যিনি অন্যের স্থান গ্রহণ করেন।” পোপ হলেন খৃষ্টের প্রতিনিধি, কেননা, তিনি পৃথিবীতে চার্চের প্রধান। চার্চ একই থাকে যেহেতু তার সকল সদস্যই একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী। তারা চার্চ বিশ্বাস করে, কেননা চার্চ মিথ্যা কোনো কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। আমরা যখন বলি যে, চার্চ অভ্রান্ত, তার মধ্য দিয়ে আমরা এ কথাই বুঝাতে চাই। খৃষ্ট তার চার্চকে পরিচালিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এ জন্য তিনি যেসব পন্থা মনোনীত করেছেন তার একটি হলো তার কথা বলার জন্য পৃথিবীতে তার প্রতিনিধিত্ব রেখে যাওয়া। সে কারণেই আমরা পোপকে অভ্রান্ত বলে থাকি। তিনি হচ্ছে অভ্রান্ত চার্চের প্রধান। ঈশ্বর তাকে ভ্রান্তিতে নিপতিত হতে দিতে পারেন না।[৫]

এখানে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো যে, কার্ডিনাল হীনান শুধু খৃষ্টের কথাই বলেছেন, যীশুর কথা নয়। তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে গসপেলের উল্লেখ করেন নি।

এই মতবাদ প্রায়শই অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা, যদি সকল পোপই অভ্রান্ত হন, তাহলে কেন পোপ অনারিয়াসকে (Honorius) গীর্জার অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল? সাম্প্রতিককালে পোপের উত্তরসূরি যীশুর কথিত ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার জন্য ইয়াহূদীরা দায়ী ছিল না বলে মত ব্যক্ত করেছেন, তার অর্থ কি এই যে, পূর্বের সকল পোপই মোটেই অভ্রান্ত ছিলেন না? “চার্চ কখনোই সত্য শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হবে না বলে খৃষ্টের প্রতিশ্রুতি’র বৈধতা একালের বহু রোমান

ক্যাথলিকই প্রত্যাখ্যান করেছেন। কোনো গসপেলেও অবশ্য এ বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। চার্চের শিক্ষা ও রীতি- নীতির মধ্যে যে বিশাল ফাঁক তা সিনসিনাটির আর্চ বিশপ জোসেফ এল, বার্নাডিন (Josheph. L. Bernadin)-কে সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। ইউ.এস. ক্যাথলিক- এ এক সাক্ষাৎকারের বার্ণাডিন বলেন, "বহু লোকই নিজেদেরকে উত্তম ক্যাথলিক বলে বিবেচনা করে যদিও তাদের বিশ্বাস ও আচার-আচরণের সাথে চার্চের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিরোধ দেখা যায়। একালে একজন ভালো ক্যাথলিক হওয়ার অর্থই প্রায় নতুন রূপ ধারণ করেছে.... যখন (১৯৬৬) শুক্রবারে গোশত খাওয়া বৈধ হলো, তখন যে কেউই পোপের কর্তৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে, জন্মনিয়ন্ত্রণ পালন, যাজকবৃত্তি ত্যাগ এবং বিবাহ করা অথবা যার যা খুশি করতে পারে।" গ্রীলি (Greely) লিখেছেন, "শুক্রবারে গোশত আহার থেকে বিরত থাকার অর্থ যীশুর উপবাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং যে দিনটিতে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হন, সে দিনটির স্মৃতি পালন করা। শেষ পর্যন্ত তা চার্চের এক বিধানে পরিণত হয় এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ তা এক ধরনের রোমান ক্যাথলিক পরিচয় চিহ্ন হিসেবে কাজ করে।"

লেখক ডোরিস গ্রুমবাখ (Doris Grumbach) ক্রিটিক- এ লিখেছিলেন: ভ্যাটিকান ২ (১৯৬২ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিল) আমাকে অভিভূত করেছিল। কারণ বিবর্ণ জীবন, জ্ঞান ও আচরণের একান্ত যে ভুবন- তার বাইরে আরো কিছু ব্যাপারে তা একের অধিক জবাবের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু নিয়ম- কানুন ও শাসনের মানবিক

অভিজ্ঞতার সকল ক্ষেত্রের ন্যায় যখন জানালা খুলে যায়, প্রত্যেকটি বিষয়ই তখন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। কোনো চিরন্তনতা, কোনো পূর্ণাঙ্গতা তখন অবশিষ্ট থাকে না। এ সময় চার্চ আমার কাছে একটি বিতর্কযোগ্য প্রশ্ন হয়ে উঠে। আমি এখনও আমার জীবনের কেন্দ্রশক্তি হিসেবে গসপল, খৃষ্ট এবং তার কিছু শিষ্যকে আঁকড়ে ধরে রয়েছি, কিন্তু চার্চ আমার কাছে আর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান নয়। আমি আর এর মধ্যে থাকতে পারি না।[৬]

সম্পূর্ণ অভ্রান্ত না হওয়া সত্ত্বেও চার্চের কর্তৃত্ব এখনও বিদ্যমান। যেসব চার্চ তাদের ওপর পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেছে, সেসব চার্চের মধ্যেও এর শিকড় ছড়ানো। যা হোক, আজ এই কর্তৃত্বের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এমন পর্যায়ে তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে যা পূর্বে কখনো হয় নি। জর্জ হ্যারিসনের ভাষায়:

আপনি যখন তরুণ ছিলেন তখন আপনার পিতা- মাতা কর্তৃক আপনি চার্চে নীত হয়েছিলেন এবং স্কুলে আপনাকে ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেগুলো আপনার মনে কিছু রেখাপাত করার চেষ্টা করছে। এর কারণ এই যে, কেউই চার্চে যায় না এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। কেন? কারণ তারা বাইবেলকে সেভাবে ব্যাখ্যা করে নি যেভাবে তা করা উচিৎ ছিল। আমি আসলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিনি, কারণ আমাকে সেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে শুধু বিশ্বাস লাভের জন্য, আপনার সে জন্য দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই, আমরা আপনাকে যা বলছি, আপনি শুধু তা বিশ্বাস করুন।[৭]

যীশুর বানীর অভিভাবকত্বের ব্যাপারে চার্চের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পূর্ণ গ্রহণ ও সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যানের দু'টি মেরুর মধ্যে একজন খৃষ্টান হওয়ার ব্যাপারে সকল মতামতের ছায়াপাত ঘটেছে। উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিত লিখেছেন:

আজকের খৃষ্টান চার্চের মধ্যে এত বেশি বৈপরীত্য ও সংঘাত, এত বেশি গোলযোগ যে খৃষ্টীয় সত্যের ঐক্যবদ্ধ অথবা পদ্ধতিগত পুরোনো আদর্শ বিদায় নিয়েছে। সে কারণে যাজক সম্প্রদায়ের ঐক্য আন্দোলনে অত্যন্ত দেরি হয়ে গেছে। যা ঘটেছে তা হলো খৃষ্টান জগৎ বিকল্প সুযোগের খোলাখুলি বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতির দিকে এগিয়েছে। মনে হয়, কারো পক্ষে আর এটা সম্ভব হবে না যে, তাকে আনুষ্ঠানিক ও সামগ্রিকভাবে খৃষ্টান হওয়ার কথা বলা হবে অথবা বলার কল্পনা করা হবে। তার নিজের জন্য তাকেই সিদ্ধান্ত দিতে হবে।[৮]

এ সিদ্ধান্ত থেকে এটাই বুঝা যায় যে, আজ যত খৃষ্টান আছে, খৃষ্টান ধর্মের তত রূপও আছে এবং যীশুর বাণীর অভিভাবক যে চার্চ, প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেই চার্চের ভূমিকা এখন বিপুলভাবে হ্রাস পেয়েছে। ইউ, সি. এল. এ (U. C. L. A)-এর একজন স্নাতক ছাত্রের প্রশ্ন: "যদি আমার জ্ঞানের ওপরই সবকিছু নির্ভর করে তাহলে চার্চের প্রয়োজনটা কি?"[৯]

যা হোক, চার্চ আজ পশ্চিমা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই বিদ্যমান এবং এ দুয়ের মধ্যকার সম্পর্ক এক কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়।

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্যে বিপুল পরিমাণ সাহিত্য রচিত হয়েছে। এর মধ্যে বহু গ্রন্থই

মানুষের যখন তার জীবন- যাপন ও জীবনোপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞানের নিশ্চয়তা থাকে না তখন সে যা খুঁজে ফেরে, সেই মানুষের মনের চিন্তার সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রের একটি চিত্র তুলে ধরে। কিছু কিছু লেখক যেমন পাসকাল (Pascal) উপলব্ধি করেছেন যে, মন একটি সীমাবদ্ধ যন্ত্র এবং হৃদয় হলো মানুষের সত্ত্বার কেন্দ্র এবং প্রকৃত জ্ঞানের আধার:

হৃদয়ের নিজস্ব যুক্তি আছে যা যুক্তির কাছে অপরিচিত। হৃদয়ই ঈশ্বর সম্পর্কে সচেতন, যুক্তি নয়। এটা হলো তাই, যাকে বিশ্বাস বলা হয়। ঈশ্বর হৃদয় দ্বারা উপলব্ধ হন, যুক্তি দ্বারা নয়।[১০]

হৃদয়ে প্রবেশ লাভের চেষ্টায় অনেকেই খৃষ্টান ধর্মকে প্রত্যাখ্যান এবং অন্য পন্থা নিয়ে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করেছেন:

অধ্যাত্মবাদী অভিজ্ঞতা বিশ্বজগৎ সম্পর্কে "সত্যের" প্রকৃত জ্ঞান লাভের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই সত্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, বরং তা উপলব্ধির বিষয়। এক্ষেত্রে মাধ্যম হতে পারে সংগীত, মাদক, ধ্যান....।[১১]

সত্য উপলব্ধির এই বিকল্প পন্থা পাশ্চাত্যে ব্যাপকভাবে জনগণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, প্রায়শই আত্মতুষ্টির পন্থা হিসেবে।

পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির এই নয়া ধারার সাথে চার্চ ব্যাপকভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। চার্চকে জনাকীর্ণ রাখতে কিছু যাজক তাদের কর্মসূচীতে পোপ গ্রুপ ও ডিসকোথেককে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাতে

তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করা যায়। কনসার্ট, প্রদর্শনী এবং রক্ষণশীলদের জন্য ব্যবস্থা করা হয় পুরোনো মালের সস্তা দরে বিক্রয়ের। দাতব্য সংস্থাগুলো চার্চগুলোর সাথে জড়িতদের জন্য একটি উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। চার্চকে "আধুনিকায়ন" করার এবং তাকে যুগোপযোগী রাখার নিরন্তর উদ্যোগ যে কোনো পন্থায় আপোস করার পলীয় চার্চের দীর্ঘকালের ঐতিহ্যেরই পরিচয় বহন করে। চার্চ যদি যীশুর বাণী প্রচার করতে নাও পারে, ন্যূনতম পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজক অবশ্যই হতে পারে।

এই আপোস প্রক্রিয়ার ফল হয়েছে বিশেষ করে গত দশকে সংস্কৃতিতে চার্চের অব্যাহত আত্মীকরণ এবং চার্চের পরিবর্তনশীল কাঠামোতে সংস্কৃতির পুনঃআত্মীকরণ। এটি হলো একটি দ্বি-মুখী প্রক্রিয়া যা পল ও তার অনুসারীগণ কর্তৃক শুরু হওয়ার পর থেকে সীমাহীনভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। সংগীত, মাদক ও ধ্যানের অভিজ্ঞতার ফলে বহু লোকই খৃষ্টান ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছে। তাদের প্রবণতা হলো হয় এসব অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান ও খৃষ্টানধর্মের গোঁড়া রূপটি গ্রহণ অথবা তাদের নতুন জীবন ধারাকে খৃষ্টানধর্মের তাদের নিজস্ব আধুনিকীকৃত রূপে অন্তর্ভুক্ত করা। এই উভয়ধারাই যীশুর নবীত্বকে ঢেকে ফেলেছে। তিনি হয় ঈশ্বর হিসেবে উন্নীত হয়েছেন অথবা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছেন। তিনি উত্তম ছিলেন, তবে তাকে ভুল বুঝা হয়েছে।

পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে চার্চের সম্পর্কের বিষয়টি একালে লোকেরা কীভাবে জীবন- যাপন করে তা লক্ষ্য করে দেখলেই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। যারা ঈশ্বরকে স্মরণ করার জন্য মঠ ও আশ্রমগুলোতে নিজেদের প্রত্যাহার করেছে তাদের ছাড়া যারা নিজেদের খৃষ্টান বলে আখ্যায়িত করে, তাদের জীবন যাত্রার সাথে যারা নিজেদের অজ্ঞবাদী (Agnostic), মানবতাবাদী বা নাস্তিক বলে দাবি করে, তাদের জীবন যাত্রার সাদৃশ্য রয়েছে। তাদের ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তাদের সাধারণ ব্যবহার বা আচরণে কোনো পার্থক্য নেই।

পাশ্চাত্যের খৃষ্টান দেশগুলোতে যে আইন বিদ্যমান, যেমন জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কিত আইন, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন, বিবাহিত জীবন ও বিবাহ জীবনের বাইরে সম্পত্তির অধিকার অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ ও মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনা, দত্তক গ্রহণ ও অভিভাবকত্ব, বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত আইন এসবের কোনোটিই গসপেলগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর কর্তৃক মানুষের কাছে যেসব আইন প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে, এগুলো সে আইন নয়। এগুলো হলো সিদ্ধান্তমূলক জ্ঞানের ফল। এগুলো হয় রোমান আইন ব্যবস্থা থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে এসেছে অথবা দীর্ঘকাল ধরে লোকের সাধারণ আচার- আচরণ তার ভিত্তি অথবা প্রাচীন গ্রীকদের প্রণীত বিধি যা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সংস্কার ও সংশোধন করা হয়েছে। একালের কোনো আদালতে কেউই কোনো লোকের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকালে উৎস হিসেবে গসপেলের কথা উল্লেখ করতে বা তা গ্রহণ করতে পারে না।

আজকের খৃষ্টান ধর্ম পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি থেকে অবিভাজ্য। খৃষ্টান চার্চ ও রাষ্ট্র এক। এসব প্রতিষ্ঠানে যেসব ব্যক্তি কাজ করেন তারা যীশুর ন্যায় জীবন- যাপন করেন না। খৃষ্টান ধর্মের সামগ্রিক অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে বলা যায় যে, আজকের দিনের খৃষ্টানদের মধ্যে সামাজিক আচরণ- জ্ঞানের অভাব রয়েছে এবং এই অভাব তাদেরকে এই জীবনে সদ্গুণ বর্জিত করেছে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের ঘটনার জন্য তাদের প্রস্তুত করে রেখেছে। উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিত লিখেছেন:

‘খৃষ্টান ধর্মকে সত্য ধর্ম বলা কোনো তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য নয়। একটিই মাত্র প্রশ্ন তাৎপর্যপূর্ণ যা ঈশ্বর অথবা আমাকে অথবা আমার প্রতিবেশীকে নিয়ে- আর তা হলো: আমার খৃষ্টান ধর্ম সত্য নাকি আপনারটি সত্য। এই প্রশ্নের ব্যাপারে, যা সত্যই এক বিশ্বজনীন প্রশ্ন, আমার কাছে এর একমাত্র বৈধ উত্তরটি হলো- খুব একটা না. ।[১২]

এতক্ষণের এই আলোচনার পর যে বিস্ময়কর ঘটনাটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো, বিশ্বের চার্চগুলো ক্রমশ: শূন্য হয়ে পড়েছে- আর ইসলাম ধর্মের মসজিদগুলো ক্রমশ: পূর্ণ হয়ে উঠছে।

## নবম অধ্যায়

## কুরআনে ঈসা আলাইহিস সালাম

মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন কর্তৃক বিশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাজিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল-কুরআন ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে জ্ঞানের একটি উৎস যা সাধারণভাবে অধিকাংশ খৃষ্টানেরই জানা নেই। কুরআন আমাদেরকে তার সম্পর্কে শুধু ভালোভাবে জানতেই সাহায্য করে না, উপরন্তু এই জানার মধ্য দিয়ে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাকেও বৃদ্ধি করে। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের প্রায় ৬শ' বছর পর নাজিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব কুরআন পাক তার জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা প্রদান করেছে। একত্ববাদীদের ধারণায় নবী জীবনের বিশাল প্রেক্ষাপট রয়েছে, কুরআন সেই প্রেক্ষাপটে ঈসা আলাইহিস সালামের ভূমিকাকে স্থাপন করেছে। প্রকৃতপক্ষে কুরআন তার সম্পর্কে যতটা জ্ঞাত করেছে, অন্য আর কোনো সূত্র তা পারে নি।

পবিত্র কুরআন ঈসা আলাইহিস সালামের জীবন-কাহিনীর বিশদ বর্ণনা প্রদান করে নি, বরং সুনির্দিষ্ট কিছু ঘটনা ব্যক্ত করেছে। তাকে যে অলৌকিক ক্ষমতা ও শক্তি দেওয়া হয়েছিল তার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ ভাষায়। অনুরূপভাবে আল্লাহ তার কাছে "ইনজিল" নামে যে আসমানি কিতাব নাযিল করেছিলেন বেশ কয়েকবার তার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু উক্ত কিতাবের সঠিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা হয় নি। যা হোক, তিনি কীভাবে পৃথিবীতে

আগমন করেন, তিনি কে ছিলেন, তিনি কী ছিলেন না এবং কীভাবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের পরিসমাপ্তি ঘটে এসব বিষয়ে কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার আগে পৃথিবীতে তার কাজ কী ছিল, তিনি কীভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন এবং তার পরে কী আসার কথা ছিল এসব বিষয় পরীক্ষা করে নিলে তার জীবন সম্পর্কে জানা সহজ হবে। একথা বারবার বলা হয়েছে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন পর্যায়ক্রমে আগত নবীগণের একজন যাকে পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন নবী যিনি তার পূর্বে আগত নবীদের নির্দেশনা ও শিক্ষাই পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন তার পরবর্তী নবীরই পূর্বসূরী।

কুরআনের একেবারে গোড়ার দিকেই ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে:

﴿وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ وَقَفَّيۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِۦ بِٱلرُّسُلِۖ وَءَاتَيۡنَا عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدۡنَٰهُ بِرُوحِ ٱلۡقُدُسِ﴾ [البقرة: ٨٧]

"এবং নিশ্চয় মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, মারইয়াম-পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি এবং 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৭]

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো বহু নবীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ঈসা আলাইহিস সালাম যাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে:

﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَۚ كُلًّا هَدَيْنَاۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۝٨٤ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ۝٨٥ وَإِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًاۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٨٦﴾ [الانعام: ٨٤، ٨٦]

“এবং তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম; পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও; আর এভাবেই সৎকর্ম পরায়ণদের পুরস্কৃত করি। এবং যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম, এরা সকলেই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৮৪-৮৬]

রাসূলগণের এ তালিকা কিন্তু এই-ই সম্পূর্ণ নয়। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে:

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَۚ﴾ [النساء: ١٦٤]

“অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা পূর্বে আমি তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলি নি।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৪]

হাদীস শরীফে আছে, নবীগণের সংখ্যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ১লাখ ২৪ হাজার। ঈসা আলাইহিস সালাম যে তাদের মধ্যে একজন এ নিয়ে কোনো বিরোধ বা বিতর্কের অবকাশ নেই। আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মজীদে বলেন,

﴿قُلۡ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ٨٤﴾ [ال عمران: ٨٤]

“বল, ‘আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রদান করা হয়েছে, তাতে ঈমান এনেছি। আমরা তাদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না এবং আমরা তার নিকট আত্মসমর্পণকারী।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৪]

সকল নবীই এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন যে, আল্লাহ তাদেরকে একই উদ্দেশ্যে ও একই বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন:

﴿وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ وَإِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۖ وَأَخَذۡنَا مِنۡهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٧ لِّيَسۡـَٔلَ ٱلصَّٰدِقِينَ عَن صِدۡقِهِمۡۚ وَأَعَدَّ لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمٗا ٨﴾ [الاحزاب: ٧، ٨]

“স্মরণ কর, যখন আমরা নবীদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট থেকেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারইয়াম-পুত্র ঈসার নিকট থেকেও। তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার; সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য। তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭-৮]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٥١ وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱتَّقُونِ ٥٢﴾ [المؤمنون: ٥١، ٥٢]

“হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত এবং তোমাদের এই যে জাতি- এতো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমাকে ভয় কর।” [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৫১-৫২]

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ﴾ [الشورا: ١٣]

“তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে, (আর যা আমরা অহী করেছি) তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা

দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং এতে মতভেদ কর না।” [সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১৩]

এসব আয়াতে এ গোলযোগপূর্ণ পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য স্মরণীয় একজন মানুষ হিসেবে ঈসা আলাইহিস সালামের আগমনের কথা বলা হয় নি, বরং বলা হয়েছে এমন একজন নবীর কথা যাকে প্রেরণ করা হয়েছিল তার সময় ও কালের জন্য, আর তা মহা সত্যের উন্মোচনের অংশ হিসেবেই:

﴿وَقَفَّيۡنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡإِنجِيلَ فِيهِ هُدٗى وَنُورٞ﴾ [المائدة: ٤٦]

“মারইয়াম পুত্র ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছিলাম এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাকে ইঞ্জিল দিয়েছিলাম, তাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৬]

উপরন্তু সময় সম্পর্কেও কুরআনে বলা হয়েছে, যে বিষয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তার আগে ও তার পরেও সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল:

﴿وَإِذۡ قَالَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُم مُّصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَمُبَشِّرَۢا بِرَسُولٖ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُۥٓ أَحۡمَدُۖ﴾ [الصف: ٦]

“স্মরণ কর, মারইয়াম পুত্র ঈসা বলেছিল: হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের

কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা।" [সূরা আস-সাফ, আয়াত: ৬]

ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন ও জন্ম সম্পর্কে কুরআনে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এখানে তার মায়ের জন্ম ও বেড়ে ওঠা বিষয় কুরআনে মাজীদে যা উল্লেখ হয়েছে তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে, কারণ যীশুর ভবিষ্যৎ মাতা হিসেবে আল্লাহর ইচ্ছায় তার জন্ম ও কীভাবে তিনি নির্বাচিত হন তা জানতে সহায়ক হবে:

﴿إِذۡ قَالَتِ ٱمۡرَأَتُ عِمۡرَٰنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرۡتُ لَكَ مَا فِي بَطۡنِي مُحَرَّرٗا فَتَقَبَّلۡ مِنِّيٓۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٣٥ فَلَمَّا وَضَعَتۡهَا قَالَتۡ رَبِّ إِنِّي وَضَعۡتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا وَضَعَتۡ وَلَيۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ وَإِنِّي سَمَّيۡتُهَا مَرۡيَمَ وَإِنِّيٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ٣٦ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٖ وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنٗا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّاۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيۡهَا زَكَرِيَّا ٱلۡمِحۡرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزۡقٗاۖ قَالَ يَٰمَرۡيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَاۖ قَالَتۡ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ ٣٧ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥۖ قَالَ رَبِّ هَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةٗ طَيِّبَةًۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٣٨ فَنَادَتۡهُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٞ يُصَلِّي فِي ٱلۡمِحۡرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحۡيَىٰ مُصَدِّقَۢا بِكَلِمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدٗا وَحَصُورٗا وَنَبِيّٗا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٣٩ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٞ وَقَدۡ بَلَغَنِيَ ٱلۡكِبَرُ وَٱمۡرَأَتِي عَاقِرٞۖ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ ٤٠ قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةٗۖ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمۡزٗاۗ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ كَثِيرٗا وَسَبِّحۡ بِٱلۡعَشِيِّ وَٱلۡإِبۡكَٰرِ ٤١﴾ [آل عمران: ٣٥، ٤١]

“স্মরণ কর, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার কাছ থেকে তা কবুল কর, তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’ তারপর যখন সে তাকে প্রসব করল, তখন সে বলল, ‘হে আল্লাহ আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করেছি।’ সে যা প্রসব করেছে আল্লাহ তা সম্যক অবগত। ‘ছেলে তো মেয়ের মতো নয়, আমি তার নাম মারইয়াম রেখেছি।’ ‘এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার স্মরণ গ্রহণ করছি।’ তারপর তার রব তাকে সাগ্রহে কবুল করলেন এবং তাকে উত্তমরূপে লালন পালন করলেন এবং তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। যখনই যাকারিয়া কক্ষে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যেত তখনি তার কাছে খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত ‘হে মারইয়াম! এসব তুমি কোথায় পেলে? সে বলত- ‘আল্লাহর কাছ থেকে।’ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন। সেখানেই যাকারিয়া তার রবের কাছে প্রার্থনা করে বলল- ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার কাছ থেকে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।’ যখন যাকারিয়া কক্ষে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন তখন ফিরিশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বলল, ‘আল্লাহ তোমাকে ইয়াহয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রী বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী।’ সে বলল, ‘হে আমার রব! আমার পুত্র হবে কীভাবে? আমার তো বার্ধক্য এসেছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা।’ তিনি বললেন- ‘ এভাবেই।’ আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। সে বলল- ‘হে আমার রব!

আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বললেন, ' তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইঙ্গিত ব্যতীত কথা বলতে পারবে না। আর তোমার রবকে অধিক স্মরণ করবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩৫-৪১]

ঈসা আলাইহিস সালামের ঠিক আগের নবী ছিলেন ইয়াহয়া আলাইহিস সালাম। 'সূরা মারইয়াম'- এ নবী ইয়াহইয়ার অলৌকিক জন্মগ্রহণের উল্লেখ করা হয়েছে:

﴿ذِكۡرُ رَحۡمَتِ رَبِّكَ عَبۡدَهُۥ زَكَرِيَّآ ٢ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيّٗا ٣ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلۡعَظۡمُ مِنِّي وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّأۡسُ شَيۡبٗا وَلَمۡ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيّٗا ٤ وَإِنِّي خِفۡتُ ٱلۡمَوَٰلِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمۡرَأَتِي عَاقِرٗا فَهَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا ٥ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنۡ ءَالِ يَعۡقُوبَۖ وَٱجۡعَلۡهُ رَبِّ رَضِيّٗا ٦ يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ٱسۡمُهُۥ يَحۡيَىٰ لَمۡ نَجۡعَل لَّهُۥ مِن قَبۡلُ سَمِيّٗا ٧ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٞ وَكَانَتِ ٱمۡرَأَتِي عَاقِرٗا وَقَدۡ بَلَغۡتُ مِنَ ٱلۡكِبَرِ عِتِيّٗا ٨ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٞ وَقَدۡ خَلَقۡتُكَ مِن قَبۡلُ وَلَمۡ تَكُ شَيۡـٔٗا ٩ قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةٗۖ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَ لَيَالٖ سَوِيّٗا ١٠ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوۡمِهِۦ مِنَ ٱلۡمِحۡرَابِ فَأَوۡحَىٰٓ إِلَيۡهِمۡ أَن سَبِّحُواْ بُكۡرَةٗ وَعَشِيّٗا ١١ يَٰيَحۡيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَٰبَ بِقُوَّةٖۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡحُكۡمَ صَبِيّٗا ١٢ وَحَنَانٗا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةٗۖ وَكَانَ تَقِيّٗا ١٣ وَبَرَّۢا بِوَٰلِدَيۡهِ وَلَمۡ يَكُن جَبَّارًا عَصِيّٗا ١٤ وَسَلَٰمٌ عَلَيۡهِ يَوۡمَ وُلِدَ وَيَوۡمَ يَمُوتُ وَيَوۡمَ يُبۡعَثُ حَيّٗا ١٥﴾ [مريم: ٢، ١٥]

"এটি তোমার রবের অনুগ্রহের বিবরণ তার বান্দা যাকারিয়ার প্রতি যখন সে তার রবকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে যে, বলেছিল, 'আমার

অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শোভিত ধূসর চুলে, হে আমার রব! আমি কখনো তোমার প্রার্থনা করে বিফল হইনি।' আমি আশঙ্কা করি আমার পর আমার সগোত্রীয়দের সম্পর্কে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং তুমি তোমার নিকট থেকে দান কর উত্তরাধিকারী, যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে তুমি কর সন্তোষভাজন।' তিনি বললেন হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি তার নাম হবে ইয়াহয়া, এ নামে আমি আগে কারো নামকরণ করি নি।' সে বলল, 'হে আমার রব! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত?' তিনি বললেন: 'এরূপই হবে।' তোমার প্রতিপালক বললেন, 'এটা আমার জন্য সহজ, আমি তো এর আগে তোমাকেও সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলেন না।' যাকারিয়া বলল, 'হে আমার রব! আমাকে একটি নির্দেশন দাও।' তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিন দিন কারো সাথে কোনো বাক্যালাপ করবে না।' এরপর সে তার ঘর থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল- সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বলল। আমি বলিলাম, 'হে ইয়াহইয়া! এই কিতাব দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর। আমি শৈশবেই তাকে দান করেছিলাম জ্ঞান এবং আমার নিকট থেকে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা এবং সে ছিল মুত্তাকী, পিতা- মাতার অনুগত। সে ছিল না উদ্ধত ও অবাধ্য। তার প্রতি ছিল শান্তি যে দিন সে জন্মগ্রহণ

করে, শান্তি থাকবে যে দিন তার মৃত্যু হবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ২-১৫]

পবিত্র কুরআনে দু’টি স্থানে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম গ্রহণের প্রসঙ্গে আছে:

﴿وَإِذۡ قَالَتِ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرۡيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصۡطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٤٢﴾ يَٰمَرۡيَمُ ٱقۡنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسۡجُدِي وَٱرۡكَعِي مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ذَٰلِكَ مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡغَيۡبِ نُوحِيهِ إِلَيۡكَۚ وَمَا كُنتَ لَدَيۡهِمۡ إِذۡ يُلۡقُونَ أَقۡلَٰمَهُمۡ أَيُّهُمۡ يَكۡفُلُ مَرۡيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيۡهِمۡ إِذۡ يَخۡتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾ إِذۡ قَالَتِ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرۡيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٖ مِّنۡهُ ٱسۡمُهُ ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ وَجِيهٗا فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَمِنَ ٱلۡمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلۡمَهۡدِ وَكَهۡلٗا وَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَتۡ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٞ وَلَمۡ يَمۡسَسۡنِي بَشَرٞۖ قَالَ كَذَٰلِكِ ٱللَّهُ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾ وَيُعَلِّمُهُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنِّي قَدۡ جِئۡتُكُم بِـَٔايَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ أَنِّيٓ أَخۡلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيۡـَٔةِ ٱلطَّيۡرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيۡرَۢا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۖ وَأُبۡرِئُ ٱلۡأَكۡمَهَ وَٱلۡأَبۡرَصَ وَأُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأۡكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعۡضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيۡكُمۡۚ وَجِئۡتُكُم بِـَٔايَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٥٠﴾ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُوهُۚ هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ ﴿٥١﴾ ۞فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنۡهُمُ ٱلۡكُفۡرَ قَالَ مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِۖ قَالَ ٱلۡحَوَارِيُّونَ نَحۡنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّا

مُسۡلِمُونَ ۝٥٢ رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلۡتَ وَٱتَّبَعۡنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ۝٥٣﴾

[ال عمران: ٤٢، ٥٣]

স্মরণ কর, যখন ফিরিশতাগণ বলেছিল, ‘হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন।’ ‘হে মারইয়াম! তোমার রবের অনুগত হও ও সাজদাহ কর এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর।’ ‘এটি অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ যা তোমাকে ওহি দ্বারা অবহিত করছি। মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে এ নিয়ে যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল তুমি তখন তাদের নিকট ছিলে না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না। স্মরণ কর, যখন ফেরশতাগণ বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে তার পক্ষ হতে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম মসীহ, মারইয়াম পুত্র ঈসা। সে ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত হবে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্যতম হবে।’ ‘সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।’ সে বলল, ‘ হে আমার রব! আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করে নি, আমার সন্তান হবে কীভাবে?’ তিনি বললেন, ‘এভাবেই।’ আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, ‘হও!’ এবং তা হয়ে যায়। এবং তিনি তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল করবেন। সে বলবে, আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নির্দশন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি

দিয়ে একটি পাখি সদৃশ আকৃতি তৈরি করব, তারপর আমি তাতে ফুঁ দেব এবং আল্লাহর হুকুমে তা পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীদের নিরাময় করব এবং আল্লাহর হুকুমে মৃতদের জীবিত করব। তোমরা তোমাদের ঘরে যা আহার কর ও মজুদ কর তা তোমাদের বলে দেব। তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তাহলে এর মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে। আমি এসেছি আমার সম্মুখে তাওরাতে যা রয়েছে তার সমর্থকরূপে এবং তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল তার কতকগুোকে বৈধ করতে। আমি তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব সুতরাং তোমরা তার ইবাদত করবে। এটাই সরল পথ। যখন ঈসা তাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করল তখন সে বলল, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী? শিষ্যগণ বলল, আল্লাহর পথে আমরাই সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহতে ঈমান এনেছি। তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী। ‘হে আমাদের রব! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ তাতে আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা এই রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদের সত্যের পথে সাক্ষ্য বহনকারীদের তালিকাভুক্ত কর।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৪২-৫৩]

সূরা মারইয়ামেও এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে:

﴿وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَرۡيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتۡ مِنۡ أَهۡلِهَا مَكَانٗا شَرۡقِيّٗا ١٦ فَٱتَّخَذَتۡ مِن دُونِهِمۡ حِجَابٗا فَأَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٗا سَوِيّٗا ١٧ قَالَتۡ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحۡمَٰنِ مِنكَ

إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتۡ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٞ وَلَمۡ يَمۡسَسۡنِي بَشَرٞ وَلَمۡ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٞۖ وَلِنَجۡعَلَهُۥٓ ءَايَةٗ لِّلنَّاسِ وَرَحۡمَةٗ مِّنَّاۚ وَكَانَ أَمۡرٗا مَّقۡضِيًّا ﴿٢١﴾ ۞فَحَمَلَتۡهُ فَٱنتَبَذَتۡ بِهِۦ مَكَانٗا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَأَجَآءَهَا ٱلۡمَخَاضُ إِلَىٰ جِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ قَالَتۡ يَٰلَيۡتَنِي مِتُّ قَبۡلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسۡيٗا مَّنسِيّٗا ﴿٢٣﴾ فَنَادَىٰهَا مِن تَحۡتِهَآ أَلَّا تَحۡزَنِي قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِيّٗا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّيٓ إِلَيۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ تُسَٰقِطۡ عَلَيۡكِ رُطَبٗا جَنِيّٗا ﴿٢٥﴾ فَكُلِي وَٱشۡرَبِي وَقَرِّي عَيۡنٗاۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدٗا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمَٰنِ صَوۡمٗا فَلَنۡ أُكَلِّمَ ٱلۡيَوۡمَ إِنسِيّٗا ﴿٢٦﴾ فَأَتَتۡ بِهِۦ قَوۡمَهَا تَحۡمِلُهُۥۖ قَالُواْ يَٰمَرۡيَمُ لَقَدۡ جِئۡتِ شَيۡـٔٗا فَرِيّٗا ﴿٢٧﴾ يَٰٓأُخۡتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡءٖ وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِيّٗا ﴿٢٨﴾ فَأَشَارَتۡ إِلَيۡهِۖ قَالُواْ كَيۡفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلۡمَهۡدِ صَبِيّٗا ﴿٢٩﴾ قَالَ إِنِّي عَبۡدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلۡكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيّٗا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيۡنَ مَا كُنتُ وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا ﴿٣١﴾ وَبَرَّۢا بِوَٰلِدَتِي وَلَمۡ يَجۡعَلۡنِي جَبَّارٗا شَقِيّٗا ﴿٣٢﴾ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَيَّ يَوۡمَ وُلِدتُّ وَيَوۡمَ أَمُوتُ وَيَوۡمَ أُبۡعَثُ حَيّٗا ﴿٣٣﴾ ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖ قَوۡلَ ٱلۡحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمۡتَرُونَ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٖۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُوهُۚ هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ ﴿٣٦﴾﴾ [مريم: ١٦، ٣٦]

“বর্ণনা কর, এই কিতাবে উল্লিখিত মারইয়ামের কথা, যখন সে তার পরিবার বর্গ থেকে পৃথক হয়ে নিভৃতে পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিল, তারপর তাদের কাছ থেকে সে পর্দা করল। এরপর আমি তার কাছে আমার রূহকে (জিবরীল) পাঠালাম, সে তার কাছে পূর্ণ মানুষ আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মারইয়াম বলল: তুমি যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে আমি তোমার কাছ থেকে দয়াময়ের আশ্রয় গ্রহণ করছি। সে বলল,

আমি তো কেবল তোমার রব- প্রেরিত, আমি এসেছি তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য। মারইয়াম বলল, ‘কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করে নি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই।’ সে বলল, ‘এভাবেই হবে।’ তোমার প্রতিপালক বলেছেন, ‘ এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি তাকে এ জন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার কাছ থেকে এক অনুগ্রহ। এতো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।’ তারপর সে তাকে গর্ভে ধরল, পরে তাকে গর্ভে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল, ‘হায়, এর আগে যদি আমি মারা যেতাম আর যদি লোকের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতাম!’ তখন তার নীচের দিক থেকে ফিরিশতা তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘তুমি দুঃখ কর না, তোমার পদতলে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন, তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড তোমার দিকে নাড়া দাও, এর ফলে তোমার ওপর পাকা খেজুর পতিত হবে। সুতরাং তুমি খাও, পান কর ও চক্ষু জুড়াও। তোমার সাথে যদি কোনো মানুষের সাক্ষাৎ হয়, তাকে বল যে, আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সাথে কথা- বার্তা বলব না। তারপর সে তার পুত্রকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলো। তারা বলল, ‘ হে মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছ! হে হারুণের বোন, তোমার পিতা অসৎ লোক ছিল না এবং তোমার মাও ছিল না ব্যভিচারিণী। তারপর মারইয়াম তার সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করল। তারা

বলল, ‘যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব?’ সে বলল, ‘আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে। আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নি। আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব।’ এই-ই ছিল মারইয়াম পুত্র ঈসা। আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়, তিনি পবিত্র মহিমাময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, ‘হও’ এবং তা হয়ে যায়। আল্লাহই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের রব সুতরাং তোমরা তার ইবাদত কর; এটাই সরল পথ।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ১৬-৩৬]

ঈসা আলাইহিস সালাম যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, কুরআনের একটি আয়াতে তার উল্লেখ করা হয়েছে:

﴿وَجَعَلۡنَا ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةٗ وَءَاوَيۡنَٰهُمَآ إِلَىٰ رَبۡوَةٖ ذَاتِ قَرَارٖ وَمَعِينٖ ٥٠﴾ [المؤمنون: ٥٠]

“এবং আমরা মারইয়াম পুত্র ও তার জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন, তাদের আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ বিশিষ্ট উঁচু ভূমিতে।” [সূরা আর-মুমিনূন, আয়াত: ৫০]

ঈসার আলাইহিস সালাম শৈশব ও কৈশোর সম্পর্কে কুরআনে কিছু উল্লেখ করা হয় নি। তবে যারা তার শিষ্য হয়েছিলেন তারা তার আহবানে কীভাবে সাড়া দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ لِلۡحَوَارِيِّـۧنَ مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِۖ قَالَ ٱلۡحَوَارِيُّونَ نَحۡنُ أَنصَارُ ٱللَّهِۖ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٞ مِّنۢ بَنِيٓ إِسۡرَـٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٞ﴾ [الصف: ١٤]

“হে মুমিনগণ! আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হও। যেমন, মারইয়াম পুত্র ঈসা বলেছিল তার শিষ্যগণকে- ‘আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে?’ শিষ্যগণ বলেছিল, ‘আমরাই তো আল্লাহর পথে সাহায্যকারী।’ এরপর বনী ইসরাইলদের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফুরী করল।” [সূরা আস-সফ, আয়াত: ১৪]

পুনরায় আরো বিশদভাবে উল্লেখ রয়েছে:

﴿وَإِذۡ أَوۡحَيۡتُ إِلَى ٱلۡحَوَارِيِّـۧنَ أَنۡ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّنَا مُسۡلِمُونَ ١١١ إِذۡ قَالَ ٱلۡحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ هَلۡ يَسۡتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيۡنَا مَآئِدَةٗ مِّنَ ٱلسَّمَآءِۖ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ١١٢ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأۡكُلَ مِنۡهَا وَتَطۡمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعۡلَمَ أَن قَدۡ صَدَقۡتَنَا وَنَكُونَ عَلَيۡهَا مِنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ١١٣ قَالَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلۡ عَلَيۡنَا مَآئِدَةٗ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدٗا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةٗ مِّنكَۖ وَٱرۡزُقۡنَا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّـٰزِقِينَ ١١٤ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيۡكُمۡۖ فَمَن يَكۡفُرۡ بَعۡدُ مِنكُمۡ فَإِنِّيٓ أُعَذِّبُهُۥ عَذَابٗا لَّآ أُعَذِّبُهُۥٓ أَحَدٗا مِّنَ ٱلۡعَـٰلَمِينَ ١١٥﴾ [المائدة: ١١١، ١١٥]

“আরও স্মরণ কর আমি যখন হাওয়ারীদিগকে এই আদেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তারা বলেছিল, আমরা ঈমান আনলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা তো মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী)। স্মরণ কর, হাওয়ারীগণ বলেছিল, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ প্রেরণ করতে সক্ষম। সে বলেছিল, ‘আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মোমিন হও।’ তারা বলেছিল, আমরা চাই যে তা থেকে আহার করি এবং এতে আমাদের মন সন্তুষ্ট হবে। আর আমরা জানতে চাই যে তুমি আমাদের কাছে সত্য বলেছ এবং আমরা তার সাক্ষী থাকতে চাই।’ মারইয়াম পুত্র ঈসা বলল, ‘হে আল্লাহ, আমাদের রব! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর, তা হবে আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য আনন্দোৎসবস্বরূপ ও তোমার নিকট থেকে নিদর্শন। আমাদের জীবিকা দান কর, আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। আল্লাহ বললেন, আমি তোমাদের কাছে তা প্রেরণ করব, কিন্তু তারপর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরি করলে তাকে এমন শাস্তি প্রদান করব যে শাস্তি বিশ্ব- জগতের অন্য কোনো সৃষ্টিকে আমি দিব না।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ১১১-১১৫]

ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা যখন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল, তখন কিছু লোক তা গ্রহণ করল, কিছু লোক করল না:

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوۡمُكَ مِنۡهُ يَصِدُّونَ ۝٥٧ وَقَالُوٓاْ ءَأَٰلِهَتُنَا خَيۡرٌ أَمۡ هُوَۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَۢاۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُونَ ۝٥٨ إِنۡ هُوَ إِلَّا عَبۡدٌ أَنۡعَمۡنَا عَلَيۡهِ وَجَعَلۡنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ۝٥٩﴾ [الزخرف: ٥٧، ٥٩]

“যখন মারইয়াম পুত্রের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় তাতে শোরগোল শুরু করে দেয় এবং বলে, ‘আমাদের উপাস্যগুলো শ্রেষ্ঠ না ঈসা? তারা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই আমাকে একথা বলে। বস্তুত তারা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়। সে তো ছিল আমারই এক বান্দা যাকে আমরা অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৫৭-৫৯]

﴿ قَفَّيۡنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيۡنَا بِعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَ وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡإِنجِيلَۖ وَجَعَلۡنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأۡفَةً وَرَحۡمَةًۚ وَرَهۡبَانِيَّةً ٱبۡتَدَعُوهَا مَا كَتَبۡنَٰهَا عَلَيۡهِمۡ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ رِضۡوَٰنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوۡهَا حَقَّ رِعَايَتِهَاۖ فَـَٔاتَيۡنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۡهُمۡ أَجۡرَهُمۡۖ وَكَثِيرٌ مِّنۡهُمۡ فَٰسِقُونَ ۝٢٧﴾ [الحديد: ٢٧]

“..... আমরা তাদের পশ্চাতে অনুগামী করেছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারইয়াম পুত্র ঈসাকে, আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া; আর সন্ন্যাসবাদ- সেতো আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই তারা এর প্রবর্তন করেছিল, আমরা এ বিধান তাদের দেই নি, অথচ তাও তারা যথাযথভাবে পালন করে নি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল

তাদের আমরা দিয়েছিলাম পুরস্কার, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্য ত্যাগী।” [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২৭]

তিনি যে বাণী বহন করেছিলেন তা ছিল সহজ ও সরল:

﴿وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ قَالَ قَدۡ جِئۡتُكُم بِٱلۡحِكۡمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعۡضَ ٱلَّذِي تَخۡتَلِفُونَ فِيهِۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٦٣ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُوهُۚ هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ ٦٤﴾ [الزخرف: ٦٣، ٦٤]

“ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ এল, সে বলেছিল, ‘আমি তো তোমাদের নিকট এসেছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। আল্লাহই তো আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও রব। অতএব, তার ইবাদত কর, এটাই সরল পথ।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৬৩-৬৪]

তাঁর অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা আবার উল্লেখ করা হয়েছে:

﴿إِذۡ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱذۡكُرۡ نِعۡمَتِي عَلَيۡكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذۡ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلۡقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلۡمَهۡدِ وَكَهۡلٗاۖ وَإِذۡ عَلَّمۡتُكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَۖ وَإِذۡ تَخۡلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيۡـَٔةِ ٱلطَّيۡرِ بِإِذۡنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيۡرَۢا بِإِذۡنِيۖ وَتُبۡرِئُ ٱلۡأَكۡمَهَ وَٱلۡأَبۡرَصَ بِإِذۡنِيۖ وَإِذۡ تُخۡرِجُ ٱلۡمَوۡتَىٰ بِإِذۡنِيۖ وَإِذۡ كَفَفۡتُ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذۡ جِئۡتَهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ مُّبِينٞ ١١٠﴾

[المائدة: ١١٠]

“স্মরণ কর, আল্লাহ বললেন, ‘হে মরিয়াম পুত্র ঈসা, তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর: পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থাও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতে; তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজিল শিক্ষা দিয়েছিলাম, তুমি কাদামাটি দিয়ে আমার অনুমতিক্রমে পাখি সদৃশ আকৃতি গঠন ও তাতে ফুঁ দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় ও আমার অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবিত করতে; আমি তোমার ক্ষতি করা থেকে বনী ইসলাইলকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম; তুমি যখন তাদের মধ্যে স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল, তারা বলেছিল- এতো স্পষ্ট যাদু।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ১১০]

ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মগ্রহণকালীন পরিস্থিতির কারণে একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তিনি ‘আল্লাহর পুত্র।’ কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدٗاۗ سُبۡحَٰنَهُۥۖ هُوَ ٱلۡغَنِيُّۖ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ إِنۡ عِندَكُم مِّن سُلۡطَٰنِۭ بِهَٰذَآۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٦٨﴾ [يونس: ٦٨]

“তারা বলে, ‘আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ তিনি মহান পবিত্র। তিনি অভাবমুক্ত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা তারই। এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোনো সনদ নেই। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলছ যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই?” [সূরা ইউনূস, আয়াত: ৬৮]

﴿إِذۡ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوۡقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ فِيمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ٥٥ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمۡ عَذَابٗا شَدِيدٗا فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ٥٦ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥٧ ذَٰلِكَ نَتۡلُوهُ عَلَيۡكَ مِنَ ٱلۡأٓيَٰتِ وَٱلذِّكۡرِ ٱلۡحَكِيمِ ٥٨ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٖ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٥٩﴾ [ال عمران: ٥٥، ٥٩]

“.... স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন: ‘হে ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করছি এবং আমার কাছে তোমাকে তুলে নিচ্ছি এবং যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের মধ্য থেকে তোমাকে পবিত্র (মুক্ত) করছি। আর তোমার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের ওপর প্রাধান্য দান করছি, এরপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।’ তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটছে তা আমি মীমাংসা করে দেব। যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে আমি তাদেরকে দুনিয়ায় ও আখরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকার্য করেছে তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরি প্রদান করবেন। আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না। যা আমি তোমার নিকট তিলাওয়াত করছি তা নিদর্শন ও সারগর্ভ বাণী থেকে। আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর তাকে বলেছিলেন, ‘হও’, ফলে সে হয়ে গেল।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৫-৫৯]

﴿وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدٗاۗ سُبۡحَٰنَهُۥۖ بَل لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ كُلّٞ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ ١١٦ بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ١١٧﴾ [البقرة: ١١٦، ١١٧]

"এবং তারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন' তিনি অতি পবিত্র। বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। সবকিছু তারই একান্ত অনুগত। আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন, 'হও'. আর তা হয়ে যায়।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১১৬-১৭]

﴿وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدٗاۗ سُبۡحَٰنَهُۥۚ بَلۡ عِبَادٞ مُّكۡرَمُونَ ٢٦ لَا يَسۡبِقُونَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ وَهُم بِأَمۡرِهِۦ يَعۡمَلُونَ ٢٧ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ وَهُم مِّنۡ خَشۡيَتِهِۦ مُشۡفِقُونَ ٢٨ ۞وَمَن يَقُلۡ مِنۡهُمۡ إِنِّيٓ إِلَٰهٞ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجۡزِيهِ جَهَنَّمَۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٩﴾ [الانبياء: ٢٦، ٢٩]

"তারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র, মহান। তারা তো তার সম্মানিত বান্দা। তারা আগ বাড়িয়ে কথা বলে না, তারা তো তার আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সামনে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং যারা তার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে, 'আমি ইলাহ্, তিনি ব্যতীত', তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম; এভাবেই আমরা যালিমদের শাস্তি দিয়ে থাকি।" [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৬-২৯]

﴿وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدٗا ۝٨٨ لَّقَدۡ جِئۡتُمۡ شَيۡـًٔا إِدّٗا ۝٨٩ تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِنۡهُ وَتَنشَقُّ ٱلۡأَرۡضُ وَتَخِرُّ ٱلۡجِبَالُ هَدًّا ۝٩٠ أَن دَعَوۡاْ لِلرَّحۡمَٰنِ وَلَدٗا ۝٩١ وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝٩٢ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا ۝٩٣﴾ [مريم: ٨٨، ٩٣]

“তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে ও পর্বতমালা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই সে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৮৮-৯৩]

কুরআন ঈসা আলাইহিস সালামের ইলাহ হওয়া অস্বীকার করেছে:

﴿لَّقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَۚ قُلۡ فَمَن يَمۡلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔا إِنۡ أَرَادَ أَن يُهۡلِكَ ٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗاۗ وَلِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَاۚ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ۝١٧﴾ [المائدة: ١٧]

“যারা বলে, ‘মারইয়াম পুত্র মসীহই আল্লাহ’ তারা তো কুফুরী করেছে। বল, আল্লাহ মারইয়াম পুত্র মসীহ, তার মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁকে বাধা দেয়ার শক্তি কার আছে? আসমান ও জমিনের এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার

সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।” [সূরা আর-মায়েদাহ, আয়াত: ১৭]

﴿وَإِذۡ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ءَأَنتَ قُلۡتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيۡنِ مِن دُونِ ٱللَّهِۖ قَالَ سُبۡحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنۡ أَقُولَ مَا لَيۡسَ لِي بِحَقٍّۚ إِن كُنتُ قُلۡتُهُۥ فَقَدۡ عَلِمۡتَهُۥۚ تَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِي وَلَآ أَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِكَۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلۡغُيُوبِ ١١٦ مَا قُلۡتُ لَهُمۡ إِلَّا مَآ أَمَرۡتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمۡۚ وَكُنتُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّا دُمۡتُ فِيهِمۡۖ فَلَمَّا تَوَفَّيۡتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيۡهِمۡۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ ١١٧﴾ [المائدة: ١١٦، ١١٧]

“আল্লাহ যখন বলবেন, ‘হে মারইয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদের বলছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর?’ সে বলবে, ‘তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম তবে তুমি তো তা জানতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নই, তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তুমি আমাকে যে আদেশ করেছ তা ব্যতীত আমি কিছুই বলিনি। আমি তাদের বলেছি: ‘তোমরা আমার ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর’; এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমি সর্ব বিষয়ে সাক্ষী। তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও

তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা কর তবে তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আল-মায়েদাহ: ১১৬-১১৮]

﴿وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ عُزَيۡرٌ ٱبۡنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَى ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ ٱللَّهِۖ ذَٰلِكَ قَوۡلُهُم بِأَفۡوَٰهِهِمۡۖ يُضَٰهِـُٔونَ قَوۡلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبۡلُۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُۖ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٣٠ ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٣١ يُرِيدُونَ أَن يُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَيَأۡبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٣٢﴾ [التوبة: ٣٠، ٣٢]

ইয়াহূদীরা বলে, ‘উযাইর (Ezra) আল্লাহর পুত্র’ এবং খৃষ্টানরা বলে, ‘মসীহ আল্লাহর পুত্র।’ এগুলো তাদের মুখের কথা। আগে যারা কুফরি করেছিল তারা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। তারা কেমন করে সত্য বিমুখ হয়! তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার বিরাগীগণকে তাদের প্রভূ (হুকুমের মালিক) রূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম পুত্র মসীহকেও। কিন্তু তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তারা যাকে তার শরিক করে তা হতে তিনি কত পবিত্র! তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নির্বাপিত করতে চায়। কাফিরগণ অপ্রীতিকরণ মনে করলেও আল্লাহ তার জ্যোতির পূর্ণ উদভাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩০-৩২]

কুরআন ত্রিত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে:

﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ إِنَّمَا ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلۡقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرۡيَمَ وَرُوحٞ مِّنۡهُۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۖ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَٰثَةٌۚ ٱنتَهُواْ خَيۡرٗا لَّكُمۡۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٞۘ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا ١٧١ لَّن يَسۡتَنكِفَ ٱلۡمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبۡدٗا لِّلَّهِ وَلَا ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ ٱلۡمُقَرَّبُونَۚ وَمَن يَسۡتَنكِفۡ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَيَسۡتَكۡبِرۡ فَسَيَحۡشُرُهُمۡ إِلَيۡهِ جَمِيعٗا ١٧٢ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضۡلِهِۦۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡتَنكَفُواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا ١٧٣﴾ [النساء: ١٧١، ١٧٣]

“হে কিতাবিগণ! দীনের ব্যাপারে বাড়বাড়ি কর না ও আল্লাহর সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বল না। মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহর রাসূল এবং তার বাণী যা তিনি মারইয়ামের কাছে প্রেরণ করেছিলেন ও তার আদেশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং ‘তিন’ বলো না- নিবৃত্ত হও, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহ তো একমাত্র ইলাহ। তার সন্তান হবে- তিনি এ থেকে পবিত্র। আসমানে যা কিছু আছে ও জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। কর্ম-বিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। মসীহ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও নয়; কেউ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করলে এবং অহংকার করলে তিনি তাদের সকলকে তার কাছে একত্র করবেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তিনি তাদেরকে পূর্ণ পুরস্কার দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশি দেবেন; কিন্তু যারা হেয় জ্ঞান করে ও অহংকার করে তাদের তিনি মর্মন্তুদ শাস্তিদান

করবেন এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের জন্য তারা কোনো অভিভাবক ও সহায় পাবে না।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৭১-১৭৩]

কুরআন ঈসা আলাইহিস সালামের ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার দাবি প্রত্যাখ্যান করে, পক্ষান্তরে সমর্থন করে তার ঊর্ধ্বারোহণকে:

﴿وَقَوۡلِهِمۡ إِنَّا قَتَلۡنَا ٱلۡمَسِيحَ عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمۡۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكّٖ مِّنۡهُۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَۢا ١٥٧ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيۡهِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمٗا ١٥٨﴾ [النساء: ١٥٧، ١٥٨]

“আর ‘আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি’ তাদের এ উক্তির জন্য তারা লা‘নতগ্রস্ত। অথচ তারা তাকে হত্যাও করে নি, ক্রুশবিদ্ধও করে নি, কিন্তু তাদের এ রকম বিভ্রম হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল তারা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমান করা ছাড়া তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করে নি। বরং আল্লাহ তাকে তার নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী; প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৫৭-১৫৮]

চূড়ান্তভাবে:

﴿لَقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖ وَقَالَ ٱلۡمَسِيحُ يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمۡۖ إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢ لَّقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٖۘ وَمَا مِنۡ

إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۚ وَإِن لَّمۡ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٣ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسۡتَغۡفِرُونَهُۥۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٧٤ مَّا ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ إِلَّا رَسُولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٞۖ كَانَا يَأۡكُلَانِ ٱلطَّعَامَۗ ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ ثُمَّ ٱنظُرۡ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٧٥﴾ [المائدة: ٧٢، ٧٥]

“যারা বলে, ‘আল্লাহই মারইয়াম পুত্র মসীহ’, তারা তো কুফুরী করেছেই; অথচ মসীহ বলেছিল, ‘হে বনী ইসরাইল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর।’ কেউ আল্লাহর শরিক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করবেন ও তার আবাস জাহান্নাম। জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। যারা বলে, ‘আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন; তারা তো কুফরি করেছেই; যদিও এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তারা যা বলে তা থেকে নিবৃত্ত না হলে তাদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তাদের ওপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবেই। তবে কি তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না ও তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মারইয়াম পুত্র মসীহ তো কেবল একজন রাসূল; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তারা উভয়েই খাদ্য আহার করত। দেখ তাদের জন্য আয়াত কত বিশদভাবে বর্ণনা করি; আরও দেখ, তারা কীভাবে সত্য বিমুখ হয়।” [সূরা আল-মায়েদাহ: ৭২-৭৫]

﴿تِلۡكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۘ مِّنۡهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُۖ وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجَٰتٖۚ وَءَاتَيۡنَا عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدۡنَٰهُ بِرُوحِ ٱلۡقُدُسِۗ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلَ

ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعۡدِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخۡتَلَفُواْ فَمِنۡهُم مَّنۡ ءَامَنَ وَمِنۡهُم مَّن كَفَرَۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلُواْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٥٣﴾ [البقرة: ٢٥٣]

“এই রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদাও উন্নীত করেছেন। মারইয়াম পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের পরবর্তীরা তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পর পারস্পরিক যুদ্ধ- বিগ্রহে লিপ্ত হত না; কিন্তু তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো। ফলে তাদের কিছু কিছু ঈমান আনল এবং কিছু কিছু কুফুরী করল। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হত না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৩]

কিন্তু-

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةٗ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقۡرَبَهُم مَّوَدَّةٗ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّيسِينَ وَرُهۡبَانٗا وَأَنَّهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ ٨٢﴾ [المائدة: ٨٢]

“অবশ্য মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও মুশরিকদেরই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে এবং যারা বলে ‘আমরা খৃষ্টান’, মানুষের মধ্যে তাদেরই তুমি মোমিনদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখবে,

কারণ তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী আছে, আর তারা অহংকার করে না।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৮২]

## দশম অধ্যায়
## হাদীস ও মুসলিম ইতিহাস গ্রন্থে ঈসা আলাইহিস সালাম

জ্ঞানের আরেকটি উৎস হলো হাদীস, আর এ হাদীস সম্পর্কে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের অন্ধকারে রাখা হয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের বাণী ও তার কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সম্বলিত লিখিত রূপই হলো হাদীস। সতর্ক পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই এর পরিণতিতে প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থসমূহের ওপর ভিত্তি করে যে হাদীস সাহিত্য গড়ে উঠেছে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিগত শতকে রোমান চার্চ ও খৃষ্টান মিশনারীগণ একটি অত্যাধুনিক কপট বৃত্তি (Pseudo_Scholarship) প্রতিষ্ঠা করে। নিউ টেস্টামেন্টে যেসব গসপেল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো মোটেই কোনো যাচাই-বাছাই করা হয় নি। কিন্তু হাদীসের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটে নি। প্রতিটি হাদীসই নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে গৃহীত, প্রয়োজনে তার উৎস সন্ধানে পৌঁছে যাওয়া হয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই সাহাবির কাছে যিনি প্রকৃতই তার মুখের কথা শ্রবণ করেছেন ও বিভিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। হাদীসসমূহের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সূত্র হলেন সে সব ব্যক্তি যারা আল্লাহকে ভয় করতেন ও ভালোবাসতেন। হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ দু'টি ইমাম আল-বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক সংকলিত। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের প্রায় একশ বিশ বছর পর তা সংকলিত করা হয়। এসব হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও জ্ঞানের প্রতিটি দিকই উপস্থিত। হাদীস হলো

মুহাম্মোদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার অপরিহার্য অংশ। ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. সেসব হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকালীন প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে।

হাদীসে যেমন ঈসা আলাইহিস সালামের প্রসঙ্গ রয়েছে, তেমনি বহু মুসলিম পণ্ডিতও তার বাণী ও কর্মের বিবরণ প্রদান করেছেন। এগুলো মূলত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রথম দিকের অনুসারীগণ কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছিল। যারা আরব ও উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটল, তখন ঈসা আলাইহিস সালামের এসব শিষ্যের বহু অনুসারীই ইসলাম গ্রহণ করেন। ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তাদের কাছে যেসব বিবরণ ছিল তা তারা রক্ষা করেছিলেন। ঈসা আলাইহিস সালাম শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। যাহোক, মুসলিমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম হাদীসমূহ লালন ও চর্চা করেন। এগুলোর মধ্যে বহু হাদীস চূড়ান্তভাবে সা'লাবীর'র 'কাসাসুল আম্বিয়া' (Stories of the Prophets) এবং আল- গাযালীর 'ইহয়াউ উলুমিদ্দীন' (Revival of the life Transaction Sciences) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। এটা তাৎপর্যপূর্ণভাবে লক্ষণীয় যে, এসব হাদীসে কি স্পষ্টভাবে সেই মহান নবীর জীবন ও কর্মের এক সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে যিনি সুগম করেছিলেন শেষ নবীর পৃথিবীতে আগমনের পথ।

কা'ব আল আহবার বলেন, মারইয়ামের পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন লাল রঙের, সাদা ঘেঁষা, তার চুল দীর্ঘ ছিল না, তিনি কখনই মাথায় তেল ব্যবহার করতেন না। তিনি খালি পায়ে হাঁটতেন, কোনো বাড়ি ঘর, আসবাবপত্র, কোনো সামগ্রী, পোশাক অথবা অন্য কিছুই তার ছিল না শুধুমাত্র দিনের খাবার ছাড়া। যেখানেই সূর্যাস্ত হত সেখানেই তিনি থেমে পড়তেন এবং পরদিন ভোর না হওয়া পর্যন্ত উপাসনায় রত থাকতেন। তিনি জন্মান্ধের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতেন। কুষ্ঠদের রোগ নিরাময় করতেন এবং আল্লাহর হুকুমে মৃতদের পুনর্জীবন দান করতেন। তিনি তার লোকদের বলতেন তারা বাড়িতে কী খাচ্ছে এবং আগামীকালের জন্য কী মজুত করে রেখেছে। তিনি সমুদ্রের পানির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতেন। তার মাথা অবিন্যস্ত থাকত, তার মুখমণ্ডল ছিল ছোট। তিনি ছিলেন পৃথিবীতে এক কঠোর তপস্বী, যাঁর লক্ষ্য ছিল পরকাল এবং তিনি ছিলেন আল্লাহর ইবাদতে মশগুল। ইয়াহূদীরা যতদিন না তাকে খুঁজে এবং তাঁকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছিল ততদিন তিনি ছিলেন পৃথিবীতে এক মুসাফির। এরপর আল্লাহ তাঁকে আসমানে তুলে নেন; আল্লাহই সম্যক অবগত।

ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন, যারা ইহলোকের আকাঙ্ক্ষা করে তারা হলো সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সমুদ্রের পানি পান করে; যত বেশি সে পান করবে তার তৃষ্ণা তত বৃদ্ধি পাবে, যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়।”

ঈসা আলাইহিস সালাম একদিন তিন ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তাদের শরীর ছিল কৃশকায় ও ফ্যাকাশে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন,

“তোমাদের এই অবস্থার কারণ কী?” তারা জবাব দিল, আগুনের ভয়ে। তিনি বললেন, “যারা ভীত তাদের নিরাপত্তা দান আল্লাহর দায়িত্ব।” তিনি তাদের ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে আরো তিন ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তারা আরো বেশি ক্ষীণকায় ও ফ্যাকাশে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের এই অবস্থা হয়েছে কেন? তারা জবাব দিল, “আমরা জান্নাতের বাগান চাই।” তিনি বললেন, “তোমাদের আশা পূরণ করা আল্লাহর দায়িত্ব।” তাদের অতিক্রম করে আরো কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি আরো তিন ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তারা ছিল আগের লোকগুলোর চেয়েও ক্ষীণকায় এবং তাদের চেহারা আরো বেশি ফ্যাকাশে ছিল। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের এই অবস্থার কারণ কি?” তারা জবাব দিল, আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি। তিনি শ্রেষ্ঠ ও মহীয়ান।” তিনি বললেন, তোমরা তারা যারা আল্লাহর নিকটতম, তোমরা তারা যারা আল্লাহর নিকটতম, তোমরা তারা যারা আল্লাহর নিকটতম।”

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন:

«أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ فِي المَنَامِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ، كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّعَرِ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ»

“গতরাতে স্বপ্নে আমি নিজেকে কা‘বা ঘরে দেখতে পেলাম। আমি লালাভ চেহারার এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। এ ধরনের লোক যেমন

অত্যন্ত সুদর্শন হয়, তিনিও সেরকমই ছিলেন যেমনটি তোমরা অত্যন্ত সুন্দর কেশগুচ্ছ সম্পন্ন লোককে দেখতে পাও। তার চুলগুলো আঁচড়ানো ছিল এবং সেগুলো পানিতে সিক্ত ছিল। তিনি দু'ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে কা'বা গৃহ তাওয়াফ করতে থাকলেন। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম তখন আমাকে বলা হলো, ঈসা মসীহ-মারইয়ামের পুত্র.....: (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: " وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَإِن مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهِۦ قَبۡلَ مَوۡتِهِۦۖ﴾ [النساء: ١٥٩]»

"যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম, মারইয়ামের পুত্র শিগগিরই তোমাদের মধ্যে আসবেন একজন ন্যায় বিচারক হিসেবে। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, অত্যাচারী, অমানুষদের হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর বিলুপ্ত করবেন। তখন এত বেশি সম্পদ হবে যে দান গ্রহণ করার মত কাউকে পাওয়া যাবে না এবং একটি সাজদাহ হবে পৃথিবী ও তার সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম।" অতপর আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মন চাইলে উচ্চারণ কর, ﴿وَإِن مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهِۦ قَبۡلَ مَوۡتِهِۦۖ﴾ [النساء: ١٥٩] "কিতাবের অনুসারী প্রতিটি ব্যক্তিই মৃত্যুর

পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে বিশ্বাস করবেই"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৫৯] (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

আবূ হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে,

«أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ» قَالُوا: كَيْفَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ، وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ»

"পৃথিবীতে এবং আখিরাতে আমি মারইয়ামের পুত্র ঈসার নিকটতম। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! তা কীভাবে? তিনি বললেন: নবীগণ বৈমাত্রেয় ভাই ভাই, তাদের মাতা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু ধর্ম এক। আমাদের দু'জনের মধ্যে কোনো নবী নেই"। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই বিখ্যাত ভাষণে এ ব্যাপারে যা বলেছেন তার সারকথা হলো: নবীগণ ভাই ভাই, তারা সকলেই এক, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তারা এক পিতার পুত্র: তারা একই মতবাদ ঘোষণা করেছেন (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। তার একক সত্ত্বায় তার সাথে আর কিছু যুক্ত হতে পারে না।

তাদের মাতাগণ পৃথক: প্রত্যেক নবীকেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রত্যেক নবী লাভ করেছেন সুন্নাহ বা জীবন-কাঠামো, রীতি-নীতি, একটি সামাজিক পদ্ধতি যার অনুসরণ দ্বারা তার সম্প্রদায় জীবন-যাপন করবে। যখনই একজন

নতুন নবী এসেছেন তিনি নতুন সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুন্নাহর নতুন রূপ নিয়ে এসেছেন। এটাই হলো শারিয়া বা নবীগণের পথ। এভাবে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের মধ্যে দিয়ে আসমানি দিক নির্দেশনার সমাপ্তি ঘটেছে। সর্বশেষ নাযিলকৃত গ্রন্থ মহিমান্বিত কুরআনের মধ্য দিয়ে নবুওয়াতের অবসান সূচিত হয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আহ ও সুন্নাহর সাথে নবুওয়াত সীলমোহরকৃত ও সমাপ্ত হয়েছে।

ধর্মোপসনার বিজ্ঞান হলো আল্লাহকে পাওয়ার পন্থা। আদম আলাইহিস সালামের সন্তানদের কাছে নাযিলকৃত কিতাব ও সুন্নাহ'তে আল্লাহর নিদর্শন বিরাজিত। ইসলামের নবী ঈসা আলাইহিস সালামের পথ শেষে শুরু হয়েছে ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ।

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এই অসাধারণ ঘটনার ইতি টানা হয়েছে এভাবে:

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾ [المائدة: ٣]

"এ দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করেছি এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পন্ন করেছি এবং তোমাদের জন্য মনোনীত করেছি দীন-আল-ইসলাম।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৩]

## অধ্যায় টীকা

### প্রথম অধ্যায়

১) The Apostolic Fathers, E. J. Goodspeed

২) Articles of the Apostolic creed, Theodore Zahn, পৃ.

৩) The Apostolic Fathers, E. J. Goodspeed

৪) Articles of the Apostolic creed, Theodore Zahn, পৃ.

৫) Tetradymus, John Toland.

৬) Outline of the History of Dogma, Adolf Harnack.

৭) What is Christianity? ঐ. পৃ. ২০।

৮) The Jesus Report, J. Lehman (Krewz Verlag, Stuttgart, ২য় সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ. ১১২ থেকে উদ্ধৃত)

৯) Articles of The Apostolic Creed, Theodore Zahn.

১০) Erasmi Epistolai, 1334 ed, P.S. Allen, V. পৃ. ১৭৩-১৯২

### দ্বিতীয় অধ্যায়

1) *The Jesus Report,* J. Lehman, পৃ. ১৪-১৫।

2) *The wilderness Revolt,* Bishop Pike, পৃ.১০১।

3) *The Dead Sea Scrolls,* Edmund wilson.

4) *The Death of Jesus,* Joel Carmichael, পৃ.১৪১

5) *The Dead Sea Scrolls,* edmund wilson, পৃ.৯৪।

6) *The Death of Jesus,* Joel Carmichael, পৃ.১৩৯

7) *The Jesus Scroll,* D. Joycee, পৃ.১২৬।

8) *The Nazarenes,* John Toland, পৃ.১৮।

9) *The life of Jesus,* Carveri.

**তৃতীয় অধ্যায়**

1) *The Nazarenes,* John Toland, পৃ.১-৬।

2) *Spicilegium:* (ex cod. Baroce. 39), Grabe.

3) *The Nazarenes,* John Toland, পৃ.১৫-১৬।

4) *The Apostolic Fathers,* E. J. Goodspeed পৃ.২৬৬।

**চতুর্থ অধ্যায়**

১) *The Apostolic Fathers,* Edgar J. Goodspeed.

**পঞ্চম অধ্যায়**

1) *The Kingdom of Fod and Primitive Christian Belief,* Albert Schweitzer, পৃ.১৪৯।

2) *Lebuch II,* Heinrich Holzmann, পৃ.২৫৬,৩৭৬।

3) *The Jesus Report,* Johannes Lehman, পৃ.১২৩।

4) *The Beginning of the christian Church,* Hanz Lietzman, পৃ.১০৪।

5) *Paul and His Interpreters,* Albert Schweitzer, পৃ.১৯৮।

6) *The Nazarenes,* John Toland, পৃ.৬ (ভূমিকা)।

7) *A History of christianity in the Apostolic Age,* A. C. Macgiffert পৃ.২১৬, ২৩১, ৪২৪-৫।

8) উদ্ধৃত, *The Jesus Report,* Johannes Lehman, পৃ.১২৬।

9) উদ্ধৃত, ঐ পৃ.১২৭।

10) উদ্ধৃত, ঐ পৃ.১২৮।

11) *The Nazarenes,* John Toland, পৃ.৭৩-৭৬।

**ষষ্ঠ অধ্যায়**

1) *Constantine the Great,* J.B. Firth, পৃ.১৯০-১৯১।

2) *A History of Christianity in the Appostolic Age,* A.C, Macgiffert, পৃ.১২৭।

3) *The Donatist Church,* W.H.C. Frend, পৃ.১৫৩।

4) ঐ, পৃ.১৬৪।

5) ঐ,

6) ঐ,

7) ঐ,

8) *Constantine the Great,* J.B. Firth.

9) ঐ,

10) *The Donatist Church,* W.H.C. Frend, পৃ.১৬৪।

11) ঐ, পৃ.৩২৬।

12) *John* ১৪ঃ ২৮, বাইবেল।

13) *Constantine the Great,* J.B. Firth. পৃ.৬০।

14) ঐ,

15) ঐ,

16) ঐ,

17) ঐ,

18) *The Council of Nicea,* J. Kayee পৃ.২৩-২৫।

19) *Constantine the Great,* J.B. Firth. পৃ.৬০।

20) *Arius,* Prof. Gwatkin.

21) ঐ,

22) ঐ,

23) *Tetradymus,* J.Toland.

24) ঐ,

25) ঐ,

26) ঐ,

27) ঐ,

28) *A History of Christianity in the Appostolic Age,* A.C. Macgiffet.

29) *The Condemnation of Pope Honorius,* John Chapman.

30) ঐ,

31) ঐ,

**সপ্তম অধ্যায়**

১) *The Hunted Heretic,* R.H.Bainton.

২) *A History of Unitarianism,* E.M.Wilbar.

৩) *Challenge of liberal Faith,* G.N.Marshall.

৪) *Anti-Trinitarian Biographies,* A. wallace.

৫) *Rise of the Dutch Republic,* Motley.

৬) *The Epic of Unitarianism,* D.B. Parke, পৃ.৫-৬।

৭) *Treatises concerning the Mohametons* A. Reland, পৃ.২১৫-২৩।

৮) *Francis David,* W.C. Gannett.

৯) ঐ,

১০) *A History of Unitarianism,* E.M. wilbur.

১১) *Francis David,* W.C. Gannett.

১২) ঐ,

১৩) ঐ,

১৪) *A History of Unitarianism,* E.M. wilbur, পৃ. ৭৮।

১৫) *Treatises concerning the Mohametons* A. Reland, পৃ.১৯০

১৬) *Francis David,* W.C. Gannett.

১৭) *Anti-Trinitarian Biographies,* A. wallace.

১৮) *A History of Reformation in Poland,* Lubinietski.

১৯) *Anti-Trinitarian Biographies,* A. wallace.

২০) ঐ,

২১) ঐ, ভূমিকা, পৃ. ৭৯।

২২) ঐ, পৃ. ৪৪।

২৩) ঐ, পৃ. ৪৪।

২৪) *Historical and Critical Reflections upon Mohametonism and Socianism,* A. Reland.

২৫) *The Nazarenes,* John Toland.

২৬) *Anti-Trinitarian Biographies,*III, A. wallace.

২৭) ঐ,

২৮) ঐ,

২৯) *The Religion of the Protestants,* W. Chillingworth.

৩০) ঐ,

৩১) *Anti-Trinitarian Biographies,*III, A. wallace.

৩২) *True Opinion Concerning the Holy Trinity,* J. Biddle

৩৩) *Anti-Trinitarian Biographies,*III, A. wallace.

৩৪) *The Epic of Unitarianism,* D. B. Parke, পৃ.৩১-৩২।

৩৫) *Anti-Trinitarian Biographies,*III, A. wallace.

৩৬) ঐ,

৩৭) ঐ,

৩৮) *The Christian Doctrine,* J. Milton.

৩৯) ঐ,

৪০) *Anti-Trinitarian Biographies,*III, A. wallace.

৪১) *The Christian Doctrine,* J. Milton.

৪২) ঐ,

৪৩) *Anti-Trinitarian Biographies,*III, A. wallace. পৃ.৪২৮।

৪৪) ঐ, পৃ. ৪৩৮।

৪৫) ঐ,

৪৬) ঐ,

৪৭) ঐ, পৃ. ৫১৭।

৪৮) ঐ,

৪৯) ঐ,

৫০) ঐ,

৫১) *The Epic of Unitarianism,* D. B. Parke, পৃ.৪৬।

৫২) ঐ, পৃ.৪৭।

৫৩) *A list of False Reading of the Scripture,* T. Lindsey.

৫৪) *Two Dissertations,* T. Lindsey.

৫৫) *Memoirs of Dr. Priestly,* J. Priestly.

৫৬) ঐ, পৃ. ৭৬।

৫৭) ঐ, পৃ. ৮৯।

৫৮) *The Epic of Unitarianism,* D. B. Parke, পৃ.৪৮।

৫৯) *A History of the corruptions of christianity,* J. Priestly.

৬০) *The History of Jesus Christ,* J. Priestly.

৬১) *Anti-Trinitarian Biographies,*III, A. wallace.

৬২) ঐ,

৬৩) *A History of Unitarianism,* E. M. willbur, পৃ.৪২৪।

৬৪) ঐ,

৬৫) *Anti-Trinitarian Biographies,*III, A. wallace.

৬৬) *The Epic of Unitarianism,* D. B. Parke.

৬৭) *Challenge of a Liberal Faith,* G.N. Marshall.

৬৮) *A History of Unitarianism,* E. M. willbur.

**অষ্টম অধ্যায়**

1) *A Christian Introduction to Religions of the world,* J. G. Vos, পৃ.৬৬-৬৭।

2) ঐ, পৃ.২৭।

3) *The world's Religions,* N. Anderson, পৃ.২৩২।

4) *"1984",* G. Orwell, পৃ.২২০।

5) *Christianity on Trial,* I, Collin Chapman, পৃ.৩৭।

6) *Time Magazine,* May 24th, 1976, পৃ.৪২-৪৩।

7) *Christianity on Trial,* I, Collin Chapman, পৃ.৩৭।

8) ঐ, পৃ.৫১-৫২।

9) *Time Magazine,* May 24th, 1976, পৃ.৪৬।

10) *Christianity on Trial,* I, Collin Chapman, পৃ.৬৩।

11) ঐ, পৃ.৭৪।

12) ঐ, পৃ.৬১।

# গ্রন্থপঞ্জী


The Quran

The Hadith of al-Bukhari and Muslim

The Bible

Abd Al- Qadir as_ Sufi, *The Way of Muhammad,* Diwan Press, 1975.

Alton, Religious Opinions of Milton, Locke and Newton, 1833.

Allegro, The Dead Sea Scrolls.

Anderson, Norman, *The World's Religions, 1975.*

Apuleius, Lucius, *Metomorphosis- The Golden Ass. (translated by* T. Taylor) 1822.

Backwell, R. H., *Hunted Heretic,* 1953.

Beattie, *The New Theology and the Old. 1910.*

Becker, *The Dead Sea Scrolls.*

Begin, Menachem, *The Revolt. The Story of the lrogun,* (translated by Samuel Karr).

Belloc, J.H.D., *An Open Letter on the Decay of Faith,* 1906.

Biddle, John, *The Opinion Concerning the Holy Trinity* (XII Arguments), 1653.

Bigg, *The Origin of Christianity, 1909.*

Blackney, E.H., *The Problems of Higher Criticism,* 1905

Brow, David, *The Structure of the Apocalypse,* 1891.

Brown W. E., *The Revision of the Prayer Book-* A Criticism, 1909.

Bruce, Frederick, *Jesus and Christian Origins Outside the New Testament,* 1974.

Bruce, F.F., *The New Testament Documents,* 1943.

Bruce, F.F. *The Books and the Parchments,* 1950.

Burnet, Gilbert, *An Abridgement of the History of the Reformation.*

Bury, Arthur, *The Naked Gospel.* 1699.

Carmichael, Joel, *The Death of Jesus,* 1962.

Carnegie, W.H., *Why and What I Believe in Christianity.* 1910.

Cary, Parsons and Pagas- *An Indictment of Christianity,* 1906.

Celsus, *Arguments of Celsus* (translanted by Lardner), 1830.

Chadwick, H., *Alexandrian Christianity,* 1954.

Chadwick, H. *The Early Church,* 1967

Channing, W.E., *The Character and Writing of Milton,* 1826.

Channing, W.E., *The Works of Channing,* 1840-1844.

Chapman, Colin, *Christianity on Trial,* 1974.

Chapman, John, *The Condemnation of Pope Honorius,* 1907.

Charles, R.H., *The Book of Jublilees,* 1917.

Charles, R.H., *The Apocrypha and Pseudo- Epiapapha of the Old Testament.*

Chesterton, G.K. *Orhodoxy,* 1909.

Chillingworth, W., *The Religion of the Protestants.*

Clarke, Samuel, *The Bible,* 1867.

Clodd, Edward, *Gibbon and Christianity,* 1916.

Cooke, Rev., *Reply to Montgomery,* 1883.

Cooke, Rev., *True to Himself,* 1883.

Corelli, Marie, *Barnabas- A Novel,* 1893.

*Council of Nicea and St. Athanasius,* 1898

Cox. Edwin, *The Elusive Jesus.*

Craver, Marcello, *The Life of Jesus,* 1967.

Cross, Frank Moore, *The Ancient Library of Qumran and Modern Biblical Studies.*

Culligan, *The Arian Movement,* 1913.

Cummins, G.D., *The Childhood of Jesus,* 1972.

Cunningham, Francis, *A Dissertation on the Books of Origen Against Celsus,* 1812.

Curll, *Edward, Historical Account of the Life of John Toland,* 1728.

Davies, W.D., *Paul and Rabbinic Judaism.*

Dinwiddie, *The Time Before the Reformation,* 1883.

Disciple, *Gospel of the Holy Twelve.*

Dupont-Sommer, *The Jewish Sect of Qumran and the Essenes,* (translated by R.D. Barnett).

Emlyn, T., *An Humble Enquiry into Scripture,* 1756.

Everett, C.C., *Theism and the Christian Faith.*

Eusebius, Church History- *Life of Constantine the Great,* (translated by MacGiffert), 1890.

Eusebius, *The Ecclesiastic History,* 1847.

Eusebius, *A Select Library of Nicene and post-* Nicene Fathers of the Christian Church, (translated by A.C. MacGiffert, Ph.D.), 1890.

Firth, J.B., *Constantine the Great,* 1890.

Frazer, W., *The Golden Bough.*

Frend. W.H.C., *The Early Church.*

Frend, W.H.C., *Persecution in the Early Church.*

Frend, W.H.C., *An Address to the Inhabitants of Cambridge,* 1788.

Frend, W.H.C., *The Rise of the Monophysite Movement.*

Frend, W.H.C., *Coulthurst's Blunders Exposed,* 1788-89.

Frend, W.H.C., *The Donatist Church.*

Froude, *The Life and Letters of Erasmus,* 1916.

Gannett, D., *Francis David, Founder of Unitarianism,* 1914. Gibbon, E., Christianity, 1930.

Gibbon, Edward, *Decline and Fall of the Roman Empire,* 1909-1914.

Gibson, J.M., *Inspiration and Authority of the Holy Scriptures.*

Glover, T.R., *Jesus of History,* 1919.

Goodspeed, E.J., *The Letter of Barnabas,* 1950.

Goodspeed, E.J., *The Letter of Barnabas,*1950.

Gordon, Alexander, *Heresy.*

Grant & Fridman, *The Secret sayings of Jesus,* 1960.

Green, *Sir Isaac Newton's Views,* 1871.

Guthrie, D., *A Shorter Life of Christ,* 1970.

Gwatkin, *Arius.*

Hall L., *The Continuity of Revelation,* 1908.

Harnack, Adolf, *Christianity and History,* (translated by Saunders), 1900.

Harnack, Adolf, *Outlines of the History of Dogma,* 1900.

Harnack, Adolf, *What is Christianity?* 1901.

Harris, J.R., *Celsus and Aristedes,* 1921.

Hay, J.S., *Heliogabalus,* 1911.

Haygood, A.g., *The Monk and the Prince,* 1895.

Hayne, S., *The General View of the Holy Scripture,* 1607.

Haines, *Religious Persecution.*

Harwood, P., *Priestly and Unitarianism,* 1842.

Hastings, *Dictionary of Christ and the Gospel.*

Heinimann*, John Toland,* 1944.

Hermes, Hermes- *A Disciple of Jesus,* 1888.

Hort, F.J.A., *Six Lectures on the Ante-Nicene Fathers,* 1895.

Hone, W., *The Apocryphal New Testament,* 1820.

Huddleston, *Toland's History of the Druids,* 1814.

Hunt, *Jesus Christ,* 1904.

Hynes, S., *The Manifesto.* 1697.

Jan, *John Hus- His Life,* 1915

Josephus, *The Works of Flavius Josephus,* (translated by William Whitson), 1840.

Joyce, D., *The Jesus Scroll,* 1973.

Kamer, H.A.F., *The Spanish Inquisition,* 1963.

Kaye, J., *The Ecclesiastic History of the $2^{nd}$ & $3^{rd}$ Ceturies,* 1893.

Kaye, J., *The Sermons,* 1850.

Kaspary, J., *The Life of the Real Jesus,* 1904.

Kaspary, J. *The Origin, Growth, and Decline of Christianity, 1904-10.*

Kelly, J.N.D., *Early Christian Creeds,* 1949.

Kirkgaldy, *The New Theology and the Old,* 1910.

Knight, *The Life of Faustus Socianus,* (translated by Biddl 1653.

Knox, W.L., *The Sources of the Synoptic Gospels,* 1953.

Konstantinides, *Saint Barnabas,* 1971.

Lardner, N., *A History of Heretics,* 1980.

Lardner, N., *Two Schemes of Trinity,* 1829.

Latourette, K.C., *A History of the Expansion of Christianity,* 1953.

Leany, A.R.C., *The Dead Sea Scrolls.*

Leany, A.R.C., *The Rule of Qumran.*

Lehman, Johannes, *The Jesus Report.* 1972.

Lietzman, Hanz, *The Beginning of the Christian Church,* 1949.

Lietzman, Hanz, *A History of the Early Church,* 1961.

Lindsey, T., *Two Dissertations,* 1779.

Lindscy, T., *An Historical View of the State of Unitarian Doctrine,* 1783.

Lindsey, T. *A List of False Readings of the Scripture,* 1790.

Lubinietski, *A History of the Reformation in Poland.*

Major, John, *"Sentences".*

Marshall, G.N., *Challenge of a Liberal Faith, 1966.*

Madden, *Life and Martyrdom of Savonarola,* 1854.

Masters, John, *Baptismal Vows, or the Feast of St. Barnabas,* 1866.

Mellone, S.H., *Unitarianism and the New Theology.* 1908.

Miller F., *The Christian Doctrine,* 1825.

Motley, *Rise of the Dutch Republic.*

Mowry, Lucetta, *The Dead Sea Scrolls and the Early Church.*

Murray, G.G.A., *Five Stages of Greek Religion.*

MacGiffert, *The Apostles' Creed,* 1902,

MacGiffert, *The God of the Early Christians* 1924.

MacGiffert, *A History of Christinity in the Apostolic Age,* 1897.

Maclachlan, *The Religious Opinions of Milton, Locke, and Newton,* 1941.

Newman, A., *Jesus* (With a preface by Dr. Schmeidal), 1907.

Newman, J.H., *Arianism of the Fourth Century,* 1833.

Newton, *Sir Isaac Newton Daniel,* 1922.

Oxyrhynchus, *New Sayings of Jesus and Fragments of Lost Gospel,* (translated by B.P. Grenfell & A.S. Hunt) 1897.

Patrick, John, *The Apology of Oregin in Reply to Celsus* 1892.

Parke, D.B., *The Epic of Unitarianism,* 1957.

Pike, E.R., *Spiritual Basis of Nonconformity,* 1897.

Pike, J.A., *If This Be Heresy,* 1967.

Pike, J.A., *The Wilderness Revolt,* 1972.

Priestly, Joseph, *A General History of the Christian Church,* 1802.

Priestly, Joseph, *A History of the Corruption of Christianity* 1871.

Priestly, Joseph, *History of Jesus Christ,* 1786.

Priestly, Joseph, *Memoirs of Dr. Priestly,* 1904.

Priestly, Joseph, *Socrates and Jesus,* 1803.

Priestly, Joseph, *Three Tracts,* 1791.

Puccinelli, P., *Vita de S. Barnaba Apostolo.*

Quick, Murid, *The Story of Barnabas.*

Reland, Adrian, *Historical and Critical Reflections upon Mohametanism and Socianism,* 1712.

Rice, D.T., *Byzantine Art,*1954.

Robinson, J.A., *Barnabas, Hermas and the Didache,* 1920.

Robinson, J.A.T., *Honest to God,* 1964.

Robinson, J.M., *Problem of History in Mark,* 1957.

Robinson, J.M., *The Historical Jesus,* 1916.

Robson, Rev. *James, Christ in Islam,* 1929.

Ruinus, *Commentary on the Apostles' Creed,* 1955.

Ryley, G.B., *Barnabas, of the Great Renunciation,* 1893.

Sandmel, S., *Barnabas, of the Great Renunciation,* 1893.

Sandmel, S., *We Jews and Jesus,* 1973.

Santucci, L., *Wrestling with Jesus,* 1972.

Sanday, *Outlines of the Life of Christ.*

Savonarola, *Verity of Christian Faith*, 1651.

Schmiedel, P.W., *Jesus in Modern Criticism,* 1907.

Schokel, L.A., *Understanding Bibical Research,* 1968.

Schweitzer, Albert, *Christinaity and the Religions of the World,* 1923.

Schweitzer, Albert, *The Mysticism of Paul the Apostle,* 1953.

Schweitzer, Albert, *The Kingdom of God and Primitive Christianity,* 1968.

Schweitzer, Albert, *The Philosophy of Civilization,* 1946.

Schweitzer, Albert, *A Psychiatric Study of Jesus,* 1958.

Schweitzer, Albert, *The Story of Albert Schweitzer.*

Spark, *Unitarian Miscellany.*

Spark, *Christian Reformer.*

Stanley, A.P., *The Eastern Church,* 1869.

Stanley, A.P., *The Athanasian Creed,* 1871.

Stanley, A. P., *Lectures on the History of the Eastern Church,* 1883.

Stevenson, J., *Creeds, Councils, and Controversies.*

Stevenson, J., *Studies in Eusebius,* 1929.

Stevenson, J., *The New Eusebius.*

Taylor, John, *The Scriptural Doctrine of Original Sin.*

Taylor, John, *A History of the Octagon Church.*

Thomas-A-Kempis, *Imitation of Christ,* (translated by John Wesley), 1903.

Thompson, E.A., *goths in Spain,* 1969.

Toland, John, *Hypathia,*1753.

Toland, John, *Nazarenes,*1781.

Toland, John, *Theological and Philosophical Works,* 1732.

Toland, John, *Tetradymus.*

Towgood, *Serious and Free Thoughts on the Present State of the Church.*

Verrnas, G., *Jesus, the Jew,* 1973.

Vos, J.G., *A Christian Introduction to Religions of the World,* 1965.

Wallace, *Antitrinitarian Biographies,* 1850.

Warchaurr, J., *Jesus or Christ?.* 1909.

Warfield, B.B., *Jesus or Christ?,* 1909.

Wilbur, E.M., *A History of Unitarianism in Transylvania, England, and America.*

Williamson, G.A., *The History of the Church,* 1965.

Williamson, G.A., *The Jewish War,* 1959.

Wilson, E.M., *The Dead Sea Scrolls* 1969.

Wisaart, H.S., *Socialism and Christ, The Great Enemy of the Human Race,* 1905.

Whittaker, T., *The Origins of Christianity,* 1933.

Workman, H.B., *Persecution in the Early Church,* 1960.

Zahn: T., *The Articles of the Apostles' Creed,* 1899.

Zahn, T., *Introduction to the New Testament,* 1909.

Zahn, T., Peter, *Saint and Apostle,* 1889.

**সাময়িকী**

Christian Examiner, Jan. 1924-Dec. 1925.

Edinburgh Review, Vol. XII, 1825.

Hibbert Journal Supplement, *Jesus or Christ,* Vol. VII, 1909.

Harvard Theological Review, *Theism and the Christian Faith,* 1909.

Review Biblique, 1950

Neale, Samuel, *A select series of biographical narratives, etc.*

‘ঈসা মসীহ: ইসলামের এক নবী’ গ্রন্থটি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে ঐতিহাসিক দলীল-প্রমাণসহ দেখানো হয়েছে যে, খ্রীষ্টান পাদ্রী ও তাদের শাসকগোষ্ঠী কীভাবে ঈসা আলাইহিস সালামের একত্ববাদী ধর্মকে আমুল বিকৃত করে পৌত্তলিক ধর্মে রূপান্তরিত করেছে। একেশ্বরবাদী খৃষ্টান পণ্ডিতদের স্বীকারোক্তিসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে এ বইটিতে। সর্বশেষে ঈসা মসীহ সম্পর্কে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস তুলে ধরা হয়েছে। দাওয়াতী ময়দানে যারা খৃষ্টানদের যুক্তি খণ্ডন করে ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করতে চান, তাদের জন্য এ বইটি একটি মুল্যবান পাথেয়।